আ ব হ মা ন বা ং লা ক বি তা

কবিতা আশ্রম

কবিতা আশ্রম অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা আশ্বিন ১৪২৩ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৬ বিনিময় ৭০ টাকা

সূ চি প ত্র

কবিতা

দেবদাস আচার্য, বারীন ঘোষাল, অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র, মলয় রায়চৌধুরী, প্রাণেশ সরকার, গৌতম বসু, সুশীল পাঁজা, রাহুল পুরকায়স্থ, প্রবালকুমার বসু, মন্দাক্রান্তা সেন, যশোধরা রায়চৌধুরী, কান্তিময় ভট্টাচার্য, জলধি হালদার, বাবলু রায়, তীর্থঙ্কর মৈত্র, দিশারী মুখোপাধ্যায়, পিনাকী ঠাকুর, সমরজিৎ সিংহ, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, রাণা রায়চৌধুরী, অংশুমান কর, কৌষিকী দাশগুপ্ত, দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, মৃণাল বসুচৌধুরী, প্রতিমা রায়, ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীতি আচার্য, রম্যাণী চৌধুরী, রজতশুভ্র মজুমদার, তারেক কাজী, শ্যাম রায়

কবিতাগুচ্ছ

মলয় গোস্বামী, তিলোত্তমা মজুমদার

গদ্য

পুরনো বন্ধুরা সব স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে ● নির্মল হালদার।
খণ্ড সময়, অখণ্ডের জলতল : রৌরব ● সমীরণ ঘোষ

সাক্ষাৎকার

‘আত্মত্যাগ জরুরি, সাধনা জরুরি’ ● নিত্য মালাকার

কবিতা

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, আবীর মুখোপাধ্যায়, অদিতি বসু রায়, রেহান কৌশিক, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলোত্তমা বসু, বব, ঋপণ আর্য, বিদিশা সরকার, ঋকপর্ণা ভট্টাচার্য, সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবেদিতা আচার্য, সুজিত দাস, পূর্বা মুখোপাধ্যায়, মেঘ বসু, রাহুল সিনহা, অনিন্দ্য রায়, অপাংশু দেবনাথ, সুশোভন দত্ত, সোমেন মুখোপাধ্যায়, তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুট সেনশর্মা, শুভঙ্কর বিশ্বাস, তাপস মাল, শুভঙ্কর সাহা, অতনু চক্রবর্তী,দীপশিখা ঘোষ ভৌমিক, সুশান্ত ভট্টাচার্য, দেবপ্রতিম দেব, সুপ্রভাত রায়, তিস্তা, শৌভিক দে সরকার, কিংশুক চট্টোপাধ্যায়, বেবী সাউ, পার্থসারথি দে, পার্থজিৎ চন্দ, মনীষা মুখোপাধ্যায়, পম্পা দেব, মেঘনা চট্টোপাধ্যায়, অনিন্দিতা গুপ্ত রায়, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দু দলুই, তারককুমার পোদ্দার, কিশোর ঘোষ, জিয়া হক, সুপ্রিয় নাথ, পঙ্কজ কুমার সরকার, সন্দীপন দাস

কাব্যনাট্য

তন্বী ও ময়ূর ● নন্দদুলাল আচার্য, ‘মার’-যুদ্ধ ● রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

প্রবন্ধ

বহির্বঙ্গের কবিতার বর্ণময় রংগোলি ও তার গোপন জলের দাগ ● অর্ঘ্য দত্ত
বীরভূমের অনালোকিত কবিচতুষ্টয় ● তৈমুর খান
ঝুমুরের কথকতা ● অভিমন্যু মাহাত

কবিতাগুচ্ছ

গৌতম চৌধুরী, সন্মাত্রানন্দ, সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বরূপ দে সরকার, বিপ্লব চৌধুরী, অর্ঘ্য মণ্ডল, অর্ণব সাহা, রাজীব সিংহ, শ্রীজাতা কংসবণিক, শুভম চক্রবর্তী, কল্পর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রণবীর দত্ত

প্রবন্ধ

শেষের ক'দিন ● সমর চক্রবর্তী

ভাঙা মনের গান 'ফিরে এসো, চাকা' ● তাপস বিশ্বাস

স্বেচ্ছামৃত্যুর রহস্যধূসর মিউজিকরুম ● গৌতম গুহরায়

ধারাবাহিক মহাকাব্য

গিলগামেষের মহাকাব্য (প্রথম ফলক) ● সুজন ভট্টাচার্য

কবিতা

কুমার চক্রবর্তী, শামীম রেজা, মুজিব ইরম, মাসুদ খান, শাহেদ কায়েস, ফারুক ওয়াসিফ, পিয়াস মজিদ, শামসেত তাবরেজী, জিললুর রহমান, হাসান রোবায়েত, মাহমুদ টোকন, নাজনীন খলিল, সানাউল্লাহ সাগর, বীরেন মুখার্জী, নভেরা হোসেন, বিজয় ঘোষ, পার্থ ঘোষ, অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনালী মিত্র, মধুছন্দা মিত্র ঘোষ, পীযুষকান্তি বিশ্বাস, নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

অনুপম মুখোপাধ্যায়, রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ কুমার সরকার, সমরেশ মুখোপাধ্যায়, জয়দেব বাউরী, কার্তিক নাথ, স্বরূপ চন্দ, জারিফা জাহান, চিরঞ্জিত সরকার, জিৎ পাল, শান্তনু হালদার, অরিজিৎ চক্রবর্তী

দীর্ঘ কবিতা

স্বপন চক্রবর্তী, সুমন গুণ, সুনীল সোনা, অমিত সাহা, সুবীর সরকার

অনুবাদ কবিতা

মোংপো লামার কবিতা ● অনুবাদ : হিন্দোল ভট্টাচার্য

মনুষ্যপুত্রম-এর কবিতা ● অনুবাদ : প্রবুদ্ধসুন্দর কর

মুক্তগদ্য

আমি মেঘলা হই ● ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

বৃষ্টিরঙের ভোরে একটি নিঃসঙ্গ ইনবক্সে সামুদ্রিক মেঘসংলাপ ● অমিত কুমার বিশ্বাস

সম্পাদক মণ্ডলী

চিরঞ্জিত সরকার, অভিমন্যু মাহাত, স্বরূপ চন্দ, অর্ঘ্য দত্ত, জয়দেব বাউরী, ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, অমিত সাহা, সুবীর সরকার, বিকাশ কুমার সরকার, মণিশঙ্কর

নামাঙ্কন : মারুত কাশ্যপ

প্রচ্ছদ : বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী মোস্তাফিজ কারিগর

ওয়েবসাইট : kabitaashram.wordpress.com

প্রকাশনা সহযোগী : ছোঁয়া

সম্পাদক : রণবীর দত্ত

শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, ৭৪৩২৩৫

দূরভাষ : ৯৮৩০৭৮০০৬০

মুখ্য ব্যবস্থাপক : শান্তনু হালদার

প্রকাশক : বিশ্বজিৎ মল্লিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

কার্তিক নাথ, রজতকান্তি সিংহচৌধুরী, বিভাস রায়চৌধুরী, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, শাহেদ কায়েস, মাহমুদ টোকন

দেবদাস আচার্য

অফুরন্ত

তেমন মহৎ কিছু নয়, তবু
দীর্ঘ একটা উপন্যাস পড়ছি
একটানা পঁচাত্তর বছর

দীর্ঘ ও জটিল বিন্যাস
চরিত্র সংলাপ
নাটক দৃশ্যাবলি
ঘটনাক্রম কথাশৈলী
কত কী যে!
অনেকখানি আকাশ জুড়ে

এরকম সব বহুমুখী গল্প
মহৎ হোক বা না-হোক
নিত্য এর পাতা উল্টে রসাস্বাদ করি

দিন কাটে, বয়স বাড়ে
গল্প ফুরায় না

বারীন ঘোষাল

চিঠিপোড়া

শেষ তক চিঠিহীন মানুষকে ডাকল এক দুই শারীরিক চিঠি
ডাকবাক্সটাই তার লালাল্লা দেহ
হোহো ডাকে
ফিজায় গামা
বিটা
রো
না
হটতে হটতে হটেনটট জুজুত্তাময়
কেয়াবাত

শুধুমাত্র জামায় জানা ফান্টুস
কালোয়ান মোবাইক
রেত রতি না
গগল্‌স
খালি পিলিয়ন
এসব আমাদের ছোটবেলাকার
যতবার নিমগাছটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি
রেললাইনে কান পাতার দিন
ফুলশয্যার রাত
কু-উ শোনা গ্লাসে বিষাদের লাস্ট পাঞ্চ
এই আর কী

আমিই সেই মানুষ

আমিই চিঠি
মতোনীড়ের অংক
তোমরা আমাকেই লিখো আমাকে আর মঞ্চে পড়ে নিও
আগুন জলের বাইরে চোখ গ্যালো চোখ
গ্যালো
ইমোশনের ইলেকট্রনরা ব্রেক মারছে ঘুমোবে বলে
সেই শব্দে পুড়ছে চিঠিগুলো

অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র

একটি মাণিক্য

... সময় আসবে, যদি বেঁচে থাক', যবে, ওই দাঁত—
অমন সুদৃশ্য, শুভ্র, সারিবদ্ধ—আর একটিও
থাকবে না—ঝ'রে যাবে—সবগুলি! —সময়ের তাঁত
টানা ও পোড়েনে, আঁকবে শত-শত, জালি-জালি, প্রিয়—
চৌখুপ্পি, ও-ত্বকে! —ওই কোমল, ফুলেল, দক্ষ হাত—
এমনই অসাড় হবে—ব্যক্তিগত, অত্যাবশ্যকীয়,
গোপন কাজগুলিও —করতে দেবে না, আর, বাত!
...সেদিন, এ সনেটটি, পুতিনীরে পড়ায়ো, পড়িও!

...তোমার, সে-পুতিনীটি, বলছে, অবাক হয়ে, শুনি :
''তোমাকে নিয়েও, কেউ লিখেছিল, এমন সনেট—
একদিন, আম্মা?"—তুমি হাসছ — বলছ, ঘাড়-হেঁট :
''আমাকে নিয়ে কি? —সে কি আমি? —না তুই-ই?— যে-
ফাল্গুনী
লিখেছিল, এ-কবিতা— কোথায় সে? —কোথা টাইটানিক?"

... ডুবে গেছে সব ... শুধু ডোবে নাই, মনের মাণিক ... ...

ইতি সকাল; ৬ই আষাঢ়, ১৪২৩।।

মলয় রায়চৌধুরী

কবিতার জাতক

ঈগলপাখি হয়ে জন্মেছি, রাক্ষস গণ, সিংহ রাশি
বুড়ো হয়ে গেছি, কেউ-কেউ মরে গেছে
আকাশের বয়স হয় না বলে ওড়ার বয়স হয় না
যতদিন আকাশ ততদিন উড়াল
দু'চারটে পালক খসে গিয়ে থাকবে
কিন্তু আমাদের যৌথ প্রেমের যৌথ প্রেমিকারা
আমাদের সঙ্গেই উড়ত, এক-এক করে
দীপ্তি-বেবি-মীরা বাংলায় টলমলে
বাসুদেবের জাদুবাস্তব চিঠিতে অমর
টস করে নির্ণয় নিতুম আমরা, আজকে কে
প্রথমে কে যাবে
তারপর আমাদের মাঝখানে সাহিত্য
জোড়ার বদলে দেয়াল তুলল
সাহিত্যের সহিতত্ব ব্যাপারটা চরসের ধোঁয়া
যত ফোঁকা যায় তত ঝাপসা হয়
দীপ্তি এখন বুড়ি, বেবি অন্য বাড়িতে
মীরার শরীর ঝরে গেছে
কিন্তু জোড়ার আঠা ছিল বটে তিনজনের
আমাদের সবাইকে একই বিছানায় জুড়ে দিত
আমি ঈগল থেকে অন্য পাখি হতে পারলুম না
দোষটা আকাশের, রাক্ষস গণ পালটাতে পারলুম না
সিংহ রাশি পালটাতে পারলুম না
কবিতার জাতক
জাদুবাস্তবের অবিশ্বাস্য ফিনফিনে হাওয়ায় আজও

কসমোপলিসের আত্মহত্যা

মুম্বাই সেন্ট্রাল স্টেশানে ছাড়তে এসেছিলুম অবন্তিকাকে
ও যাবে ভয়েন্দরে মাছ কিনতে কাৎলা বা রুই
ভালো টাটকা মিষ্টিজলের মাছ ভয়েন্দরে পাওয়া যায়
আমি মাছ তেমন চিনি না বলে ও-ই যাচ্ছে
ওর মুড়িঘণ্ট খেতে ভাল্লাগে
আমার একেবারে পছন্দ নয় মাছের মুড়ো
মিষ্টিজলের হোক সমুদ্রের হোক
অবন্তিকা এক যুবকের দিকে ইশারা করে বলল
মেয়েদের কমপার্টমেন্টে ওঠার জায়গায় ও কী করছে?
পকেটমার নির্ঘাৎ!
বললুম, দেখছিস তো লোকটা ফোন করছে
হয়তো পরের ট্রেনে যাবে
লোকাল ট্রেন এসে পড়ল প্রায়
মেয়েদের ঠেলাঠেলি শুরু হল
লোকটা মোবাইলে ব্যস্ত
পায়ের কাছে মোবাইল ফেলে দিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে ঝাঁপাল
রেললাইনের ওপর পেতে দিল নিজেকে
কেটে দু'টুকরো জবজবে শার্ট চোখ আকাশে
দেখে বমি পেল অবন্তিকার
এই ট্রেন আর যাবে না নিত্যযাত্রীরা জানে
প্ল্যাটফর্মের কারোর পরোয়া নেই সবাই দৌড়োল
অন্য প্ল্যাটফর্মের দিকে পরের লোকাল ট্রেন দাঁড়িয়ে
তাদের পায়ের চাপে লোকটার মোবাইল চুরমার
ভয়েস রেকর্ড-করা আত্মহত্যার ই-চিরকুট মুছে গেল
আজ আর মাছ কেনা হবে না
মুড়িঘণ্ট আর আত্মহত্যার জন্য কসমোপলিসের খেয়াল নেই।

প্রাণেশ সরকার

মূর্তি

তোমাকে আদর করতে ইচ্ছে করছে খুব, দু'হাত দিয়ে পানপাতা মুখ জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে করছে খুব, কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহরে বস্তুবিশ্ব ঘুমের তালে কাদা। কাদা দিয়ে, আত্মা দিয়ে হরেক রকম টুকরো টুকরো পূর্ণশক্তি পুণ্য-ভালোর মূর্তি যারা গড়ে, তারা থাকে নদীর ধারে ইটের ভাটার গনগনে সব আঁচের নাভির নীচে। উথালপাথাল আগুনছোঁওয়া তেমন দু'একজনের সঙ্গ পাওয়া স্থির জেনেছি এ জীবনে আত্মার কম্মো নয়। নেশায় ভাঙা, টলতে টলতে খানাখন্দ অন্ধকারে ছিন্নভিন্ন ভাঙা সূর্য থেকে তড়াক করে আপেল একটা পেড়ে এই এখানে কুয়োতলার পাহাড়তলির বাঁকে ঘামতে ঘামতে দাঁড়িয়ে আছি কুসুমছিন্ন হয়ে। হঠাৎ দেখি আস্ত একটা দেবীর মতো তুমি দু'হাত ছুড়ে সাঁতার কাটছে। বিরুদ্ধ সব হাওয়ায়। মনে হল হতেই পারে, তালাও থেকে টলটলে জল ছিটকাতে ছিটকাতে তোমার দিকে তীব্র ধেয়ে এগিয়ে আসতে পারে। তালাও থেকে একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছি আমি, হাওয়ায় ঘেমে, শুকনো হাওয়ায় ঘেমেনেয়ে একা শীতল হওয়ার অভীপ্সাকে পদ্মাসনে রেখে তোমার দিকে ছুটে যাচ্ছি তোমার আগুন সেঁকে নতুন করে কাঁকর থেকে ধুলোর গুঁড়ো থেকে আবার যদি জেগে উঠি জেগে উঠতে পেরে আস্ত একটা পাথর থেকে একটা আস্ত মূর্তি গড়ি!

গৌতম বসু

নৈশপ্রহরী যখন এগিয়ে আসছিল

মৃদু বাতাসে হাফ-পর্দা উড়ছে, নিশাকাল;
পায়ে খস খস শব্দ, লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে সে এগিয়ে আসছে
আমার শাস্তিগ্রহণের মুহূর্তের দিকে; মুহূর্ত, না ঘণ্টা, না শতাব্দী,
শুয়ে-শুয়ে অনুমান করার চেষ্টা করছি।
শুনেছি, জীব অতিশয় ভীত হয়ে পড়লে,
মোচনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, কখনও-কখনও
জড়িয়ে পড়ে আপনার রোদনের জটায়;
বিলাপ করতে থাকে নিচুস্বরে, এমনকী,
ঘন-ঘন মূত্রত্যাগের ইচ্ছা জাগতে পারে।

মৃদু বাতাসে উড়তে থাকা পর্দার ওপারে
তাকিয়ে এইসব ভাবছিলাম অকারণে।
উড়তে-উড়তে পর্দা হেসে ফেলল, বলল,
'এখন আর লণ্ঠন তুলে ধরলে কী হবে
যে আসছে, ওইটুকু আলো ভক্ষণ করার
ক্ষমতা সে কদাপি রাখে না ব'লে মনে করো?'

বিরস বদনে ওখানেই প'ড়ে থাকতাম,
অকস্মাৎ, যেন বা শত বিদ্যুৎ খেলে গেল
মনে পড়ল, হতভাগারও মনে প'ড়ে গেল,
কবেকার পুরাতন বচন, বিপদকালে
ছুঁয়ে থাকবি এমন কিছু, যাতে পাপ নাই।

তৃতীয় যামে, নৈশপ্রহরী খস খস শব্দে
যখন এগিয়ে আসছিল, অসময়ে আমি
নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাকে স্মরণ করলাম
ককুভ বিলাওল, আপনার বসনপ্রাপ্ত
ধরে রইলাম। চললাম হে, নৈশপ্রহরী।

সুশীল পাঁজা

এখনও উদ্বাস্তু মরিচঝাঁপির বাঙালি

(১৯৭৮-১৯৭৯-এর যে ছবি জানতে চায় অনুজ কবি : ১৯শে মে ২০১৬)

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে হইনি আমি আর বিচলিত
বন্ধুদের ভোটযুদ্ধের পরাজয়ে, কর্কশ-কদর্য চর্চায়,
তখনই আসে ভেসে অজানা পঙ্‌ক্তি, যেন খুঁজে পাই কষ্টের দিনগুলি!
দরিদ্র মানুষ যেখানে বাঁচে, এপারে আমার প্রিয় গাঁয়ে, প্রাচীন বৃক্ষের সৌন্দর্যে
থাকে নিরক্ষরে, সেসময়ে দু'একটি কৃষিজীবী পরিবারে পৌঁছেছে বর্ণপরিচয়,
কালিপড়া লণ্ঠনের আলোয়...

অ-আ-ক-খ কলরবে শিশুরা, কেবল এখনও ঢেউ ভাঙে শৈশবে!
স্পর্শাতীত স্বপ্ন গ্রাস করে একুশ-শতকে, নীলাভ-সবুজ চোখের
ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রবাহে
যেন এখন হারাই সেসব ঘরময় শান্তিভূমি, তবুও আত্মায় বারবার ফুটে ওঠে...
আর ছোঁয় মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুর খিদে-কান্না ঝড়ে, ভাসি কেন আজ কলকাতা শহরে?
দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতায়, তাঁদের খড়কুটো তাঁবুতে ব্যথিত ধূসর জীবনে,
যেন আমি বন্ধ জুটমিলের কর্মী, ক্রীতদাস কবি!
জমাট যন্ত্রণায় ঘুরে-ঘুরে হিংস্র শাসকের কত কিছু শুনি, ক্লান্ত বিষণ্ণ শরীরে...
আর দেখি, মায়ের কোলে জীর্ণ শিশু, সারাবেলা ভেজে, শুধু ভয়ে চাপ চাপ বিষণ্ণ সংশ্রয়ে
শব্দহীন কচুরিপানার 'মনোহরদাস তড়াসের' পচানীল জলের কিনারে জড়ানো আশ্রয়ে!

ঠিক তখনই বয়ে ছিল অত্যাচার—অমানবিক অন্যায়, মুক্ত আকাশের নীচে,
গরিব গুর্বোর ভোটে জেতা, প্রগতি বাংলার এ ঝুটা আজাদির মনোরম সিংহাসনে!
যেন অভিমানে ক্ষুধাতুর শিশু-নারী-ধ্বনি রাখে, দ্বন্দ্ব বিষম আমার হৃদয়ে প্রশ্নচিহ্নে...
নিষ্ঠুর নগরে, মেঘকালো দুপুর আহারে মুড়ি-চিঁড়ে ভেজায় নীল-পচা জলে, যিশুর জন্মদিনে!
বর্বর কলঙ্কের উনিশশো আটাত্তরে....

তখন শীতের এসপ্লানেড সাজগোজ পরিবেশে, ডান-বাম এলিট বুদ্ধিজীবী রোদ গায়ে, স্বপ্ন নিয়ে
রিফিউজি শিবিরে আসেনি, সে সময়ে...
ফেলেছে শাসকের কিছু লোক ট্রাকভর্তি সেবা প্রতিষ্ঠানের পানীয় জল, রাজপথে—
এসবই সত্য, এমন ময়লা পাঞ্জাবি-পাজামা আর কাঁখে ঝোলা ব্যাগের ভিতর মুড়ি ও ছোলা, এইটুকু ব্যস!
উদ্বাস্তুর সংসারে স্বপ্নহীন কতদিন রোদে ...

কবিতার নৈরাজ্যে পৈশাচিক শাসকের অহংকারের যে ছবি টুকরো হয় শতক একুশে, পুরনো আয়নায়!
ভেজা চোখে ভাসে, পুলিশের গুলিতে নিহত, ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত মানুষেরা বেদনা-বিষাদ-বিপন্ন শরীরে কান্না ঝরায়,
আজও নিঃশব্দ প্রার্থনায়, আবার শ্রমের ক্ষত প্রাণে...

রাহুল পুরকায়স্থ

কালো অক্ষরের কবিতা

এক

শরীরে অস্ত্রের দাগ লুকিয়ে রেখেছি,
ক্ষত উপশমে দাহ বেড়েছে দ্বিগুণ,
তণ্ডুল রহস্যকণা, পাখির সংসারে
স্মৃতির ময়ূর নাচে, নেশানিদ্রানুন
তেজপ্রক্ষালনে যায়, শান্ত রাজহাঁস
ঈশানে, নৈর্ঋতে ভাসে, কবিতাকঙ্কালে
দোলায় দোলায় তারে, নেশানিদ্রাজলে
আধফোটা নক্ষত্রের শরীর-বাতাস

কবিতার থেকে দূরে ত্রস্ত জনপদে
একা যে মানুষ হাঁটে, রক্তে বাড়ে ক্ষার,
অন্ধ, খোঁড়া, বদ্ধ গলি অস্ত্রের সংরাবে
দেহে দেহে বুনে চলে পাখির সংসার

তুমিও কবিতা লেখো? অস্ত্রে দাও শান?
হলুদ বিবর্ণ লেখা নগ্ন দেহযান

দুই

ওহো রে চৌদিকবাতি, মৃদঙ্গের বোল,
দেহপাখি ওড়ে ধীরে, সন্ধ্যার বাতাসে
আহার, মৈথুন, নিদ্রা যায় আর আসে
ওহো রে চৌদিকবাদ্য দে দোল দে দোল

বসন্তপঞ্চমে দেহ কূজন কাকলি,
অশ্রুপতনের দেহ বেদনার ছাই,
যোনিতেজতৃপ্ত দেহ খোঁজে বনমালি,
দেহে দেহে ঘুরে ঘুরে বাঁশরি বাজাই

মালিনীবিজয়সিদ্ধ শ্রাবণের ঘোরে
অবশেষ চন্দ্র দোলে গাছের কোটরে,
সেই বৃক্ষ ঘিরে ঘিরে মৃদঙ্গ বাজাই,
চন্দ্রাতপে দেহ পোড়ে, দেহেরে পোড়াই

নিরাকার দেহলীলা, পাখিপ্রাণে বাঁচি
মৃদঙ্গে ফুটেছে বোল, নাচি আর নাচি

প্রবালকুমার বসু

আমি ও বিরূপকান্তি

বেশ অনেকদিন পর আবার দেখা হয়ে গেল বিরূপকান্তির সঙ্গে
প্রথমটায় চিনতে পারিনি, মোটা হয়ে গেছে বেশ
মাথার চুল কালো—মনে মনে ভাবলাম
নিশ্চয়ই কলপ লাগিয়েছে।
যেন দেখতেই পায়নি এইভাবে প্রথমে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল
বিরূপ
আমিই রাস্তা আগলে দাঁড়ালাম, কিন্তু আমার ভুল ভাঙতে
সময় লাগল না
আমি যে বিরূপকে চিনতাম, ইনি নন, অন্যজন
এই অন্য বিরূপকে আমি কী বলব?
পুরনো প্রসঙ্গ উত্থাপন অবান্তর মনে হল
এক জনসমাগম পূর্ণ রাস্তা, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি ও বিরূপ
কারোরই বলার মতো কিছু নেই, আসলে কেউ কাউকে চিনিই
না
মাঝে মাঝে কাউকে কাউকে এরকম বিরূপ বলে মনে হয়
দেখা হয়, কথা হয় না এবং আমি নিশ্চিত এদের মধ্যে সত্যি
সত্যিই
কেউ বিরূপকান্তি, যে আমাকে চেনেই না
যেন অচেনা দু'জন লোক, তবু হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যায় আর
প্রতিবারই ভুল করে বিরূপকান্তি বলে ভাবি।

মন্দাক্রান্তা সেন

জাদুবাক্স

আকাশের আলো দেখি না কতকাল
ছোট্ট একটা পুরনো মরচে ধরা বাক্সতে বন্ধ আছি

বাক্সটা কি জাদুবাক্স? অন্তত, ছিল কোনওদিন?

সেখানে আমার সঙ্গে বন্দি আছে
একটা বেড়াল একটা ছুরি একজন দেবতা

আমি ওরই মধ্যে দেবতাকে প্রণাম করতে শিখেছি

কিন্তু দেবতার আশীর্বাদের জাদুই
অ্যাদ্দিনে নষ্ট হয়ে গেছে

যশোধরা রায়চৌধুরী

যে যে লেখা লেখা হয়নি

যে যে লেখা লেখা হয়নি, তুলনারহিত সর্বনাশ
যে যে লেখা লিখব বলে ছিল মুলতুবি স্বর্গবাস
যে যে লেখা লেখিতব্য আমার জন্মের পরিসরে
হাঃ সেই খিল্লিমারা পরিসর, একটু একটু করে
আমাদের গিলে খাচ্ছে, কোথায় আমিই খাব তাকে!
এভাবেই বিল্লিগুলি ইঁদুরের খাদ্য হবে, ফাঁকে
তালে থাকবে গৃধিনীরা, খুঁটে খাবে সর্ব অবশেষ
যেভাবে মসৃণ করে কেটে রাখছে ব্লেডেরা তলপেট...
উঁহু এটি খুঁতযুক্ত, ছন্দখানি হল না, প্রবোধ
চন্দ্র থাকলে শোনাতেন। আমরা তবু নিতান্ত অবোধ
লিখে চলছি দিল্লি রোড লিখে চলছি বম্বে রোড কথা
পড়ে চলছি মারাত্মক অন্ধকারে লোডশেডিং গাথা...
যে যে লেখা লেখা হয়নি, সেসব আমারি সর্বনাশ
যে যে রতি চেয়েছিলে, শব্দদের, ঘুচিয়ে সন্ন্যাস...

কান্তিময় ভট্টাচার্য

সে অন্য কথা

একদিকে আগুন আর অন্যদিকে জল
এদিক-ওদিক খুঁজে বুকে নিই তীব্র হলাহল
তারপর সে অন্যকথা অনেকটা এরকম
বুকের ভিতর বাজে—জখম জখম

একদিকে আমি অন্যদিকে সে
মাঝখানে শ্রাবণ দু'হাত ছড়িয়েছে ভালবেসে
তার করতলে রাখি দু'ফোঁটা চোখের মেঘজল
সে কিন্তু ততক্ষণে তার হাতে রোদ্দুর ঢেলেছে অবিরল

তারপর সে অন্যকথা অনেকটা এ রকম
আমার নীরব গোঙানি তার ঠোঁটে বকম বকম

জলধি হালদার

নিখোঁজ দ্বীপের মতো

আমি সেই নাবিক
যার নিজের কোনও সমুদ্র নেই
আর আমাকে নিখোঁজ দ্বীপের মতো দেখতে।

সমুদ্র মানে হাঙর ও হ্যারিকেন শেষে নিঃসঙ্গ বাতিঘর
সমুদ্র মানে নির্জন অন্ধকার মহাজাগতিক নক্ষত্রের ভিড়
সমুদ্র মানে জলের নিশ্বাস আন্ডারওয়াটার কারেন্ট আর আমার
শঙ্খচিলের ঠুকরে দেওয়া চোখ।
রাতভর জুয়া মদের বোতলে খলবল ঢেউ
অর্ধেক জ্যাকনাইফ অর্ধেক লাইফ বোট।

কোনও দেশে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না
কোনও বন্দর আমার নয়
জাহাজের একটি মাস্তুলও আমার নয়
জলস্তম্ভের চূড়ায় বসে আসে ভূমা।

আমার সামনে থমকে যাওয়া জোয়ারভাটা
দুই সমুদ্রের মাঝখানে রক্তাক্ত হারপুন
মরচে-ধরা নোঙর
চর্বির আলোয় টিমটিম-করা বহুজন্মের পোলারিস
এখন দিনের আলোতেও দেখতে পাই।

আমি সেই নাবিক
যার নিজের কোনও সমুদ্র নেই, আমার সব
জাহাজের পেছনে লেখা থাকে 'প্রপেলার হইতে সাবধান'।

আর আমার জীবন ভর্তি নিখোঁজ দ্বীপের পাখি

বাবলু রায়

অন্ধ ঘোড়া

আমার ডানদিকের সাদা ঘোড়াটি জন্মগত অন্ধ
অথচ দু'টি চোখ থাকা সত্ত্বেও বামদিকের ধূসর রঙের হৃষ্টপুষ্ট
ঘোড়াটি কিছুই নাকি দেখতে পারে না
একাধিক চিকিৎসকেরা অনেক চেষ্টা করেও কোনো
সুফল আসেনি। অদ্ভুত ব্যাপার। ফলে রাজকাজ থেকে বঞ্চিত।
সম্রাট প্রতাপ সিংহের আস্তাবলের প্রশিক্ষিত যুদ্ধবাজ
ঘোড়াদের বংশধর
সব ঠিকঠাক থাকলেও কারণে অকারণে একটার অন্যরকম
স্বরে ডেকে ওঠে
অন্যটি সান্ত্বনা দেয় হ্যাচোর খ্যাচোর করে ধুলো ওড়ায়
কান খাড়া হয়ে ওঠে লালা ঝরে মুখ দিয়ে ল্যাজ নাড়ে
আস্তাবলের মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ কাচের পাঁচিল
এ পাশের ছায়া ওপাশে মুখ থুবড়ে পড়ে রক্তাক্ত হয়—শামিয়ানা,
অন্ধকারে বৃত্ত খুঁজছে কম্পাস-প্লাস-মাইনাসে রাত্রিদিনের
হাহাকার
সাদা কাগজে লাল কালি-নীল কালি
কিছুতেই অঙ্ক মিলছে না। কিছুতেই অঙ্ক মিলছে না। শূন্যতায়
ডুবে যাচ্ছে রং।

তীর্থঙ্কর মৈত্র

যে শরৎ সাইকেল চেপে এল

মুদ্রিত কাশের গুচ্ছ, পেঁজা মেঘ—পাশে মাতৃমুখ,
চায়ের টেবিলে আলো—ছোট্ট ফ্ল্যাট, ঘরকন্যা মাঝে,
শরৎ এসেছে ধীরে, বিজ্ঞাপনে ভোরের কাগজে—
কোথায় বসাই ওকে? শিউলির মুগ্ধতাকেই!
ও-ঘরে তো টিভি, ফ্রিজ, আলনায় ছোট ছোট সুখ।
এ-ঘরে বইয়ের র‍্যাক, শৌখীন আসবাবে ওই
বসেছে প্রগতি আর মুছে রাখা গ্রাম্যতার ছাপ।
জিনসের প্যান্ট ঝোলে যেইখানে প্রাত্যহিকতায়,
সেইখানে সিন্থেটিক একগুচ্ছ যত্নে রাখা ফুল।
ওখানেও কি তেমন জায়গা ওকে বসাবার? হায়!
বাকি অন্যে খাওয়া দাওয়া—অনটন, চাপা পরিতাপ।
কোথায় বসাই ওকে, যে-শরৎ বিজ্ঞাপন-ঠাটে?
সাইকেল চেপে এল শহরের ছোট্ট এই ফ্ল্যাটে!

দিশারী মুখোপাধ্যায়

ওম

একটাই শব্দ তুমি ছুড়ে দিয়েছ
আমি তার অর্থের সন্ধানে শব্দভেদী
সেটা কি শুধুই একটা ধ্বনি
তার কোনও হৃৎপিণ্ড নেই
সে কি মস্তিষ্কের গুরু অঞ্চলে গুড়ুগুড়ু আওয়াজ তোলে না
সে কি দানে বা গ্রহণে নির্বিকার মিঁউ আর ঘেউ
ফোঁস আর কুহু
এইসব শব্দগুলোর গায়ে কোথাও কি রক্ত কিংবা ঘাম লেগে নেই
একটাই শব্দ তুমি ছুড়ে দিয়েছ
আমি শব্দের গায়ে হাতুড়ি ও গাঁইতি সহ
আমি সেই শব্দের গায়ে ফুল ও বেলপাতা
আমি তাকে চেটে চুষে চিবিয়ে পান করেছি
শব্দটি এখনও তার ওম থেকে শামুকের একপলক শুধু

পিনাকী ঠাকুর

ভাল পাহাড়

এখনও সূর্য উঠছে। ধ্যানে বসেছেন
‘ভাল পাহাড়’-এর কমলদা।
ভোরের ছাত্ররা আসে দূরান্তের
গ্রাম থেকে পড়বে ভরপেট খাবে।
ফিরে যাবে বিকেল-বিকেল।

এত জল কীভাবে আসছে? হাসি।
বিদ্যুৎ? ওষুধ? এত খরচ কীভাবে?
কেউ জিজ্ঞেস করে না। কেউ করে।
নিউ দিঘা, ছুটি পার্ক, সবুজ দ্বীপের পর
ভাল পাহাড়ের দেশ জিলা পুরুলিয়া।

সবাই ট্যুরিস্ট! আর আমিও আড়ালে
পাহাড়ি নদীর স্রোতে কামুকের মতো এই

ঝাঁপিয়ে পড়লাম...

সমরজিৎ সিংহ

কবিতা

ঘরে ঘর নেই, রাস্তা ছিল না রাস্তায়।
এ কেমন দিন এল আজ,
হাত নেই হাতে, শরীরে শরীর নেই!
প্রেতভূমি জানে, নৃত্য শুরু হয়ে গেছে সেই কবে।
তুমি কি দর্শক? চোখ নেই, তবু তাকিয়ে রয়েছ
অভ্যেসবশত।

“মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়”

বিনয় মজুমদার

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

ভোগ

ব্যথা হোক, ব্যথা চাঁদের নিয়মে
কমতে থাকুক, বেড়েই চলুক!
আমি তো তোমার কাকপক্ষীটি,
নিজেকে নিজেই বুঝতে দেব না—
প্রেমে আছি, নাকি মন্ত্রে মজেছি।
জ্যোৎস্না পড়েছে গুঁড়ো-গুঁড়ো,
আমি অপমানগুলো জড়িয়ে নিয়েছি
চালকলা যেন, প্রহারে ভিজিয়ে
প্রসাদ মেখেছি!
মেঘেরা যখন আলপনা দিল,
বজ্র যখন নিনাদ বাজাল,
ভোগের বাসনে বেড়াল কাঁদল,
আমি তো ছিলাম মধুপর্কের বাটির মতোই
অল্পে কাতর
যায় আসে না কিচ্ছু!
নাটমন্দিরে
টাটকা যোনি ও স্তন লাগিয়েছি
পুজো শুরু হোক।

রাণা রায়চৌধুরী

মৃতের গান

পাখিদের ওড়াউড়ি দেখি।
দেখি হাবুর বাবা পায়রা ওড়াচ্ছে
অমি উড়ি না কেন? কেন উড়ে যেতে
পারি না রেবাদির গানজানা ডালে?
পাখির পিছু পিছু দূরে যাই,
দেখি দূরত্ব বাড়ে তোমার আমার ভিতর।
মাঝখানে গঙ্গা বইছে, মৃত নৌকো ভাসমান
মাঝখানে অগ্নিসাক্ষী, মাঝখানে দলিলপত্তর
আমি উড়ে গিয়ে বসি ব্যানার্জির দলিলে
ব্যানার্জি-বৌ রে রে করে ওঠে,
ভাত ফোটে পাখির পালকে—
চাল ফোটে আদিগঙ্গার তীরে, পাখি
ফোটে টগবগ, তবু আমি উড়িতে পারি না
আমি শুধু ওড়াওড়ির ভান করি এই
সামান্য স্বল্প বেতনে।

অংশুমান কর

আন্ডারগ্রাউন্ডের কবিতা

আলোয় ভরে উঠছে শহর
আর ভয় করছে।
না, কীভাবে ঘুমোবে চড়াই পাখিগুলি
সেকথা ভেবে নয়—
মোটরসাইকেলের পেছনে দুলতে থাকা মালতীলতাকে নিয়ে
এবার কোথায় দাঁড়াবে যুবক
সেকথা ভেবে নয়
বাবার আঙুল শক্ত করে ধরে
আর কেউ কি কোনওদিন পার হবে না পথ
না—সেকথা ভেবেও নয়—
আলোয় ভরে উঠছে শহর
আর ভয় করছে এই কথা ভেবে যে,
অন্ধকার ছাড়া দিনবদলের স্বপ্নগুলি
বাঁচবে কীভাবে!

কৌষিকী দাশগুপ্ত

কমেডি, কেচ্ছা ও কৃষ্ণগহ্বর

হাসি পায় অনেক কারণে।
একটি হত্যাদৃশ্য রচিত হবার আগেই কুম্ভীলকের মতো কেউ
কৃষ্ণগহ্বর থেকে তুলে নেয় অন্ধকারের যাবতীয় দোষ,
তুলে নেয় উনিশশো চুরাশির বেহালা, সেনগুপ্তর নাটক
দেশপ্রেমিক যেন, আকণ্ঠ সর্বনাশ জেনেও চুরি করে
বিকেলবেলার মাঠ।

হাসি পায় অনেক কারণে।
শেষপর্যন্ত ওই দুইজন বেঁচে থাকে।
কার্নিভালের রাতে ওরাও তো কিছু চায় শরীরের বিনিময়ে।

কে দেবে প্যাশন, কে দেবে প্রজ্ঞা, জানা নেই।
শুধু জানি ওই দুইজন বাদে লুচ্চা আর সব,
কমেডি লেখা হলে কেচ্ছা লিখবে যারা,
তারাই কেটে দেবে দোলনার দড়ি, কিউবিক প্রতিশোধে।

হাসি পায় অনেক কারণে,
ভণ্ডামির কোনো শেষ নেই,
ভণ্ডের কোনো জাত নেই
তোমাদের হতভাগ্য শহরে।

দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়

কবিতা

ভালবাসি বলব না কক্ষনো
কেননা ওকথা রোদ, গায়ে মাখতে হয়

ভালবাসি বলব না বলব না
কেননা যন্ত্রণাগুলো বুকের গভীরে
যেন মাছ। রংবেরং মাছের শরীর।

কেবল ধূসর থেকে নীলে
একটা পাথর আজ পথ হয়ে থাকে
সে'পথে হেঁটেছে যারা জানে
ভালবাসি বলতে নেই কেননা ওকথা
আগুনে পুড়েছে প্রতিদিন

আমি তার ভস্ম গায়ে মেখে
উদোম সন্ন্যাসী।

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়

মহাকাল মন্দিরের সিঁড়িতে

সুযোগে মধুর তার সমস্ত সকাল।
সংযোগে পতাকা তার নিহিত পরিধি,
যোগাযোগে ক্ষীণ তারও শব্দগন্ধমধু
তবুও রেখায় গাঢ়, রঙে স্রোতস্বিনী।
নৈরাজ্য স্বীকার ক'রে শব্দ যায় দূরে
অর্থের কটাক্ষ আরও ভাঙনে স্বৈরিণী
নুড়ি ও পাথরে বাজনা, ঝরনায় আছাড়
সত্য যে কঠিন তাই মিথ্যাও কঠিন।

কঠিনেরে ভালবেসে যে মরে হেঁদিয়ে
রূপে সেও ভয়ানক, সন্ত্রাসে বিধুর
রক্তের পিছলে তার খেলনা স্লেজগাড়ি
সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ল বালতি, পিচকারি!

খুনে তার কাকপক্ষী টের পেল না সুতো,
এ-লেখাও শেষ হচ্ছে অসম্ভব দ্রুত।

মৃণাল বসুচৌধুরী

সারাদিন সারারাত

সারাদিন
আশ্চর্য নীলিমা মাখা আলো
পুষ্পরথ
মুগ্ধ হাতছানি
সারারাত
মেঘে মেঘে ঢেকে থাকা মায়া
অভিলাষী অলস সাম্পান
সারাদিন
অলস মুহূর্ত জুড়ে নিঃসঙ্গ ময়ূর
শব্দ স্বরলিপি চিত্রভাষা নিয়ে
সারারাত বিষাদপুরাণ
সারাদিন
পুরনো অভ্যাস নিয়ে বেঁচে থাকা
দূরত্বের মাপ পরিমাপ
সারাদিন নিষ্ঠুরতা নির্বোধ আগুন
শিরীষ গাছের নীচে
নিষিদ্ধ ছায়ার সঙ্গে
সারারাত শূন্যতার
শিথিল শিকড়

সারাদিন বাঁচার অভ্যাস
সারারাত স্পর্শাতীত স্থির মুখোমুখি
মায়াজালে
বিষণ্ণ নৌকার দাঁড়ে
আশ্বিনের চাঁদ

"আমার লেখার খাতা অজ্ঞান
অনিশ্চয়তায় ভরে গেছে"
উৎপলকুমার বসু

প্রতিমা রায়

কবিতা

তসলিম করো এই তোমাকে কাজুফুলের বনে
আগামী বছরের সুগন্ধ আমারও দেব কল্পনা।
ঢেউ ঢেউ ধ্বংসাবশেষ ঝাউবনে
বাস্তবের উপর আমিই সময়
আমিই বাতাস উন্মাদনা।
নিছক পথচারী সূর্য সেই থেকে।
তোমাদের যাওয়া আসা জানি
প্রতিভার বিচ্ছুরণ
সমুদ্রবক্ষে জেগে ওঠা দিনের মতো যাত্রা।
এই বিকেলের ধ্বংসসাধন আমার সৃষ্টি
আমি জঙ্গল বানাতে পারি না
সুগন্ধ বানাতে পারি না
ওরা এমনিই হয়।
যেভাবে এমনিই আল্লাহ সংগীতে মহাবিশ্ব তোমার
আলফাজে।

ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় যাবার কথা

চৌমাথার মোড়ে এসে বারবার দিগ্‌ভ্রান্ত হই;
কোন পথে যাব বলে জমিয়েছি খুদকুঁড়ো এত?
কোন পথ অকপট সূর্যোদয়ের দিকে ধায়?
ছোট্ট কুটিরখানি জ্যোৎস্নায় ধোয়া, কোন পথে,
খড়ের চালেতে যার চালবাটা আলোর উদ্ভাস?
আলো, শুধু আলো চেয়ে ভুল পথে কোন কানাগলি?
কোথায় যাবার কথা, কে যেন সে অপেক্ষায় আছে,
ভুল হয়ে যায় সব! ভুল পথে এগোবার ভয়ে
থেমে যায়; ফেলে যাওয়া মোড়গুলি ফিরে ফিরে আসে,
অক্টোপাসের মতো কিলবিল রাস্তাগুলি ডাকে,
আসলে তো সব পথই কানাগলি দুঃস্বপ্নের মতো!
আবার সমস্ত পথ হঠাৎ আলোর দিকে ফেরে,
তবু ভয়, থেকে যাওয়া, ফিরে আসা তবু!
চোখে শুধু লেগে থাকে লক্ষ্মীপ্যাঁচার মতো মৃদু
চাঁপার রং স্বপ্ন এক, জ্যোৎস্নার আলপনায় আঁকা।

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

চেনা মানুষেরা

কী জানি কোথায় সারসেরা উড়ে যায় বেলাশেষে
জ্যোৎস্নাগাছের নীচে জমে থাকে অন্ধকার
ওখানে কি ভিড় করে তারা
নাকি উড়ে যায় দক্ষিণের বনে
আমার এইসব জিজ্ঞাসার
উত্তর দিতে যে
বহুদিন দেখি না তাকে
বহুদিন যাদের দেখি না
বড় শঙ্কা হয়
ঘুম ভেঙে বারবার
সেইসব মুখেদের জীবন্ত দেখি
তখনই সন্দেহ হয়
আশা করি ভালো আছো চেনা মানুষেরা

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋতু দ্বিপ্রহর

ধুলো কাঁপা হলুদ পর্দা ও তার ক্রমশ বাষ্পহীনতা নেমে আসছিল
শূন্যে তোলা অসতর্ক পদক্ষেপ—
কোথায় দিকচিহ্ন কোথায় বাক্যবিন্যাসের শাঁস জেগে থাকবে
এই ব্যবহারহীন সময়ে—ভাবি শরীর ক্রমশ দূরত্বজ্ঞাপক
কেন—এই কাগজফুল ও পেঁয়াজের খোসার বেগুনি চিরে পড়ে
থাকা অস্থিরঙের প্রবেশ আমাকেই টানছে—এই যে বারবার
মাথা ঠোকা আমাকে কি কোনও বরফের দেশে নেবে—পাথর
ও জিজ্ঞাসাপূর্ণ সম্মোহিত ধূসর গলার তোতা আমাদের আকাঙ্ক্ষা
থেকে সরে থাকে—প্রতিনিয়ত নামক অভ্যাস বস্তুত কথোপকথন
থেকে আরেকটু বেশি প্রস্তরিত মেঘে সরে যায়।

এইভাবে বাষ্পঘেরা গেলাসের স্বপ্ন—নিয়ত সহকর্মীর শ্লেষ,
ক্রমশ শিথিলতা মানে স্নেহ ও উত্থান—আমাদের বাধা দেয়
ক্রমশ পাথুরে রাস্তার দিকে উঠে থাকা শুকনো প্রাগৈতিহাসিক
বৃক্ষজাতি শুষ্ক গিরিখাতে—সেই তো দেখা—দৃষ্টি আসলে একটা
উজ্জ্বল হলুদ লেগে অন্ধ শহর—পরপর উৎখাত হওয়া কৃষি
আসছে—উৎখাত হওয়া না লেখা ব্যাকরণের উল্লাস—আমরা
তো আগুন চাইছি—দীর্ঘাঙ্গী মেয়েদের ছায়ায় যে পিঁপড়ের দল
জল ভেবে ভিড় করল, সেখানেই তো বারবার শরীর
পেতেছি—প্রতিশব্দহীন যন্ত্রাংশ ও হাঁফানো শ্বাপদের আওয়াজে
মিশিয়ে দিয়েছি শ্বাসকষ্ট মাংসল কামড়।

প্রীতি আচার্য

মৃত্যুকল্প

মা-কে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে।
কাঁধ দেবার অধিকার মেয়ের নেই। দূর থেকে
সঙ্গী হলাম মায়ের।

ছেলেরা ধুনী দিচ্ছে
গ্রামের শ্মশান ঝোপঝাড়ে ভরা
পরিষ্কার করে নিচ্ছে কেউ কেউ

বৈদিক মন্ত্র হাতে বাবা নিশ্চুপ
আজ থেকে কার সাথে চেঁচিয়ে কথা বলবে বাবা?

মায়ের ঠোঁটে তখনও লেগে আছে লাল
চেলিকাঠ তুলতে গিয়ে কেটে গেল বড়দার হাত
ওহ্ মা, বলতেই, মনে হল, এই বুঝি
বোরোলীন হাতে ছুটে আসছে মা!

রম্যাণী চৌধুরী

উড়ান

চলে যাচ্ছি এক আর শিখছি উড়ান
যতটা উড়ান শিখলে মাটিতে
ছুঁয়ে রাখা যায় পা
আকাশ উড়ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে বেডরুম
ফারাক কমতে কমতে শ্বাস নিতে
পারছি না আর
পারছি না বৃথা বিশুদ্ধ উচ্চারণ
সারথি হোক বা সখা...
এসো,
এইবেলা ধারণ করি নিষিদ্ধ জীবন—
যৌন অযৌন! কী বা এসে যায় তাতে।

রজতশুভ্র মজুমদার

সর্বগ্রাসী

বকফুলের ভেতর থেকে উঠে আসা প্রতিটা মনখারাপের অণু নীল নিঃসঙ্গতায় ভূষিত হয়ে রুপোর আতরদানিতে মিশে যায়। তারপর পুঁতির মালায় বিদ্যুৎ চমককালে স্বপ্নের জামরুল গাছে ডাগর ফল আসে। অভীপ্সার আশ্চর্য রেকাবে পঞ্চপ্রদীপের অলোকসামান্য উদ্ভাসে উদ্ভাসিত হয় অজস্র মায়াবী হাঁসের ঠোঁট। নৈবেদ্যের নক্ষত্রমালায় ধূপের কথকতা মাখিয়ে রক্তসন্ধ্যা ফোটে সারা আকাশে। প্রেয়সীর হিমেল শরীর জুড়ে তখন তীব্র স্নানের গন্ধ। গোলা হলুদ গড়িয়ে নামে তার হাঁটু বেয়ে, ছড়িয়ে যায় পায়ের পাতা বেয়ে সমগ্র মেঝেয়। হিরণ্ময় আলোয় চিরবিরহিনীর বুক থেকে তখন হলুদ বেনারসির গন্ধ আসে...

২

দূর আলপথে সাদা স্তব্ধতার অনিঃশেষ আলপনা। দুপাশে সোহাগী বকুলফুলের বিচিত্র সম্ভার অপরিচয়ের অভিমানে জর্জরিত। কচি কলাপাতার মতো সবুজ এই দিন...
একটু একটু করে পাখি ডাকতে শেখে। তার কথাকলিতে দিন বড় হয়। দিগন্তের নরম কোলে মাথা রেখে শোয় সে।
কেঁপে ওঠে ফাল্গুনের আলো। তার বিধুর ঠোঁট চিকচিক করে, দীঘল চোখে আছড়ে পড়ে বিরহের ঢেউ, যন্ত্রণার ফেনিল

উচ্ছ্বাস গড়িয়ে নামে নিথর চিবুক বেয়ে...
বসন্তের মাছ জল কেটে এগিয়ে যায়। ছলাৎ ছলাৎ। সুদূরের উন্মাদনে সেই শব্দ মিলিয়ে দিয়ে উদ্দাম বেগে দানবের মতো এগিয়ে আসে সর্বগ্রাসী ভালোবাসার ডাক...

কার্তিক নাথ

।। **কাব্যগ্রন্থ** ।।

- নির্ভর রঙের অনন্ত নৌকা (এই সহস্রধারা)
- অস্পষ্ট উপত্যকা (কবিতা পাক্ষিক)
- তারপর অন্ধকার দেশ (প্রতিভাস)
- চাঁদটা উঠতে দাও (শিস)

তারেক কাজী

পুরাতনী

তখন চারপাশে হন্যে হয়ে খুঁজে
মাঠের এককোণে
একটুখানি বসি
আর ভাবতে থাকি
কখন দেখা হবে

কেউ কি তবে এসে
খবর দেবে কিছু
হাজার কথা আসে
মনের জলে ভাসে
ফের ডুবেও যায়।

সেই তো শেষ দেখা
ছিন্ন হল মালা
আজও জ্যান্ত স্মৃতি
আর ক্ষতের জ্বালা
বেঁচে থাকার জ্বালা

শ্যাম রায়

ত্রিশ মিনিট দূরত্বে

অন্ধকার থেকে ত্রিশ মিনিট দূরত্বে দাঁড়িয়ে
তুমি
আমি
অথবা ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করছে সকলের জন্য

এই ত্রিশ মিনিট হাতের তালুতে নিয়ে
কীভাবে ভোগ করবে তোমার নিজস্ব ব্যাপার

চারতলা বাড়ি
দামি গাড়ি
ব্যাংক ব্যালেন্স নিয়ে
তুমি ব্যস্ত থাকতে পারো

একটা সিনেমা তৈরি নিয়ে
তুমি ব্যস্ত থাকতে পারো!

কয়েকটা কাব্যগ্রন্থ নিয়ে
তুমি স্বাভাবিকভাবে ব্যস্ত থাকতে পারো!

তবে বারবার মনে রেখো
অন্ধকার থেকে ত্রিশ মিনিট দূরত্বে
তুমি
আমি
অথবা ত্রিশ মিনিট দূরত্বে অন্ধকার সকলের জন্য

"সোনালী সুতোর ঋণে পৃথিবীকে দিয়েছো অশেষ
যন্ত্রণা, এখন মরো, মরে যাও"

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মলয় গোস্বামী

ব্লাউজ

এমনিতেই একটা ব্লাউজ নিয়ে কবিতা লিখতে পারেন

একটা উদার অভ্যুদয় সেই ব্লাউজ থেকে পাবেন কি না
তা সময় বলবে, আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না
যেমন অনেকেই বুঝতে পারে না নিজেদের পানের বরজ থেকে
কখন সাপ বের হবে।

ব্লাউজ নিয়ে কবিতা লেখা মানেই একটু শিরশির
তলপেটের চিনচিন আর গোপন ঝুমুর...
এই নিয়ে আপনি ক্রমশ এগিয়ে যেতে পারেন
হাতে ব্লাউজ ওড়াতে-ওড়াতে পথ দিয়ে হাঁটছেন
সবাই অবাক হয়ে দেখছে আপনাকে
আকাশের দিকে ব্লাউজ নাড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ছে এরোপ্লেন

ব্লাউজের এমনই গুণ
যখন কোনও ব্লাউজ খুঁজে পাওয়া যায় কোনও নির্জন মাঠে
ভোরবেলায় পড়ে থাকে কোনও অন্ধগলিতে
শিশিরভেজা হয়ে, তখন
সুদূরবর্তী কোনও ঘর থেকে পাখির মতন কান্না উড়ে আসে...

যা-ই হোক, ব্লাউজ নিয়ে কবিতা লেখার সময়
মনে করা যেতে পারে একটি ব্লাউজের কথা
যেটা ছিল আমার মা'র

ব্লাউজ, মা'র ... আমার মায়ের ব্লাউজ

এ মন মোর

বৌবাজার চলে এল। আপেল এল না!

আপাতনিরীহ বল ধুলো মেখে রাস্তার পাশে
সুন্দরী চলে গেল বলটির পাশ দিয়ে হেঁটে
সে যাবে প্যারামাউন্ট, রঞ্জনের সাথে খাবে
নীল সরবত

আপাতনিরীহ বল, ধুলো মেখে রাস্তার পাশে
আহীর-ভৈঁরো গাওয়া একটি পুলিশ
বলটিকে দেখে ফেলে হৈহৈ বাধিয়ে ফেলেছে
কে এই—বলটিকে রাস্তার পাশে রেখে গেল!
গাড়ি এল, দল এল, স্নিফার ডগও দু'টি এল।

মাঝেমাঝে মনে হয় আপাতনিরীহের মধ্যে
যদি কোনও বিস্ফোরণ গুম করা থাকে
তাকে কি প্রকাশ করা ভালো?

তেমনই প্রথম লাইন কলেজস্ট্রিটের পথে
হেঁটে হেঁটে যেতে যেতে হাতে এসে যায়
বৌবাজার চলে এল। আপেল এল না!
নিরীহ নিরীহ লাগে; ভেবেভেবে খুব হাসি পায়।

আমার যা আছে

নৌকোর পাশ থেকে, জলে কেউ পড়ে গেলে
জল ছিটকে—এসে লাগে অন্য জীবনে

'পড়ে গেল! পড়ে গেল! তোলো ওকে! তোলো তোলো!'
অন্য জীবনগুলো ছটফট ক'রে চলে পাড়ে।

মায়া বাড়ে পৃথিবীতে। যত যুদ্ধ তৈরি হয়
যত অস্ত্র মৃত্যু ফ্যালে শহরে ও গ্রামে
তত মায়া তৈরি হয় ... তত অশ্রু ঝরে বারেবারে।

বোমা পড়ে গ্রুম্ গ্রুম্ ... ওরা চায় — ঘিরে ধরুক রাত।
অথচ মায়ার জল ছিটকে ওঠে চারদিকে
আকাশে-আকাশে দ্যাখো শতলক্ষ বন্ধুর হাত!

সকাল হয়েছে

মহামহিমের ভোর, আয়নায় ঠিকরে-পড়া রোদ।
তার থেকে ঝলসে ওঠা সরু আলো— কে ফেলেছে চোখে!

সকাল হয়েছে, দেখি — উঠোনের গাছপালার ছায়ায়
মৃদুমাটি শান্ত, যেন হালকা ধরনের গান প্রাণে শান্তি দেয়।
উঠোন-পেরনো-পথে দু'একটি শালিখের ছানা
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে ... এরকম মনে হয়... আসলে খোঁড়ানো নয়
খাবারের কোনও দানা খুঁটে-খুঁটে খাবার এই পদ্ধতি নিয়ে
তাকে যে খুঁড়িয়ে চলতে হয়, ঠিকানাবিহীন।
মহামহিমের ভোর। আমার আর — পাখিদের দিন।

ভাঙা আয়না

বিষাদ! ... ভাঙা আয়না-দিয়ে বিচ্ছুরিত ...

বিষাদ নিয়ে ব'সে আছি
অনন্ত এক সম্ভাবনার জন্যে
এমনি স্মৃতি ... পূর্বদিনের অগ্নিকোলাহলে
এখন যেন আমার কোনও—মন নেই।

হঠাৎ হাওয়া ঘুরে-উঠে বিষাদগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়...
কত মানুষ খাবার জন্য
ভাঙা থালায় ডুবিয়ে রাখে মন

মনের ওপর বিষাদ চাপে
প্রবল চাপে ফেনিয়ে ওঠে জল

বিষাদ! ভাঙা আয়না দিয়ে বিচ্ছুরিত
আয়নাভাঙার মধ্যে আজ
বড্ড কোলাহল...

এ-দেখে আনন্দ হোক

যার হয়, তারই হয়
মেনে নাও সুরের আবেশে

আয়না রেখেছ দূরে ... সেখানেই আছে ভেসে
তোমার মুখের ছবি; তার পাশে আদিগন্ত মাঠ...
ঘুরন্ত পথের পাশে ভাঙা-দোকানির রোগা ছেলে
এ-দেখে আনন্দ হোক
ভুল হল — আয়না ভেঙে ফেলে!

যার হয়, তারই হয়
বিপন্ন জীবন নিয়ে খেলা করে মেধা ও মনীষা
অন্নহীন পেট থেকে
তিরের মতন তীক্ষ্ণ কবিতার আলো
প্রকাশিত হয় ... মাঝে মাঝে।

একথায় বিশ্বাস রাখো
ঈর্ষা লাগে না কোনও কাজে।

স্বপ্ন নু

দু'চোখে, ঘুমের, ছায়াখেলা আর
এখনও আঠালো স্বপ্ন...

দূরের মেঘের অতন্দ্র-মাঠে
ওই মৃত্তিকা শবনম
উড়ছে...কিছুটা পাখির ডানায়
ডানায় লেগেছে নৃত্য...
স্বপ্নেই শুনি দূর থেকে এল
বিদ্যুতে-মাখা কীর্তন—

হঠাৎ ঘুমের বারোটা বেজেছে
সকাল হয়েছে ছ'টা
মাথার মধ্যে শব্দ হচ্ছে
ট্রেনের ঘটাং ঘটাং...

দেখা না-দেখা

সব সময় যে সাপ দেখা যাবে, তা নয়
শুনতে পেতে পারেন লেজের বাড়ির শব্দ বা ফোঁসফোঁস
দেখতে পাচ্ছেন নেতাজি বিদ্যালয়ের গাঁ-ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে
একজন চলেছে ধীর মনে, মন্থর পায়ে, ঘাড় নিচু করে
তার মনের ভেতরে-যে বরফ থাকবেই, একথা বলা যায় না
ঘাড় কামড়ানোর আগে চিতাও ধীরে চলে...

স্বপ্ন এবং স্বপ্নবাঁধানো পুকুর আপনার সামনে রয়েছে
জনহীন... আপনি তার পাড়ে গিয়ে বসলেন
আপনি একসময় বুঝতে পারলেন অন্নপূর্ণা কাঁখে ঘড়া নিয়ে
জল থেকে উঠে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে
ধীরে ধীরে
কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না ... বুঝতে পারছেন ঘড়াভর্তি অন্ন

আপনার চোখ দিয়ে জল পড়ছে মানুষের জন্যে
আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।

যায় গো

বায়ুভুক ... বায়ুভুক ... বায়ুভুক, বায়ুভুক...
ট্রেন যায় ধুকপুক করে..

জীবন অনন্ত বুঝি ট্রেনের মতন
তাকে আমি — রাখি অক্ষরে

বায়ুভুক বায়ুভুক বায়ুভুক বায়ুভুক ...
গিয়ে বসো জানালার পাশে
কত যে নতুন গ্রাম, নতুন মাটির ভাঁড়
স্মৃতিছাই চোখে উড়ে আসে

বায়ুভুক, বায়ুভুক, বায়ুভুক, বায়ুভুক...
ট্রেন চলে — আর ট্রেন চলে ...
শত লক্ষ কোটি দিন অযুতপরার্ধবছর
মানুষমানুষী দলে দলে ...

মারুবেহাগ

শুনেছি কান্নার ধ্বনি, এই তো এখনই ... বাঁশির সুরের মতো
পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে এক ফাঁসির দড়িকে ধ'রে ঝোলে
বাঁশি দোলে ... দুলে যায় ... দোলে...

মারু ও বেহাগ নামে দুই দুটো ছেলে
তরবারি ফেলে দিয়ে অচানক পিস্তল তুলে
বুক খুলে বলে ওঠে, 'আমি কাঁদি; এইখান থেকে ওঠে
পৃথিবী পোড়ানো এক কান্নার ধ্বনি
তোমরা কি শুনতে পাও ... ! যতটা যাওয়ার কথা
মানুষের হৃদয়ের কাছে, তার থেকে বহুদূরে থেমে গেছে
মানুষের পথ।

শুধু তো শপথ নেয় মিডিয়ার ক্যামেরার কাছে। তারপর
নাম হবে ... জনপদ চিনে নেবে মিডিয়ার ছবিটবি দেখে ;
তারপর ফেলে রেখে জীবনের সবটুকু কাজ
তুলে নেবে মিথ্যার সাজ।

হঠাৎ চমকে উঠি — মারুবেহাগের রাগে
কে যে জাগে ছিঁড়ে-ফেলা মানুষের মতো!
আমি কাঁদি। পাতা ছিঁড়ি। উড়িয়ে উড়িয়ে দিই 'দূর হ তো' ব'লে।

কান্নার বাঁশির সুর পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে এক
ফাঁসির দড়িকে ধরে ঝোলে...

তিলোত্তমা মজুমদার

অসম্ভব অঙ্কভর্তি খাতা

প্রগাঢ় অঙ্কের খাতা
তোমার ভিজে শরীরের থেকে জঙ্গলের
গন্ধ আসছিল
অসীম ও দুর্ভেদ্য এক মেঘ
পাঠিয়ে দিল আশ্চর্য আগুন
সারা রাত্রি সমস্ত আঙ্কিক চিহ্ন
শুষে নিতে নিতে
শেষ পর্যন্ত সে আগুন এক অপূর্ব প্রাণের
জন্ম দেয়
সেই প্রাণ সারা রাত ঘুম শুষে নিল
অরণ্যের পাগল ওষ্ঠের
সেই ওষ্ঠের পাশে ঘন অন্ধকারে
জটিল অঙ্কের খাতা চুপচাপ
স্বপ্ন ছাড়াই জন্ম দিল অসংখ্য
পাহাড়ি ঝরনা
নাম নেই
আকাঙ্ক্ষার নেই কোনও
কেবল বয়ে চলা ধর্ম
মহাজাগতিক অগ্নি বুকের ভিতর
আঁচ তুলে
কী সতেজ করে দিল তোমাকেই
ভিজে অঙ্কের খাতা
এখন তোমার শরীরের থেকে উঠে আসছে
আগুনের সেঁকা গন্ধ
হৃদয় পুড়লে এরকম গন্ধ হয়
প্রগাঢ়, অঙ্কের খাতা
জানো তুমি?

২

তারপর দেখা হল
সারা রাত জাগা চোখ
কালো মসৃণ মুখে নিবিড়
নিদ্রার প্রবণতা
উজ্জ্বল নয়নতলে গাঢ় দাগ
জাগরণে মেধাবী কালিমা

বহু যুগ আগে কোন এক
অবরুদ্ধ গণিতের অভিমান
ঘুচিয়ে দিয়েই সে বলল
কে আছ
আমাকে প্রশ্রয় দাও
ভালোবাসো ভালোবাসো

পৃথ্বী পিঠ পেতে দিল
প্রিয়তমা মৃত্তিকার কাছে
মৃত্তিকা নদীর জলে ধোয়া
ঠোঁট জিভ দাঁতের পঙ্‌ক্তি
কখনও বিদ্যুৎ কখনও শক্তিময়ী
উন্মাদিনী জলপ্রপতন

কখনও বালুকা মেয়ে
ত্বক থেকে শুষে নেয়

ঘাম রক্ত খেদ
আর সারা উপত্যকা জুড়ে
পিঠের উপত্যকা জুড়ে
ভোরের আলোর লাল ছোপ

পুলকে পৃথ্বী নিমেষে রচনা করল
সবচেয়ে উঁচু সেই
পর্বতের চূড়া
যেখানে যাবার জন্য
ভালোবাসা জনিত
সব পাপ তুচ্ছ করা যায়

মাটির নিজস্ব পর্বত রমণীয়
দাঁতে বিদ্ধ করে দিল নরম ও প্রবল
পুরুষোচিত কণ্ঠমণিটিকে
ধেয়ে ফেলল পুরোপুরি
আবার জন্ম দিল
খেয়ে ফেলল ফের

আবার জিভের সঙ্গে জিভ
আর যত লুকনো গহ্বর
সূর্যালোক প্রবেশ করে না
শ্যাওলা পিচ্ছিল করে
সমস্ত দেওয়াল
অজ্ঞাত অগ্নিপিণ্ড সহসা স্ফুরিত

পৃথ্বী চিনে নিল তার অস্তিত্বের
প্রথম স্বর্গীয় পথ
পৃথ্বী ও মৃত্তিকা উভয়ত জানে
স্বর্গপথ জটিল ও অনিশ্চিত
মসৃণ অথচ যন্ত্রণাদায়ক
জল ও আগুনের অনাদি বিজ্ঞান।

৩

তুমিই আমার সেই প্রিয়তম গাছ
ঝড়ের রাত্তিরে দু'হাতের শাখায় রেখেছ
আমার শরীরে যত ক্ষুধাকাতরতা
মুছে দাও অপহৃত আঁধারের মতো
তোমার শিকড়ে মাথা রেখে
আমার প্রশান্ত ঘুম আসে।

প্রিয়তম গাছ
একদিন মন্ত্রবলে তুমি চাঁদ হয়ে যাবে
আমি চকোরীর মতো আকণ্ঠ জ্যোৎস্না খাব
আমি তোমার শরীরে মিশে যাব গাছ
আমাকে তোমার দৃঢ় বুকে
বারবার মৃত্যু দাও

তোমাকে ছুঁলেই
জীবন, প্রেম ও মৃত্যু
একাকার হয়ে যায়

৪

আজ বড্ড বেশি কষ্ট পাচ্ছি তোমাকে
রেখে আমায়
তোমার সঙ্গ আসলে এক আশ্চর্য বাতিদান...
আলো ও উষ্ণতায়
একটু একটু করে সম্পূর্ণ ভরে দেয়
আর তোমার চোখের ভিতর বাস
করতে থাকে আমার জীবন
তোমার যে দাঁতে অভিমান বিছিয়ে
থাকে, তাদের ধারালো প্রান্তে আমি জমা
করলাম আমার সুখ
তোমার প্রতি দংশনে
তোমাকে শোনাব
আমার সুখের শব্দ
আমাকে ফেলে তুমি যেখানেই যাও
আর তোমাকে রেখে আমি যেখানেই আসি
শেষ পর্যন্ত তোমার আমার দাঁত নখ
ঠোঁট জিভ দিয়ে যে কবিতাটি লেখা হবে
তার মধ্যেই আমাদের জন্মান্তর
এ জন্ম থেকে কত কত জন্ম
আমি তোমার অপেক্ষায়
তুমি আমাকে কোলে তুলে পান করতে থাকো...
যতক্ষণ না আমি তোমার সঙ্গে
সম্পূর্ণ মিশে যাই।

৫

তোমাকে সামনে রেখে আমি
পটচিত্র এঁকে যাই রাতভর
সেইসব চিত্রপট কিনতে চায়
আমাদের চিত্রলোভী জটিল শহর

কেননা এ শহরের যত মুগ্ধ নারী
দু'চোখে ভাসিয়ে রাখে
মণির বদলে এক প্রবল আহ্বান
তোমার মুখের দিকে চেয়ে ঘন অভিসারী

আমার চিত্ররেখা থেকে তারা
তোমার ওষ্ঠাসব করেছিল পান

তোমার ছবির নীচে আমাকেই হত্যা করে
তাদের গহ্বর যত পারে ভরে নেয়

এইসব কেনাবেচা আমাদের অভিপ্রেত
ছিল না কখনও
আমি তো স্বপ্নের থেকে এনে সাতরঙ
তোমাকে জড়িয়ে এঁকে যেতে চেয়েছি স্বপ্নই

তবুও অপূর্ব সকাল যত রঙতুলি ফেলে
ছবির বাজারে জুটে
তোমার সঙ্গেই যত অনভিপ্রেত খেলা খেলে
আমার দু'হাতে রঙ মাখা

আমার দু'ঠোঁটে ছোটবড় তুলি
তোমাকে সামনে রেখে আঁকি যত রূপ
আর পটচিত্রগুলি
সমস্ত টুকরো টুকরো আমার হৃদয়

তুমি একটু ছুঁয়েছ যখনই
তোমারই নাভিপদ্মে তাদের পুনর্জন্ম হয়
শুকনো ঠোঁটের ভাঁজে
এক কণা রক্ত জমে আছে
কালচে রক্তের ধারে
এক বিন্দু ভুল
প্রথমে সামান্য ছিল
ক্রমশই বাড়তে বাড়তে
এখন বিপুল
তার ভার বয়ে চলা
অসাধ্য মনে হয় এই রাতে
তুমি এসো
দাগ মুছে দাও
ওই রক্ত জমে আছে
তোমারই আঘাতে
আমার ভুলের ভার
আমাকে আনত করে দিচ্ছে
ক্রমাগত
আমাকে বাঁচাও দুই হাতে
ভূমি থেকে শূন্যে তুলে
ভুল থেকে মুছে দাও
এই অদৃশ্য অবর্ণনীয় ক্ষত
তুমি অনন্ত জড়িয়ে থাকো
মাটিতে মিশিয়ে যেতে
দিয়ো না আমাকে
ভুলে ও আঘাতে
ভালবাসা
এভাবেই দু'জনকে আমৃত্যু
বেঁধে রাখে।

৭

এক অফুরান ঘুম
আমাকে তলিয়ে দিচ্ছে
ঘন কালো অচেনা পুকুরে
ওষুধের গাঢ় ঘোর ঘুম
ক্রিয়া করে মগজের পরতে পরতে
শিথিল হাতের নাগালে তোমাকে চেয়ে
দু'হাত বাড়াই
তুমি কোন দূরে
কত কত দূরে
আমাকে শুইয়ে দাও তোমার বুকের ঘাটলায়
সমস্ত ভাসিয়ে দাও
তোমার অনন্তগামী রক্তের স্রোতে
ওষুধ প্রয়োগে কোন ঘুম আমাকে
নষ্ট করে দেয়
ও আমার সতেজ অর্জুন গাছ
আমার ভিতর তুমি হও শুদ্ধ বায়ু
শিকড়ে জড়িয়ে থাক তোমার আমার চির
যৌথ পরমায়ু
এখন অনাদরের কপট নিদ্রায়
তুমি ঠোঁট রাখো
আমার কপালে তুমি ঠোঁট রাখো
ঘুমন্ত ওষ্ঠে দাও ধারালো নির্দেশ
তোমার মসৃণ পিঠে
আমি যেন লিখে যেতে পারি
শেষ শব্দ তোমার আদরে

৮

তুমিই দেবতা হও
আমি হব মন্দিরের বেদী
তোমাকে ধারণ করবে আমার শরীর
পর্বতের চূড়া থেকে
সমুদ্র অবাধ
তুমিই দেবতা হও
আমি হই লক্ষ্য নির্ভুল
আমাকে বিদ্ধ করো
হৃদয়ে ভাসিয়ে দাও একূল ওকূল
আমি হই মৃত্যুর কিনারে
পড়ে থাকা ভোর
তোমার হৃদয় থেকে সঞ্চারিত হোক
মায়ামেঘ
বৃষ্টির মতন ঢেলে দিক
তোমার আদর

তুমি হে দেবতা
আমাকে জড়িয়ে থাকো সারা দিনরাত
মৃত্যু থেকে নিয়ে চলো
অমৃতের ঠোঁটে
যেখানে তোমার আমার কোনও
বিচ্ছেদ ঘটে না
যেখানে তুমি হে জীবন আমি মৃত্যু
হই একাকার
সমস্ত কোষে আর সমগ্র আয়ুতে

৯

কবে থেকে প্রতিদিন বিষণ্ণ বিকেলে
চেয়েছি আশ্চর্য গাঢ়
সে গাছ তুমিই ছিলে
চিনেছি তোমাকে

প্রতিটি বিকেলে আমি অনিরুদ্ধ দুখে
বুকের ভিতর তোষণ করেছি কান্না
আর চরম একাকী
ও আনন্দ
এখন তোমাকে
বুকের গভীরে টেনে রাখি

প্রতি অপরাহ্ণে কত জন
ছবি এঁকে গেছে শুধু গাছের আদলে
ছায়াময়
তারা কেউ গাছ নয়
তোমার মতন তারা গাছ নয়

ছায়ার নিবিড়ে
আমি তোমার ভিতর
মিশে যাচ্ছি শান্তি প্রেম
অপূর্ব পুলকে
মিশে যাচ্ছি ধীরে ধীরে

তোমাকে জড়িয়ে ঘুম আসে
কী তীব্র ভালবাসা
ডুবে আছে গাঢ় বিশ্বাসে

প্রতিদিন বিষণ্ণ বিকেলে সন্ধ্যায়
যত একাকী জলধারা
নদী হয়ে ভেসেছে নৌকায়

আমি আজ নৌকা থেকে নেমে
তোমাকে প্রতিক্ষণ
জড়িয়ে বাঁচলাম

১০

একা মাঠে তুমি বসে থাকো
অপরূপ তীব্র যন্ত্রণায়
তোমার পালক পালক ঘন চুল
ওড়ে এই বাদলের বিষণ্ণ হাওয়ায়

বাদল বরষাকাল অথচ কী আশ্চর্য খরা
তোমার যন্ত্রণা থেকে ছড়িয়ে গিয়েছে
যত বেশি ভালবাসো তত একা
তত বেশি একাকী জড়ায়

অন্ধকারে ছোট ছোট দু'এক কণা
পতঙ্গরা ওড়ে
উড়ে যায় জটিল ধোঁয়ার মতো
অন্যদের টুকরো টুকরো কথা
তুমি তো পাগল
তুমি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কাকে খোঁজো?
কাকে পেতে চাও?
সে কথা বলে বহু দূর থেকে
তুমি কি জানো না তোমাকে ব্যতীত
তারও কষ্ট বয়ে যায় এঁকেবেঁকে
জানো তুমি, সব তুমি জানো
তার স্বরের ভিতরে আঁকড়ে ধরো
তার দুই চোখের বারতা
আর বৃষ্টি নামে
আকাশে মেঘের থেকে নেমে
তোমাকে ভিজিয়ে দেয় তার ভালবাসার নিশীথে

যেখানে ঘুমিয়ে থাকো শান্ত
তার দুই ঠোঁটের উপর
তোমার অতর্কিত ওষ্ঠাধর পেতে
তোমাকে অরণ্যে নিয়ে যাব
তোমাকে নিয়ে যাব নির্জনে
যেখানে সন্ধ্যা আসে ধীরে
আমাদের দু'জনের গৃহের নিবিড়ে

অরণ্যের ভিতর যত নদী ভিজিয়ে দেবে
আমাদের হৃদয় অবধি
একদিন ভোরে তোমাকে সঙ্গে করে
চলে যাব ভালবাসা ভরা লুকনো শহরে
সারাদিন সারারাত তোমার হাতের পাতায়
ঢেলে দেব বিবর্ণ অতীত

তুমিও সমুদ্র হয়ে ধুয়ে দাও আমার যন্ত্রণা
তোমার অতল থেকে নিয়ে এসো
নিবিড় প্রবালদ্বীপ এক
সেই দ্বীপে তোমাকে স্নানের ঘরে
ভেজাব জ্যোৎস্নায়

সে আলো চাঁদের নয়
কোন হৃদিপদ্ম থেকে তার বিকিরণ
সম্ভব হয়
সেই স্পর্শে তোমার নাভির থেকে কস্তুরীর
গন্ধ উঠে আসে
আমাকে পাগল করে দেয়

ও আমার গভীর পাগল
তোমাকে নির্জনে নিয়ে যাব। শহরে। বনে।
আমাকে তোমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখতে দিয়ো
এমন পাগল করে দিয়ো
যাতে আমি তুমি ছাড়া অন্ধ হয়ে যাই

১২

আজ মেঘে মেঘে
আদরের মতো খেলা করেছে বিদ্যুৎ
কী উন্মাদ ঝড়ঝঞ্ঝা খেলা
যেভাবে আমাকে তুমি উথালপাথাল করে দাও
সেসব ছবির মতো সাজানো ভোরবেলা
তুমি ছাড়া কাকে আমি দু'হাতে জড়াই
মেঘপুঞ্জে বিদ্যুতের চূড়ান্ত কামড়
আমাকে প্রলুব্ধ করে তোমার সন্ধানে
তোমার ধারালো দাঁত চিহ্ন দেবে
সমতলে পাহাড়ে পর্বতে
সেই প্রলোভন
আমার পুণ্যের মতো মনে হয়
পুণ্য তোমার চেয়ে সুন্দরতর নয়
এই সঘন বরষা
তোমার মধ্যে ডাক দিক গতিশীল
তার জলে স্নান করব বলে
আমার আনন্দদ্বয় সাজিয়ে তুলেছি
ফুলে ফুলে
কখন আসবে তুমি
কখন আমিও যাব তোমার দাঁতের
দংশনে বিদ্ধ হতে
আমাকে আহ্বান করো এই পাগল বর্ষণে
তুমি হে আমার পাগল
আমাকে পাগল করে দাও
তোমার জন্যই আমি উন্মাদিনী হতে
রাজি আছি।

১৩

ভালোবাসা টুকরো টুকরো কথা বলে
আমাকেও গড়ে নেয় তোমার আদলে
কেননা ঈশ্বর আঙ্কিক নিয়মে
তোমার ভিতর বসত গড়েছেন
সে-বসতি আমাকেও ভালবাসা শিক্ষা দেয়
বাইরে ভিতরে
অসীম সংখ্যা থেকে নির্বাচন করে
তুমি যে তোমার চোখে আমাকে রেখেছ
তার মন্ত্রমুগ্ধতায় তোমার শ্রীকৃষ্ণ পায়ে
ঈশ্বরের দু'টি পা পেলাম
তুমিও ঈশ্বর কবে থেকে অভিন্ন হৃদয়
সেই হৃদিপদ্মে বসে
তোমাকে বুঝতে বুঝতে চলে যাবে দিন
ভালবাসা দিয়ে রেঁধে দেব পরমান্ন
তোমাকে খাইয়ে দেব আমার হৃদয়
আমারই তীক্ষ্ণ ঠোঁটে গেঁথে
যেভাবে অন্ধকারে পবিত্র নিশাচরী
মৃত প্রাণী পুলকে খাওয়ায়
তার আদরের নিশাচরটিকে
সেখানেও ঈশ্বরের সঙ্গে তুমি মিশে যাও
আঙ্কিক নিয়মে
আর আমি তোমার পায়ের কালো উপত্যকায়
ঈশ্বরের পায়ে চুমু খেতে খেতে
তোমায় মিশ্রিত হই গাঢ় অন্ধকারে
আমার বসন খুলে ফেলি
এসো হে ঈশ্বর
খুলে ফেলো তোমার বসন
এবার দু'জনে জগতের প্রিয় খেলা খেলি।

১৪

সমস্ত স্বপ্নের দরজা বন্ধ করে
তুমি শুয়ে থাকো
তোমার ঘুমের স্তরে
কত সবুজ বনানী বর্ষায় প্রাণবন্ত হয়
আমি দুয়ারে দুয়ারে বাজাই মধুর ঘণ্টাধ্বনি
যদি খুলে দাও, যদি জানো, জানতে পারো
আমি কী প্রবল উন্মাদ
আজ আমি সব কাজ নির্জনে সাধন করব বলে
আমার হৃদয়ের নীচে লুকিয়ে ফেললাম
যে আতপ্ত কক্ষে তুমি ছাড়া আর কারও
প্রবেশ নিষেধ
যদি জানো, জানতে পারো
তোমার স্পর্শে আর্দ্র কম্পিত যোনি থেকে

ভূমিষ্ঠ হয়ে চলে কত সব
অযোনিসম্ভব
প্রত্যেক জন্মের প্রতিবিন্দু ক্ষরণের পর
আমি হই অক্ষতযোনি
তোমার আবির্ভাবে নারীজন্ম সার্থক করব বলে
আজও সুকুমারী
আজও কারও ভার্যা নই, প্রিয়তমা নই,
কেউ ভালবাসেনি আমাকে
আর কারও দ্বারে নিজের উদ্‌যাপন করিনি কখনও
উপনীত করিনি নিজেকে
দুধে সিক্ত জননী ভূমিকা
আমি চির স্বেচ্ছাভিখারিনি
যার এ ভূমির সঙ্গে তুমি ছাড়া আর কোনও যোগ নেই
তুমি দ্বার খুলে তার দিকে ছুড়ে দিয়ে চূড়ান্ত নীরব
আমার শেষের নীরবতা।

১৫

চাওয়া ও না পাওয়ার মাঝখানে বিবাদ বসত করে
যখন ছেড়ে যেতে চাই না একটুও তবু যেতে হয়
তখন তোমাকে দাঁতে নখে ছিঁড়ে ফেলতে চাই
মনে হয় টুঁটি টিপে ধরি, কামড়ে দিই গাল
আমাদের মাঝে ক্রোধ ও কলহের ছায়া পড়ে
কোথা থেকে উড়ে আসে লাল ডানা নরকের পাখি
তোমাকে না পেলে, ঘোর বিকারে, তাকে বুকে ধরে থাকি
সে ঠোঁট বিঁধিয়ে ক্রমশ ঠুকরে যায় আমার মানস
আমি ক্ষ্যাপা সারসের মতো ঠোঁট ঝলসাই
ঝড়ে মেঘ উড়ে গেলে যেভাবে আকাশে জাগে আলো
আমার ক্রোধের শীর্ষে তুমি স্নিগ্ধ, ভালবাসা ঢালো
বশ করে ফেলো পুরোপুরি দু'চোখের সজল বিদ্যুতে
তখন ইচ্ছে করে দু'কূল ছাপিয়ে নদী হই
আমার চুলের ভাঁজে, বুকে ও নাভিতে
আগুনের পিণ্ড নাচে মহাকাল নির্দিষ্ট মুদ্রায়
তোমার বিশুদ্ধ হৃদয়ে লোভ ঈর্ষা পাপ
আমার সকল পুড়ে যায়

১৬

আমাকে পাতাল থেকে এনে
তুমি বসিয়েছ পৃথিবীর অলীক আসনে
আমি ভুলে থাকি অত্যাচারী
দৈত্যের কাহিনি
যারা আমাকেই ছিঁড়ে ফেলত
আমাকে ভক্ষণ করে
মায়ামন্ত্রে
আবার লাগিয়ে দিত মেদ-মাংস-ত্বক
কী ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণা প্রতিদিন
মনেই পড়ে না
এই সজল বাতাসে, স্নিগ্ধ আকাশের নীচে
যেখানে গভীর প্রেম
সাজিয়েছে নক্ষত্র ফলক
তোমার আশ্চর্য ঋণ কী দিয়ে মুঠি
লুঠ করে নিয়ে গেছে আমার দু'চোখ
যদি দু'একবার দুঃখের কথা বলে ফেলি
তুমি ক্ষমা কোরো
পাতালের দৈত্যদের কথা আমি ভুলে গেছি
শুধু মনে পড়ে, কান্না বা প্রতিবাদে
ওরা একটাই চাবুক চালায়
কত সহস্র বছর প্রতি রাতে
চাবুকের সর্পিল জড়িয়ে
ধারালো পাথরে ঘুমিয়েছি
তুমি এত ভালবাসো
আমাকে বসিয়ে দিলে আলোকিত
জগতের নরম আসনে
আমি ভুলে গেছি। কষ্ট অপমান
যন্ত্রণা ব্যথা কাতরতা
শুধু একবার বলো
তোমার নবার্ক শরীরে
লালাসিক্ত চুম্বনের পর
আমার কি সময়ের দায়ে লজ্জা পেতে হয়?
আমাকে সহস্র রাত্রির লজ্জা পেতে হয়?

১৭

আমাকে স্মার্ত করে দিয়ো না তুমি
আমি হয়ে যাব এক শ্বাপদ সঙ্কুল
বনভূমি
তোমার ওই সাদাকালো বুদ্ধিমান খোপে
এসে যাবে শ্বাপদের দল
আমি অরণ্যময়ী হলে
আমার তো শ্বাপদই সম্বল
আমাকে স্মার্ত করে দিয়ো না তুমি
তোমার হৃদয়ে ঘুরে ঘুরে
যেখানে পেয়েছি ভূমি
সে তোমার হৃদিশীর্ষ নয়
একথা জানার পরও
নিজেকেই সবচেয়ে উঁচু তারা মনে হয়
তারার আলোয় আমাদের অলৌকিক স্নান
ধারাজলে তুমি অপরূপ ভিজে ওঠো
আমি একাকী দেখেছি তোমাকে
একাকী হয়েছি আবেগময়ী নিয়ন্ত্রণহারা
তারপর ঘুমোইনি একদিনও
তোমারই সৈন্যদের বশ করে

ভালবাসতে পাঠিয়েছি যার যার প্রিয় পক্ষীদের
ঘোড়াকে দিয়েছি দানাপানি
আমার নিজের বলে আর কিছু নেই
যতেক সাম্রাজ্য পেয়ে খুশি হয়েছেন রাজারানি
শুধু হৃদয়ের কোনও দাবি নেই
যতক্ষণ তুমি তাকে মূল্যবান ঘোষণা করছ না

১৮

আমার চেতনায় তুমি
আমার হৃদয়ে
তবু কাল রাত থেকে
তোমাকে দেখেছি ভয়ে ভয়ে ভয়
তোমার আমার মধ্যে
এভাবেই আঁধারের নবজন্ম হয়
আমি দূর থেকে
দু'হাত মেলেছি
আলো দাও
তুমিই দিতে পারো
ক্ষমাশীল আলো
আমি শুধু ভালবাসতে পারি
দুরের চৌকাঠে বসে
বেসে যাচ্ছি ভাল
এই দূর আকাঙ্ক্ষিত নয়
আমি আর আমার চেতনা
অসহায় শব্দস্রোতে
ফেলে দিচ্ছে পীড়িত সময়
তাকে ঝাঁকিয়ে বিপন্ন করে
চলে যায় অলীক হৃদয়
আমি তাকে ছুঁতেও পারি না
অদ্ভুত পীড়ন থেকে উঠে আসা
গাঢ় আর্তনাদ
তুমি কি শুনতে পেয়েছিলে?
তোমার মধ্যেও আমি
দেখিনি তোমাকে
এ তুমি আমাকে কার
আদরের পরমায়ু দিলে
তুমিই একমাত্র পারো
তুলে নাও উদ্‌ভ্রান্ত অসুস্থ
আমার হৃদয়
ভয়—
তোমার আমার মধ্যে
এই ভয়
আমাকে মারছে প্রতিক্ষণ
আমি তো পাপের হাতে
দিইনি নিজেকে
আমি তো প্রলুব্ধ নই
নক্ষত্র গমনে
শুধু তোমাকেই পেয়ে চেতনায়
তোমার সঙ্গেই বসবাস করি
নিরন্তর
তবুও হৃদয় বিদ্ধ করে
ভয়ের নখর
ভালবাসি—
আর অপেক্ষায় থাকি
তোমার আসার
এসো, নির্ভয় করো
ভালবাসা

১৯

আমি সবাইকে সত্যি ভালবাসতে চেয়েছি প্রতিদিন
যে ক'টি জোনাকি চুপচাপ উড়ছিল
উদরে প্রেমের আলো জ্বেলে
তাদের সবার জন্য ভালবাসা
ফেলে গিয়েছি আমি মধুর মতন ফোঁটা ফোঁটা
আর গাছগুলি সবুজ পাতায় ঢাকা
শাখায় শাখায় লেগে আছে
বৃষ্টির আদরের দাগ
দিনের বেলায় দেখো তুমি
তাদের সবার ওই শ্যামল শরীরে
আমার ভালবাসার পুষ্প ফোটা
আমার ভালবাসা কিংশুক
তুমি তো চেনোই
তোমার বুকেই প্রতিদিন লেগে থাকে
তাদের পরাগ
সবাইকে ভালবাসতে চেয়েছি আমি
যে ছেলেটি অনায়াসে
শুদ্ধ উচ্চারণে বলছিল নারীকে খানকি
যে মেয়েটি একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে
হয়ে গেল আধুনিক পাখি
আর তার গর্ভে কোনও পুত্রের জন্ম দেয়
দেবতার বরে
যে ছেলেটি সমস্ত পিতাকে বলে লিঙ্গবান
আর বেশ্যালয়ে টেনে হত্যা করে
তারও হৃদয় থেকে বিপথগামী সুর
মুছে দিতে
আমি যেতে পারি বহু দূর
তুমি তো জানো
আমি ভালবাসতে গিয়ে কতবার ঠকে গেছি
মার খেয়ে ঠোঁট ফেটে গেছে
গণধর্ষণের ত্রাসে আমি কতবার

পালিয়ে গিয়েছি বনবাসে
কতবার গুলিবিদ্ধ হয়েছে হৃদয়
তুমিই উপড়ে তুলেছ সমস্ত ভয়ের কার্তুজ
আমি তো ভালবাসার অপূর্ব জগতে
বিশ্বাসের মহাস্তম্ভ স্থাপন করলাম
বনভূমি থেকে আনা সুগন্ধী কাঠ
পবিত্র বেশ্যালয় দিয়েছিল
কারুকার্যখচিত কবাট
আর গরম বিছানা
তার ওপর মন্দিরগর্ভ থেকে আনা
চন্দনের প্রশান্ত চাদর
আমাদের দু'জনের বাড়ি
আমাদের দু'জনের স্বর্গীয় আদর
আমরা যে দু'জনেই সর্বস্ব ভালবাসতে পারি

২০

আমি একটু একটু করে জমা করছি তোমার কবিতা
ঠিক যেরকম পিঁপড়েরা খাদ্য জমা করে
অসময় আপৎকালীন
আমাদের পরস্পরের কাছে কোনও ঋণ নেই
যেমন গাছের কোনও কৃতজ্ঞতা থাকে না
আলোর কাছে
আলো গাছ ভালবেসে হয়ে যায় আশ্চর্য সবুজ
আমি ঠিক এরকম অযান্ত্রিক হৃদ খুঁজে খুঁজে
অবশেষে তোমাকে পেয়েছি
কত কোমল কবিতা
তারা সব একেকটি আশ্চর্য স্বপ্নের দ্বীপ
তারা কেউ কেউ সময় উপেক্ষাকারী
স্বর্গীয় উড়ান
আমি একটু একটু করে তাদের আনছি ঠোঁটে তুলে
আমার প্রাণের সেই ছোট্ট কৌটোয়
যেটা খুললেই তোমার সুগন্ধ আসে
এমনই তো হয় যদি দু'টি গাছ নিঃশেষে
অনন্ত ভালবাসে
তোমার কবিতা সমস্ত কথা সাজিয়েছে অন্ধকারে
বেল, জুঁই, শ্বেতপদ্ম, সাদা গন্ধরাজে
আমি তো জানি না
এমন পুষ্প দিয়ে কীভাবে কেমন করে সাজে
আমি একটুও সাজ না পরিয়ে তোমার দু'হাতে
নিজেকে সবটুকু দিতে
ভালবেসে কবিতা লিখলাম জ্যোৎস্নায়
তোমার কবিতার পাশে তারা শুয়ে থাকে
যেভাবে পাখির পাশে ভালবেসে শোয় পক্ষিণী...
আমাদের পরস্পর কোনও ঋণ নেই।

With best Compliments ...

MAMATA FOUNDATION

MUMBAI

পুরনো বন্ধুরা সব স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে

নির্মল হালদার

আমি বিছানাতে গেলাম।
শুয়ে শুয়ে দেখতে পাই, গৌতম টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে শুরু করলেন লেখাপড়া। এক কাপ কফিও আছে, রাত জাগতে সাহায্য করবে।
মাসিমাও শুয়ে পড়েছেন অন্য ঘরে।

কলকাতা গেছি।
তখন একেকদিন এককজন বন্ধুর কাছে রাত কাটাই।
তার আগের দিন কালীদার বাড়িতে ছিলাম বেহালায়। আজ গৌতম বসুর বাড়ি বেলগাছিয়াতে। সন্ধের সময় অনির্বাণের কাছে কালিন্দী গেছলাম আমি আর গৌতম।

অনির্বাণ তখন লাহিড়ী, তার মা আমাকে খুব স্নেহ করতেন।
বন্ধুদের মায়েরা আমার আশ্রয় ছিল।
বন্ধুরা ছিল আমার কবিতার ভূমি।
কলকাতা গেলেই কবিতা নিয়ে যাওয়া।
বন্ধুদের মতামতে নিজেকে ঋদ্ধ করেছি।
দিনে সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, আমি প্রসূনদের বাড়ি থেকে খাওয়াদাওয়া করে বাগবাজার থেকে সোজা রণজিৎ দাশের আপিস। এবং রণজিৎদার আপিস-চেম্বারে নিঃশব্দে কবিতা পাঠ।
রণজিৎদা আপিসের কাছে কবি পরিচয় গোপন করতেন।
বিকেল দিকে অনির্বাণের ব্যাঙ্ক। ধর্মতলা। তার ছুটির পর হাঁটতে হাঁটতে পার্ক পার্কাসের মাঠ। গৌতম বসুও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এখানেই, অনির্বাণ আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমি কী বিশ্বাসে বাঁচি।

আজও কি উত্তর দিতে পারব?

কোনোদিন কাশীদার আপিস ছুটির পর কফি হাউস। কোনোদিন ভূপেনদার বাড়ি। সেখানে পেলামে প্রকাশদাকে। কিঞ্চিৎ পানভোজনের পরেই রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ বিষয়ে বিতর্ক। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কালীদা। আমি নীরব শ্রোতা।
উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠার আগেই কালীদা আমাকে বললেন, চলো ওঠো—

কালীদার সঙ্গে এনাক্ষীদির বাড়িও গেছি অনেক বার। গান শুনেছি। অসাধারণ সেই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীর সঙ্গে দেখা হয় না আর।
হঠাৎ করে শান্তিনিকেতনে একবার দেখা হয়েছিল। আমাকে তিনি চিঠিও লিখতেন। আমারও ছিল চিঠি লেখার অভ্যেস।

চিঠিরা সব হারিয়ে গেল।

বন্ধুরাও কি হারিয়ে যায়?

যখন আমার সমসাময়িক কবিবন্ধুদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইনি, তখন বিভিন্ন কলেজ হস্টেল, মেসবাড়ি, হাতিবাগানের ক্লাব ছিল আমাদের রাত্রি বাসের ডেরা।
সকালে উঠেই সৈকত বলল, চলো আজ টিফিন করব প্রণবেন্দুদার বাড়িতে। সেই প্রথম আধুনিক চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে আমাদের। প্রণবেন্দুদার বাড়িতে সিঁড়ি থেকে ছবি টাঙানো, 'দেশ' পত্রিকায় তিনি তখন চিত্রকলা বিষয়ে আলোচনা লিখতেন।
যাদবপুর গেছি কোনো কাজে কারো বাড়িতে, তখন ঢুঁ মারতেই হবে প্রণবেন্দুদার বাড়ি। ঘরে ঢুকতেই, তিনি বললেন, চলো আজ তোমাদের বিরিয়ানি খাওয়াব।
ট্যাক্সি ধরে পার্ক সার্কাসের কোনো রেস্তোরাঁ।

মনে আছে তাঁর এক বাণী। সকালদিকে সেদিনও গেছি, ঢুকতে ঢুকতে তিনি জানতে চাইলেন, বলো তো আজ কে বিখ্যাত কবি?
সেই রসিকতার সুরে সুরে আমারও প্রশ্ন কবি সমাজের কাছে, বলুন তো এই মুহূর্তে বিখ্যাত কবি কে?

প্রণবেন্দুদার বাড়িতে খরগোশ, কুকুর, এমনকী প্রণবেন্দুদার নস্যিও আমাদের আপন হয়ে গেছল।
শঙ্খবাবুর শ্যামবাজারের বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সৈকতের খিদে বেশি। আবার সে বলবেও না। আমাকেই বলতে হয়, আরেকবার টিফিন হোক।

দুপুর হয়ে আসছে প্রায়।

সন্ধের দিকে তারাপদদার কাছে যাব পণ্ডিতিয়া।
কবি ও সুরসিক তারাপদ রায় আমাকে ও সৈকতকে ভালবাসতেন খুব। তথ্য সংস্কৃতি বিভাগে থাকাকালীন পুরুলিয়া এসে, আমাদের খোঁজ করতেন।
পঞ্চাশের সব কবি হৃদয়বান, উদার। তাঁদের স্ত্রীরাও অসাধারণ সবাই। এ প্রসঙ্গে স্বাতী বৌদির কথা বলতেই হয়। তাঁর অকৃপণ ভালবাসা, আজও আমার সম্পদ। প্রতিমা ঘোষ মিনতি রায়কে কোনোদিন মনে হয়নি আমার পরিবারের কেউ নয়।
গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও কতটা হয়েছে জানি না, তবে যার কাছে যা ভালবাসা ছিল ঘেরাও করেছি। কেড়ে নিতে হয়নি, তাঁদের প্রশস্ত হৃদয় থেকে দু'হাত ভরে দিয়েছেন।

৭০ দশকের আগেও গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও হয়েছে বই কী। তারাশঙ্কর বিভূতি এরা কোন শহরেই বা ছিলেন, অমিয়ভূষণ তো উত্তরবঙ্গ থেকেই দখল করলেন কলেজ স্ট্রিট পাড়া।

নকশালদের শ্লোগান সার্থক হয়ে উঠল রাজনৈতিক ভাবে নয়, সংস্কৃতির দিকে। কিন্তু ঘেরাও চলছিল, পরিপূর্ণতা পেল ৭০-এ এসে।

ঘর ঢুকতেই প্রণবেন্দুদা জানতে চাইতেন, নতুন কবিতা পকেটে আছে তো? আমরা 'না' করলেই, বলতেন—তোমাদের পকেটে এখন ইস্ত্রি করা গরম কবিতা থাকবে। মৃদু হেসে হেসে চুপ থেকেছি আমরা।

আজ যতটাই আড়ষ্ট বোধ করি, কবিতা পড়তে তখন কোনো জড়তা ছিল না। শঙ্খবাবুকে কত কবিতা যে শুনিয়েছি।
সুনীলদা ব্যস্ত থাকতেন বলে দু'চারটে কথা কেবল। কোনো কোনোদিন খাবার টেবিলে কথা বলতেন খুব। এরকমই একদিনে জিগ্যেস করেছিলেন, সত্যজিৎ রায় সাহিত্যিক না ফিল্মমেকার কী বলবে?
ফিল্মমেকার, সৈকতের উত্তর ছিল স্পষ্ট।
খুশি হয়েছিলেন সুনীলদা।

'আমরা সত্তরের যীশু' নামে যে কাগজটি আমরা করেছি তা সকলেই মান্যতা দিয়েছিলেন। পঞ্চাশের প্রায় সবাই লিখেছেন কবিতা ও গদ্য।
সত্তরের বিপ্লবী-কবি গৌতম চৌধুরী, বিপ্লবী বলছি এ জন্যেই যে তখন তার সম্পাদনায় 'অভিমান' সারা বাংলায় রব তুলেছে। সে কবি আবিষ্কার করত। খুঁজে বেড়াত নতুন গদ্যকার। যেমন শ্যামলকান্তি দাশও। মেদিনীপুরের সুতাহাটা গ্রাম থেকে 'বররুচি' করতেন। তিনিও নিত্য-নতুন কবি আবিষ্কার করে লেখা ছাপতেন।
আমিও সেখানে মুদ্রিত হয়েছি ছবিসহ।

গৌতমের 'অভিমান' থেকেই আমার আত্মপ্রকাশ। একেবারে লেখালেখির শুরুতেই গৌতমের হাওড়ার বাড়ি ছিল আমার ঠিকানা। ঠিকানা ছিল সুজিত সরকারের বাড়ি।

সুজিতের সঙ্গে অরণিদার বাড়ি। আর অরণিদাকে সব সময় বাড়ির বড়দা মনে হত।
অসাধারণ তার মন, আজও। মনে পড়ে, অরণিদার বিয়ের বৌভাত খেতে যাওয়া। একরামের হাত ধরে।

তখন একরামের মহাত্মা গান্ধী রোডের মেসবাড়িতে দিনের পর দিন থাকি। খাই। ঘুমোই।
কবিতাও করি। এবং কবিতা করতে করতে আত্মীয়তা।
আত্মীয়তা দীর্ঘ হয়।
আত্মীয়তা ছোট হয়েও আসে। কালে কালে বিচ্ছিন্নতা বাড়ে।

বাগবাজারে প্রসূনদের বাড়ি, আমারই বাড়ি। দিনের পর দিন অত্যাচার করি। মাসিমা, বাম্মা, নন্দিনী, ঝুপ্পি, তপনদাকে বাগবাজারেই প্রথম দেখি। যেমন কফি হাউসে প্রথম সাক্ষাৎ পার্থদার সঙ্গে।

তখন 'টেবিল, দূরের সন্ধ্যা' ছিল না।
বিভেদ ছিল না। শিবির ছিল না।
জয়ের সঙ্গে গৌতম চৌধুরীর বাড়িতে মুখোমুখি। এক রাত্রি কাটিয়েছিলাম। সেদিন জয়কে বলছিলাম এই গল্প। তারপর হঠাৎ করে সুবোধ, একা চলে এসেছিলেন পুরুলিয়া।

একটা যৌথ খামার ছিল। স্বপ্ন ছিল। এখন সন্দেহ অবিশ্বাস রাগ-ক্ষোভ বিরক্তি এসে সমস্তই ভেঙে দিয়ে যায়।
হতাশ লাগে। আবার উসকে উঠি সবুজের ইশারায়। নতুনরা আসছে।

মণীন্দ্র গুপ্ত দেবারতি মিত্র এই দু'জনও আমার এক বাসা। সেই কবে ৭৮ সালে মণিদা চিঠি লিখে বলেছিলেন, পরমায় আত্মজৈবনিক গদ্য লিখতে।
বাংলা বাজারে আমার বয়স তখন পাঁচ-সাত।

কী লিখব কী লিখব করে লিখেছি, যা ইচ্ছে লিখেছিলামও। অনেক পরে দেবারতিদি জানতে চেয়েছিলেন, ওরকম গদ্য কি আর লিখতে পারব?
সেখানে আমি আমার পছন্দের যৌনতার কথা বলেছিলাম। যা আজও লুকিয়ে চুরিয়ে ঘটে থাকে। সামনে এলেই, গেল গেল রব।

বিদেশি কবি-লেখকদের উল্লেখ করে বা পাশ্চাত্যের উদাহরণ টেনে যৌনতার কথা বলব কিন্তু নিজেদের টেনে আনব না। বাঙালি কবি-লেখকরা মধ্যবিত্ত ও ভীরু।

আমারও ভীরুতা আছে, চারপাশকে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। অশিক্ষা কুসংস্কার অন্ধতার ঘেরাটোপ চারদিকেই। রাতারাতি পাল্টেও যাবে না সব কিছু। মণিদার বাড়ি পাল্টে গেছে, হিন্দুস্থান পার্ক থেকে গড়িয়া। আমি নতুন ঠিকানায় যেতে পারিনি।
কালীদার সঙ্গে শরৎ মুখোপাধ্যায় বিজয়াদির কাছে অনেকবার। পানভোজন কবিতা সঙ্গে শরৎদার রঙ্গ-রসিকতা।

সকলই হারায় মাগো।
মনে মনে প্রশ্ন করি, আমার কবিতা চর্চার চার দশক পরেও কতটুকু পাল্টাতে পেরেছি আমার পরিবেশ, সময়? নিজেও কি পাল্টেছি?

'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও' শ্লোগান মুখভরা বুকভরা হলেও কাজটা কঠিন। এখন আবার মিডিয়ার দাপট। সত্যকে মিথ্যে, মিথ্যাকে সত্যিতে পরিণত করার জুড়ি নেই যার।
লিটল ম্যাগাজিনেরও জুড়ি নেই, এখনও এই বঙ্গে। কিন্তু মিডিয়া তো একরকম সন্ত্রাস। তাকে প্রতিরোধ করবে লিটল ম্যাগাজিন। পারবে তো?

অনির্বাণ গীতবিতান উপহার দিল আমাকে। যেন গানগুলিও আমি পড়ি। মুখস্থ করি।
নন্দিনীর কাছ থেকে পেলাম রেডিও। সকালবেলার সংবাদের পর রবীন্দ্রসংগীত। যেন শোনার অভ্যেস করি।

এই তো আমার বন্ধুরা।
আমাকে লালন করেছে কত ভাবে। বাঁচিয়ে চলেছে, বলা যায়। সীতা কাব্যগ্রন্থটি অনির্বাণ গৌতম বসু পার্থদার কল্যাণেই হয়েছিল।

'মৃত্যুঞ্জয়' ও 'তমোঘ্ন' অনির্বাণই করেছিল। পরের দিকের বইগুলিও বন্ধুদের সহযোগিতায় প্রকাশিত। তাদের কাছে আমার অশেষ ঋণ।

হুট হাট বিপুলের সন্তোষপুরের বাড়ি। যখন সন্তোষপুর ফাঁকা ফাঁকা। জলা জমিও ছিল। বিপুল-স্বপ্নার গান-কবিতা রাত ভর।

ঘেরাও কি করেছিলাম বন্ধুদের?
কফিহাউস থেকে বেরিয়ে প্রেসিডেন্সির মাঠ। গঞ্জিকা সেবন। কেউ কেউ খালাসিটোলা। প্রায়দিন উৎপলদা থাকতেন আড্ডায়। এইসব আড্ডাতে অনির্বাণ অমিতাভ হেমন্তকে পাইনি। বরং গৌতম বসুকে পেয়েছি। তিনি তখন সিগারেট কোম্পানির লোক। আমরা মুখিয়ে থাকতাম, এবার সিগারেট খাব।

সিপিএম তৃণমূল বিজেপি কংগ্রেস তখন ছিল না। সন্দেহের চোখ ছিল না। কিন্তু কবিতা ছিল। ভাস্কর চক্রবর্তী ছিলেন। রাহুল ছিল। আজও আছে। তখন দেবদাস আচার্য ছিলেন। আজও আছেন। তাঁর কৃষ্ণনগরের বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল সহজ-ভালবাসার টানে।

সৈকতের সম্পাদনায় 'আমরা সত্তরের যীশু' ১০টি সংখ্যার পর বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আমি প্রতি মাসে এক বছর বের করেছি। যা ছাপা হত কৃষ্ণনগরে। দেবদাসদার ব্যবস্থাপনায়।
সেই সত্তর দশকেই অসিত পালের নেতৃত্বে চলমান শিল্পের শুরু। কলকাতার দেয়াল রঙে রঙে ভরে উঠছে। শিল্পীরা গরুর পিঠেও ছবি আঁকছেন।
ছুটির দিন সকালবেলা ধর্মতলার গম্বুজের নীচে কবিতা পাঠ। আলোচনা। ওই ওখানেই আলোক সরকারের কবিতাপাঠ শুনি। প্রথম। আলোচনায় ছিলেন কালীদা।

আলোক সরকার সাধক একজন।
কবি তো এমনি হবে। যার দিকে তাকালে মনের দুঃখ-ক্ষোভ ধুয়ে মুছে যায়। তার সঙ্গে কথা বলেও আনন্দ।

অভিরূপ সরকারকে কী বলব অর্থনীতিবিদ না কবি? তাঁর 'আম পাতার মুকুট' কবিতার বইটি অসামান্য। তাঁর বাবা অরুণ কুমার সরকারও ছিলেন কবি। লিখেছেন অল্প কিন্তু অনন্য।

আর অনন্য রায়, যার সঙ্গে প্রথম দেখা আসানসোলের এক কবি সম্মেলনে। তারপর নিবিড় বন্ধুতা। মুখে লেগে থাকত হাসি। কথায় কথায় খুনসুটি। একে তাকে গালিগালাজ। সবসময় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আওড়াত।
অনন্য পুরুলিয়াতে এসেছে অনেকবার। অযোধ্যা পাহাড়ে মহুল খেয়ে তার কী উচ্ছ্বাস।

উদ্দীপনা ছিল চিত্রকরদের সঙ্গে কবিদের মেলামেশাতে। অসিতদা কবি-শিল্পীদের এক জায়গায় এনেছিলেন। তখন শিল্পীদের সঙ্গে আমার বন্ধুতা। সুনীল দাশ প্রকাশ কর্মকার বিজন চৌধুরীকে যেমন পেয়েছি তেমনি সংগীতের মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি।

শিল্পের সঙ্গে শিল্পের বিনিময়।

আজ যদিও মানুষের সঙ্গে মানুষের উষ্ণতা বিনিময় নেই। কবিরা তো অন্য গ্রহের জীব। তারা মানুষ চিনতে চায় না। নিজেদের যশ-খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা নিয়ে মশগুল থাকেন। বিশেষ করে এ সময়ে। সত্তরের পরেই অতি দ্রুত চারপাশ নোংরা হয়ে গেল সাহিত্যে। রাজনীতিতে। সর্বত্র।
আজকের ছোটরা কি বড়দের লেখালিখি পড়ে? মেলামেশাও কি করে?

আমাদের এক সাহিত্য অনুষ্ঠানে অতি তরুণ কবি ও কবিনীরা এসেছিল, কথা বলে বোঝা গেল, তারা আমার কবিতার সঙ্গে কোনোভাবে পরিচিত নয়। যেটুকু পড়েছে, তা হল মিডিয়া খ্যাত কবিদের কবিতা।
অতি সম্প্রতি এক তরুণ ফোন করে আমার কবিতা চাইলেন তাদের কাগজের জন্যে। প্রশ্ন করেছিলাম, আমার কবিতার সঙ্গে পরিচিত তুমি? স্পষ্ট করে উত্তর দিতে পারেনি। দ্বিতীয়বার ফোন আসতে, একই প্রশ্ন আমার। সে জানাল, তার বন্ধুরা আমার লেখা সংগ্রহ করতে বলেছে।
এই তো চারদিকের হাল।

কোনো তরুণের কাছে জানতে চাইছি, শম্ভু রক্ষিতের কবিতা পড়েছ? বলে বসবে, ভাস্কর চক্রবর্তী পড়েছি। কিন্তু বলবে না, শম্ভু রক্ষিতের নাম শোনেনি।

আলগা এক চালাকি ও সপ্রতিভতায় সবকিছু চাপা দিয়ে হেঁটে যায় একা। হতাশা তো আসবেই আমাদের মনে।

সত্তরের যীশুর একটা সংখ্যায় আবু সৈয়দ আইয়ুবের উপর ক্রোড়পত্র করেছিলাম। সেই সূত্রে আইয়ুব ও গৌরীদির কাছে আমাদের যাতায়াত শুরু। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে সৈকতের প্রশ্ন গৌরীদি আইয়ুব সাহেবের কানের কাছে গিয়ে বলতেন, উনি তখন শয্যাগত। অসুস্থ। তবু উত্তর জানাতেন। সেই উত্তর গৌরীদি আমাদের বলে দিতেন।
তাঁদের সঙ্গেও আত্মীয়তা হয়ে গেছল। ফিরিয়ে দেয়নি কেউ। এখন তো শুধু প্রত্যাখ্যান ও অপমান। কবিতার চেয়ে জীবন যে অনেক মহৎ, কবিরা ভুলে গেছেন। কেবলই ঈর্ষার জন্ম হয়। অন্যকে ছোট করার প্রবণতা বাড়ে। আমি একা বিখ্যাত বা বিখ্যাত হয়েছি, এই মনোভাব থেকে আকাশ ও মাটি দেখতে ভুলে যায় অধিকাংশ কবি।
এখন গ্রাম আর শহরকে ঘেরাও করবে না। গ্রাম ও শহর একাকার হয়ে গেছে। আজ শহরের থুতু ও গ্রামের থুতু একই রকম। মুখগুলিও তাই। কোনো ভরসা নেই কোথাও।

ভোটব্যাঙ্কের বাইরে শিল্পী সমাজও এক রাজনৈতিক দল। হিংসা হানাহানি সোশ্যাল মিডিয়াতে। ফেসবুক ও হোয়াটস অ্যাপে নিজেদের নিত্য নতুন প্রচার। ডাইনিং টেবিলের ছবিও থাকে, কবি খাচ্ছেন। কবি পায়খানা যান না? সে ছবিও নিশ্চিত দেখা যাবে একদিন।

আব্রুহীনতাই আমাদের পরিচয়। কই রাষ্ট্রযন্ত্রের আব্রু ছিঁড়ুক, তাহলে বলব, কবিরা মরদ।
প্রবুদ্ধ মিত্র আমাদের গল্পকার বন্ধুকে বলব, কবি সমাজের নগ্নতা নিয়ে তাদের বেহায়াপনা নিয়ে গল্প লিখতে। সে তো কবিদের সঙ্গে ওঠাবসা করে।

মাঝে মাঝেই আমি ভাস্কর চক্রবর্তীর একটা কবিতা আওড়াই।

কে চায় বিখ্যাত হতে
গানবাজনা হোক

কেউ বিখ্যাত হতেই পারে নিজের কাজের জন্যে। বিখ্যাত হয়েওছেন শঙ্খ ঘোষ। তারপরও তিনি মানুষের কাছে।
আমার কাছে তো আছেনই।
জোর করে কখনও কোনোদিন কোনো কিছু চাপিয়ে দেননি। কি কবিতা কি জীবন, কোনো বিষয়ে না। আমি যে ছন্দ জানি না, এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলেননি। লেখাপড়া ব্যাপারেও কখনও প্রশ্ন করেননি আমাকে। তবে আমার কাছে শিক্ষার বিষয়, তাঁরই জীবন আচরণ।
আমি মুগ্ধ হয়ে যাই।
আর্থিক সহযোগিতাও পেয়ে থাকি। যেভাবে তাঁর ছাত্র দুর্গাপদ দত্ত আমাকে সাহায্য করে। কালীদা করেন।

ঋণে ঋণে জর্জরিত। মধুর বেদনা। শোধ করতে পারব না। কখনোই।
অগ্রজরা যেমন সহযোগিতা করেন অনুজ বন্ধুরাও করে।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পুরুলিয়া স্টেশন দিকে। উনি এসেছিলেন কোনো কাজে। আমি খবর পেয়ে পাকড়াও করে তাঁর সঙ্গে হাঁটছি।
১ নং প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দু'জন, আমাকে প্রশ্ন করছেন কার কার কবিতা পছন্দ করি।
কী বলেছিলাম মনে পড়ে না আজ আর। তবে তাঁর একটা কথা মনে আছে আজও : শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়েছ? শঙ্খর কবিতা পড়ো, পড়ো।
একজন অগ্রজ কবি অনুজ কবির কবিতা পড়তে বলছেন। এ ছবিও কি আজ দেখতে পাই?
আজ যদি কোনো তরুণের কাছে জানতে চাই, অনির্বাণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পড়েছেন? অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুজিবর আনসারি শুভাশীষ ভাদুড়ী অভিমন্যু মাহাতর কবিতা চেনো কি? ক'জন পড়েছেন গীতা চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়?

কবিদের মুখে মুখেও এক প্রচার চলে, একেক গোষ্ঠীতে একেকরকম, যেখানে যে কবি প্রচার পায়, সেই পঠিত হয়। নিজে খুঁজবে না কেউ। অনুসন্ধান নেই, কেবল ছুটে যাওয়া কোথায় ছাপা হবে, কী পথে প্রতিষ্ঠা আসবে।
ধ্যান নেই মগ্নতা নেই।
গল্পকারদের মধ্যে কী জটিলতা জানি না, তবে জানি, সৈকত

রক্ষিতের গল্প-উপন্যাস অনেকে পড়েনি। যেহেতু সে বহুল প্রচারিত কাগজের লেখক নয়।

চারদিক নোংরা, কোনোভাবেই কোনোদিক থেকে প্রতিরোধ করা যাবে না, অসুন্দরই থেকে যাবে ঘর ও বাহির। কারণ আমরা নিজেরাই, আমরা যে আমাদের নিয়ে কিম্বা আমাকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চাই।

সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন উত্তর থেকে দক্ষিণ, বয়েসে তরুণ তিনি তখন। দুপুরের দিকে তারাশঙ্করের বাড়ি। অচেনা তরুণকে, মফস্সলের এক তরুণকে, তিনি ভাতডাল খাইয়ে আপ্যায়িত করলেন। সেই অচেনা তরুণ আজ আর নেই, গল্পটা মনে আছে আমার। এবং আমার দীর্ঘশ্বাসও বইছে। কিছু যায় আসে না কারোর। কেবল ইচ্ছে করল গল্পটা বলতে।

জয় গোস্বামী খ্যাতিমান কবি। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককেও বাকি কবির দল বাঁকা চোখে দেখে। আমার সঙ্গে সুবোধেরও ফোনাফুনি হয়, তার মানে কি এই, আমি ধান্দাবাজি করছি? জয় ও সুবোধ দু'জনই আমার সতীর্থ। যেমন গৌতম চৌধুরী গৌতম বসুও আমার সতীর্থ। মানুষ হিসেবে মানুষের কাছে থাকতে পারি।

বীতশোক ভট্টাচার্য ছিল কবি ও অধ্যাপক। পণ্ডিতও। তার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি তার মেদিনীপুরের বাড়িতে গিয়ে। আমার কোনো আড়ষ্টতা ছিল না।

আমি নিজেকে কবি মনে করি না, কারণ মানুষ হতেই তো পারিনি। আগে তো মানুষ, তারপর আমি ফুটবলার না তবলাবাদক না কবি, তা অনেক পরের কথা। তাই বলতে চাই, কবিতাও আজ আর পারে না প্রতিরোধের ডাক দিতে। কেননা, কবিতাকে নিয়ে কবিরা যশের দিকে প্রতিষ্ঠার দিকে দৌড়োয়।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ প্রশস্ত হোক, মানুষ মানুষের কাছে দাঁড়াক কবিরা চিন্তা করে কি?
কেন্দ্রিকতাই বা কেন। প্রান্তিকতাই বা কেন? কবিতা তো ত্রিপুরা আসামের গ্রামেও জন্ম নেয়। রণজিৎ দাশ শিলচর থেকেই এসেছেন। শ্যামলকান্তিও মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে কলকাতা।

কলকাতা কারো বাপের একার নয়। পুরুলিয়াও আমার মুঠোয় থাকে না। সমস্ত দেশকাল সময় আমাদের সঙ্গে চলাফেরা করছে। এই সব কথাই মন্থন মোদক, সজল রায়, অতনু চক্রবর্তীকে বলছিলাম। এবং এই তিনজনই আড়ালে থেকে কাব্যচর্চা করে।

With best Compliments ...

Trackon Couriers Pvt. Ltd.

4B, Nafar Kundu Road

Kolkata

খণ্ড সময়, অখণ্ডের জলতল : রৌরব

সমীরণ ঘোষ

এ লেখার ভিত্তিমূল নিতান্তই রৌরব এবং তার অনুষঙ্গে স্ফূর্তিমান উজ্জ্বলন্ত কবি-লেখক-শিল্পী-আমপাঠক ও আম-অনুভবীদের ধারাময় জঙ্গমতার কাল-পরিসর। এই ধারাস্নানে বিন্দুমাত্র অবগাহন যাঁদের, তাঁরাই এই যৎসামান্য-রচনার ক্ষেত্রনির্মাতা। ফলে এই রচনা কোনো অর্থেই মুর্শিদাবাদ জেলার লেখকতার ক্ষেত্রসমীক্ষা নয়। বরং ওই প্রাণসংশয়কারী অগ্ন্যুৎপাতময়

সময়কালে এবং রৌরবের সোচ্চার সংস্কারহীন আপোসবিমুখ জীবনাচারে যাঁরা বিন্দুমাত্র মুহ্যমান বা ভারহীন লগ্ন ছিলেন, তাঁরাই এই পরিমাপহীন মুকুরের সীমানানির্মাণকারী কুশীলব। এর বাইরেও হয়তো আরও অনেকেই নেপথ্যচারীর ভূমিকা নিয়েছেন এবং হয়তো তাঁদের অবদানও রৌরবের ক্ষেত্রে স্তম্ভপ্রায়। আমার অনবধানতা বা বিস্মৃতি তাঁদের আহত করলে সবিনয় ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়া এই মুহূর্তে কোনো উপায়ান্তর নেই। হয়তো সেই ফাঁকফোকর পূরণে কেউ আগামী দিনে এগিয়ে আসবেন, আমার বিশ্বাস।

অন্ধকার জলের জাজিম

শ্মশানের গা ছুঁয়ে দৌড়চ্ছে অন্ধকার দীর্ঘ ভাগীরথী। তার ওপর শুভ-র চিতাভস্ম। আমি তার 'ডুবসাঁতার-সঙ্গী' যদিও ভাবিনি। নতুবা নিশ্চিত ও আমার কলার ধরে চিৎকার—চ্যাংড়ামি! তারপরই হিড়হিড়, পাড়ে ঠেলে মোক্ষম হুঙ্কার, যা ভাগ্...।
শুভ নিজে যেমন মস্ত জীবনের মাপে ঠাসা, আর ওর কামনা, বন্ধুদের অফুরন্ত জীবন। রইল বন্ধুরা। অথচ সমাধাহীন অনেক ধাঁধার মতোই নিজেকে ফিরিয়ে নিল স্বেচ্ছামৃত্যুর হাতে।

রৌরব : আমাদের বোঝাপড়া

বৃষ্টির দখল নেওয়া দুপুর। শান্তিময় আর আমি এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের ছাতা বিলকুল হাওলাত নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। গুহাপ্রায় কাগজের দোকান। এক রিমের ম্যাপলিথো কখনো শান্তি কখনো আমার মাথায়। তার ওপর সেই হাওলাতি ছাতা পতাকার মতো শহর কাঁপিয়ে চলেছে। এবং সোজা শুভ-সকাশে। প্রেসে চল। স্বয়ম্বর বেরুবে। হতবিহ্বল শুভ। কাগজ করার অধিকার কি এই হরিদাসদের আদৌ! সম্ভব! শুভ আশিরনখ রাজনীতির খপ্পরে। আমরাও কিঞ্চিৎ দোসর। কিন্তু শুরুতেই পিছনপক্ক। শুভ বলল অসম্ভব এবং মুহূর্তে প্রস্থান।
শুভ আমাদের হাড়মজ্জার সেতু। ফলে নিশ্চিতেই শান্তি আর আমি যথারীতি প্রেসে। ১৯৭৫, স্বয়ম্বর বেরুল। শুভর অজান্তেই ও সহ-সম্পাদক। ওর হাতে দিতেই যুগপৎ বিস্ময় ও লম্ফ। তাহলে সম্ভব। শুভ জুড়ে গেল। আর, ওর জুড়ে যাওয়া মানেই যত হুজ্জুত। গতি। চালাও পানসি। দু'আড়াই বছর বেরুল স্বয়ম্বর। ইতিমধ্যে বহরমপুরের রাজাধিরাজ রাজেন উপাধ্যায়ের ইন্ধন এবং আমরা তিনমূর্তি শুরু করেছি 'আবহমান শিল্প'। হঠাৎই কোনো রাস্তার মোড়-দখল, সঙ্গে ছবি গান কবিতা ও গদ্যের ধুন্ধুমার। গোটা শহর জেগে উঠছে নতুন অভিঘাতে। এবং এর মাঝেই রৌরব-এর গোপন প্রকল্পনা। আরো জঙ্গিপনা চাই। কেশর-আঁকড়ানো দৌড়। স্বয়ম্বরে যা কুলোচ্ছে না। আমি থ। অভিমানে মুষড়ে। স্পষ্ট বিচ্ছেদের চিলমন। ১৯৭৮, অবশেষে রৌরব, প্রকাশক : সন্তোষ মণ্ডল, পৃষ্ঠপোষক সমরেন্দ্র রায় (মাস্টার)। শুভ আর শান্তি আমাকে বাড়ি থেকে চ্যাংদোলা করে তুলে সটান সন্ধের নাটাতলায়। শুধু অন্ধকার মাঠ আর তারাঝরা। সেই আলোয় পরস্পরের মুখ দেখা। আর প্রবল কান্না একে অন্যকে জড়িয়ে। অশ্রু আমাদের ধুয়ে দিচ্ছে ক্ষমা করছে আর অশ্রুই আমাদের বেঁধে ফেলল লহমায়। অতএব বিদায় স্বয়ম্বর। শুরু রৌরবের ছুট।

রৌরব : আমাদের ঘর-গেরস্থালি

তো, 'রৌরব' কেন! অন্তত শুভর মতো রাজনীতি-করিয়ে আর আমাদের মতো দোহারকিদের হাতে নরক! যুক্তি, নরককে স্বীকৃতি এবং তা থেকে বেরুনোর জন্যই নিষ্ঠুর উন্মাদনা। প্রথমে হিদুদার চায়ের দোকানই আমাদের গর্ভগৃহ। পোস্টারে ছবিতে সাজিয়ে প্রায় দখল নেওয়া। আর হিদুদা আমাদের প্রাণ ও উচ্ছলতাকে অবলীলায় মেনে নিচ্ছে। ততদিনের আবহমান শিল্পের একটা ভাড়ার ঘর জুটে গেছে কাদাই অঞ্চলে। একটা ছোট্ট লাইব্রেরি, দেখভাল অমিতাভ সেন। নিত্যদিন নতুনছবি বা পোস্টারে গান হয়ে যাওয়া দেয়াল। জেলা ও জেলার বাইরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসছেন কবি লেখক শিল্পীর দল। ভণীন্দ্র দত্ত (বিপ্লব), নাসের হোসেন আরও পরে প্রবীর রায় এবং অবশ্যই রবীন বিশ্বাস আমাদের আবহমান শিল্পের শিল্পীকুল এবং প্রথম সারির সেনানী। অগ্রজ রঞ্জিত গাঙ্গুলি, অনিল সাহা, বাসুদেব রায়-এর মতো চিত্রশিল্পীরা পরম মমতায় আমাদের

প্রদর্শনীর জন্য ছবি তুলে দিচ্ছেন। চিত্রশিল্পী বাসুদেব রায় আবহমানে এমন মজলেন যে, তাঁর আসামান্য সব উডকাট একে একে রৌরবের প্রচ্ছদ। আবহমানের ঘরে তখন প্রবল আড্ডা। আসছেন জমিল সৈয়দ, সৈয়দ হাসমত জালাল, প্রশান্ত গুহমজুমদার, মনীষীমোহন রায়, প্রদীপেন্দু মৈত্র, পম্পু মজুমদার, তাপস ঘোষ, সমরেন্দ্র রায়, প্রবীর সান্যাল, পুষ্পেন রায়, সুদীপ আচার্য প্রমুখ। এই আড্ডায় অমিতাভ মৈত্রর গলায় কিছু রবীন্দ্র বা পুরোনো বাংলা হিন্দি গানের ঝলক আজও স্মরণে। বনগাঁ থেকে চাকরিসূত্রে এসে সাধন দাস বিলকুল ডুবেছে। হাফ প্যান্টলুন অনুপম ১৬-১৭-র কিশোর এবং আমাদের আস্ত চেলা। চাইলেই মদ চাট জলের জোগাড় এবং ক্রমে ক্রমে পরিবেশনে দড়। বয়সে অনেক এগিয়ে কবি নারায়ণ ঘোষ আমাদের প্রায়-শিক্ষক, এই উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খের দলে সিঁধকাঠির মতো সিঁধিয়ে গেলেন। ওঁরা দেখার চোখ, বোধ, সাহিত্যবিচার, কবিতা এবং অসম্ভব কিছু জরুরি প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র আমাদের ভোঁতা কোণগুলো কেটে আলো বের করছে। অথচ সেই নারায়ণ ঘোষই কিনা আজ আমাদের সমস্ত আহ্বানের সামনে আঁটো-পাহাড় তুলে স্বেচ্ছাগারদে বসে। যাঁর 'গাণ্ডীব' এবং অনতিদূরের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থদুটি আমাদের আদরের এবং বহনের একান্ত সম্পদ। আর এক শিক্ষক অবশ্যই রাজেন উপাধ্যায়। সে সময় ওঁর মতো পাগল ও বোহেমিয়ান কবিতা বা গদ্য লিখিয়ের সন্ধান আমরা পাইনি। ইতিমধ্যেই আমরা পড়ে ফেলেছি ওঁর 'নিষিদ্ধ পাণ্ডুলিপি', 'হাত ধরো মৈত্রেয়ী'র মতো অসম্ভব তাজা রক্তক্লেদজর্জর দুটি গ্রন্থ। মেধাবী ভাষা মেজাজি চাল, গরিমাভরা বাচন। সুরা ও সংগীতের ডিঙিতে উড্ডীন মানুষ। কবিতার মতোই ওঁর জীবন। আমরা ওঁর খিস্তিখেউড় আর ভালোবাসার কাছে নতজানু শিখতে থাকলাম জীবন ও সাহিত্য। রৌরবের ছোকরা বলতেই তখন চারপাশে কেমন ভাঙনের ভয়, অস্বস্তি। উপরন্তু শুরু হয়ে গেছে খোঁজ, কে কোথায় কোন প্রান্তরে বসে লিখছে। হাপর ফুলিয়ে পিটিয়ে যাচ্ছে কাঁচা লোহা। কে কোথায় কলম তুলে রেখেছে নৈঃশব্দের ড্রয়ারে। চলো। দৌড়। সেই তল্লাশির খপ্পরে পড়ে গেল আবুল বাশার। কবিতা লিখত। একটা কাব্যগ্রন্থও তখন বেরিয়ে গেছে। তারপর চুপ। ধরানো হল গল্প, প্রায় ঘাড়ে বসেই। বাংলা গদ্য পেতে থাকল নতুন ভাষার নতুন অলংকারের নতুন কথকতাময় গ্রামজীবন। মাঠ খেত মানুষ প্রান্তরের গাছপালা এক আশ্চর্য জাদুর মতো জেগে উঠল যার কবজির ফুলন্ত শিরায় কালক্রমে সেই বাশারই আজ বাংলা গদ্যসাহিত্যে অন্যতম ভাষাপুরুষ। কবি সুশীল ভৌমিক, যিনি স্বয়ংই তীর্থ, আমাদের অহংকার। এক জটিল সময় জীবন ও কবিতা কীভাবে যে একে-অপরের পরিপূরক হতে পারে, কীভাবে যে একামানুষের হিম রোদন ঠাট্টা ও অস্বীকার শব্দের গায়ে গায়ে জড়িয়ে ফুটে ওঠে কালের কঙ্কাল, সুশীলদা আমাদের দেখালেন। আর যার সামান্যটুকুই ধরা রইল 'তবু, আমি' এবং 'নির্বাচিত কবিতা' নামক বারংবার পঠনীয় দুটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থে। একটু দূরের মানুষ কখন যে ভিড়ে গেলেন রৌরবের সংসারে। আজ তাঁকে হারিয়ে আমরা যথার্থই অনাথ। এলেন অমিতাভ মৈত্র, যাঁর কবিতা গদ্যের ভাষায় কোনোদিন জং ধরে না এবং আজও যিনি কবিতার নতুন ভাষাভুবন অন্বেষণে অপ্রতিরোধ্য। তিনি সেই কবি-সারণির অন্যতম, যাঁরা প্রজ্ঞাদীক্ষিত কবিতার সূক্ষ্ম ও মেধাবী পথ তৈরি করেন অন্তরালে। লিখলেন 'ষাঁড় ও সূর্যাস্ত', 'পিয়ানোর সামনে বিকেল', 'টোটেমভোজ', 'সিআরপিসি ভাষ্য' এবং সাম্প্রতিকতম 'ক্লোকরুম'-এর মতো বিস্ময়কর গ্রন্থ। রৌরবের কত কত সুখদুঃখে অনেকের অলক্ষ্যেই নিজেকে জুড়ে গেছেন। কবি সন্দীপ বিশ্বাস। এপার-ওপারের লোকজ শব্দ মাটি জল মানুষ এবং যার ভেতর লুকিয়ে থাকা অণুকণার মতো দুঃখ আনন্দ হাহাকার ও মজাগুলোকে কত সহজেই প্রোথিত করে আমাদের বিহ্বল করলেন, ক্রমান্বয়ে লিখলেন 'চারামানুষ', 'সবুজ হলুদ তর্ক', 'সুহাসিনী', 'মোম'-র মতো অসংখ্য দ্যোতনাবহুল কবিতাগ্রন্থ। এলেন রৌরব-এ। শুধু এলেনই নয়, এ-ঘরের অনেকগুলো প্রদীপ তাঁর হাতেই জ্বালানো, যা আমাদের অন্ধকার মনে রেখেছে। আমাদের শান্তিময় মুখোপাধ্যায়, ওর মতো উজ্জ্বলন্ত মেজাজের কবি বোধহয় আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় কেউ নেই। লহমায় নতুন কোনো সংখ্যার চিন্তা উসকে দেওয়ার ক্ষেত্রেও ও অদ্বিতীয়। ভার বেশি বইতে পারত না, কিন্তু কবিতা যখন লিখত একেবারে রাজা। ওর বিচ্ছুরণময় ভাষা কৌণিক বাক্যচাল, আমরা বুঁদ হয়ে যেতাম। আর ওর 'শীতের মাতৃসদন', 'খোসাকাল' বহুকাল মাথার পাশে রেখে শুলেও ফুরোবার নয়। পাগলা শান্তি এখন কলম হাওয়ায় রেখে কলকাতার জিভের আঠায় কেন যে বসে! সাধন দাস, প্রথমে যে কবিতা ছাড়া ভাবতই না, পরে রৌরবের প্রয়োজনে এল গদ্যে। একান্তই অনুভবী। প্রায়-তাচ্ছিল্যকর বস্তুপুঞ্জের অনুষঙ্গে দেখা কত মরমী জীবন উঠে এল ওর হাতে রৌরবের মুকুরে। কান্দি থেকে হৃষীকেশ চক্রবর্তী। কী তুরীয় জীবন, সর্বক্ষণ ঘোড়ার পিঠে। আর ঘোড়ার মুখের ফেনা শুকোতে-না-শুকোতেই দৌড়। কবিতা লিখত, সেতারের হাতও ছিল চমৎকার। কান্দি থেকে রৌরবের দুটো সংখ্যা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই ওর দু-টুকরো দেহ পাওয়া গেল ভেদিয়ার রেললাইনে। পরে রৌরবই প্রকাশ করে ওঁর নির্বাচিত কবিতাগ্রন্থ। খুবই উল্লেখযোগ্য কবি অচিন্ত্য বসু। অপূর্ব সব কবিতা ও গদ্যের জনক। 'তমোঘ্ন' বের করত, পরে 'ঋকদৃক'। রৌরবের জন্য সে-পাঠ তুলে ভিড়ে গেল এই দরিয়ায়। দীর্ঘ মানসিক বৈকল্যের হাতে চুরমার হয়ে বন্ধুগ্রন্থি ভেঙে আজ ভবসীমার বাইরের অতিথি। সাধনও বনগাঁ থেকে অরুণ রূপা জয়দেবকে নিয়ে একটা ছোট দল জুটিয়ে বের করল রৌরবের বেশ ক'টি সংখ্যা। তখন কলকাতায় আমাদের একটাই আশ্রয়, সাধন। ওর বনগাঁর বাড়ি কিংবা আরও পরে সিঁথির বাসা-ঘরে বাড়তে থাকা আমাদের লম্বা বিছানায় ওদের অল্পবিস্তর মেঝেও উধাও হয়ে

গেছে কতোবার। তার আগে রাতের মাথা-গোঁজা বলতে রুগির আত্মীয়স্বজনের চাপে বেহুঁশ পিজির ওয়েটিংরুম। সারাদিনের রৌরবময় দেশোদ্ধার আরও সন্ধের খালাসিটোলার সুহানা-মহফিল শেষে নিঃসাড় রাতপথ পয়দলে মুছে প্রায় চোরের মতো সম্পূর্ণ বিছানাহীন কাটিয়েছি কত রাত। পরে মানিকতলায় তাপস সরখেলের কাকু-বাড়ির হলঘরের মতো ডেরায় আমাদের বহু হামলাই জারি ছিল। সেখানে আমাদের নির্বাধ উদ্দামতার নানান নমুনা যেমন ছড়িয়ে, তেমনই নতুন কিসিমের নানা রান্নাবান্নার নজিরও ভোলার নয়। শেষে রৌরবের টানে বনগাঁর পাততাড়ি গুটিয়ে সাধনের বহরমপুরেই চাষবাস। অনেকের অগম্য থেকে গেলেও রৌরবের জন্য ওর দীর্ঘ-বছরের নিরুচ্চার অমানুষিক অর্পণ কেবল রৌরবের কলজেই জানে। সুখের কথা ও আজ প্রৌঢ়ত্বের উঠোনে দাঁড়িয়ে আমার আর নাসেরের নাছোড় কব্জায়, ওর দীর্ঘ ত্রিশ বছরের লেখকতার দলিল, যা অতিসম্প্রতি 'প্রথম গল্প সংকলন' হিসেবে প্রকাশে প্রায় বাধ্য হল। অভাব-অনটনে জেরবার হরিহরপাড়ার রকিবুদ্দিন ইউসুফ, অসম্ভব জ্যান্ত ও মায়াবী মানুষ, সামান্য কিছু গল্প ও কবিতায় যে মাত করেছিল, তার ফসলের অংশীদারও রৌরব। 'ভুঁইকামড়ি লতা' নামে এক ক্ষীণ কাব্যগ্রন্থই ওর কবিতা রচনার সামান্যমাত্র দলিল। আর ওর গলার লোকগান আজও আমরা আমাদের গলায় চকিতে টুকে নিয়ে বুঁদ, সেও অকালে গেল। আর গেল কলকাতার সত্যজিৎ। এক কৌটো-তৈরির কারখানায় তাপস সরখলের সঙ্গে কাজ করত। কবিতা লিখত, খুবই প্রাণের কবিতা। রৌরবের জন্য কলকাতা চষে দিত, লিভারের ক্ষত ওকে জোর করে তুলে নিল। রহস্যমৃত্যুর মধ্যে তলিয়ে গেছেন আরও একজন, আরুণি দাশ। চাকরিসূত্রে এসেই সেই অপূর্ব সৌম্যকান্তি যুবক নিমেষেই রৌরবের ঘরগেরস্থালির ভেতর ঢুকে পড়েছিলেন। ততদিনে অনুপম ছ-সাতটা কবিতা লিখে ফেলেছে রৌরবে। ছোট্ট পরিসরেই ছড়ানো ছিল কত মণিমুক্তো। কত হৃদপ্রদাহ। তারপর একদম চুপ। হয়তো লুকিয়ে কখনো লিখেছে, যা ডেঁপোদের পক্ষেই বোধহয় সম্ভব। কিন্তু গুণে গুণে রৌরবের দুটো ইটও যদি স্পর্শ করা যায়, দুটোতেই ওর গন্ধ জড়িয়ে। হাওড়া থেকে এল গোপাল ভট্টাচার্য। শিল্প- সংগীত-ইতিহাসে যার অধীত জ্ঞান এবং পরবর্তীকালে মার্কসীয় বস্তুবাদের আলোয় এক অসমান্য স্বচ্ছতায় রৌরবে সে বিরাট এক মানুষ, যার বেশ কিছু মৌলিক প্রবন্ধ চিন্তামালা রৌরবকে ঋদ্ধ করছে। হাওড়া থেকে গোপালও বের করেছিল রৌরবের বেশ কিছু সংখ্যা। তাছাড়া কত হ্যাপা কলকাতায় ওকে একাই বইতে হত ভেবে আজ আমার মতো মফস্সলি শামুকের পিঠের খোলও কেঁপে ওঠে। দুর্বিষহ কর্কট রোগ তাকেও তুলে নিল আমাদের আওতার বাইরে। নাসের, আবহমান শিল্পের গোড়া থেকেই রৌরবের যে-কোনো উদ্যোগে একেবারে সামনের সারিতে। ওর কবিতার মধ্যে শুরু থেকেই দেয়ালের ফাঁকফোকর থেকে দেখা একাকী মানুষের অপার রহস্যের জগৎ, যা একান্তই ওর নিজস্ব নির্মাণ। আমরা তার ভেতর পর্যটকের মৌনবিহার করেছি। সেই নাসেরই আজ নিরন্তর কত কত অনুসন্ধানী গ্রন্থে নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছে। ওর 'গ্যাব্রিয়েল, বলো', 'ছায়া পুরাণ', 'লাফ' বা 'নির্বাচিত কবিতা' সেই বিস্তৃতিরই সাক্ষ্য বহনকারী এক অনিঃশেষ চলমানতা। আর কলকাতার ম্যাগাজিনের দোকানগুলোয় রৌরব পৌঁছুনো, টাকা আদায়, লেখা জোগাড় কিংবা বইমেলার টেবিল জোটানো থেকে খুঁটিনাটি অব্দি ও রৌরবের জাদুকর। রুটিরুজির গাড্ডায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনেককাল লাটপাট খাওয়া উমাপদ কর শেষ অব্দি তার কবিতায় ভরিয়ে দিয়েছে রৌরব। এমনকী রৌরবের যে-কোনো সঙ্কটে অর্থ-সময়-শরীরসমেত সটান। বহরমপুরে ফিরে রৌরবের অপরিহার্য মানুষ। কালক্রমে উমাপদ করও আজ গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে নিত্যনিয়ত ভাষাসন্ধানী, নতুন কবিতার এক ব্যস্ত সফরি। অল্প সময় বহরমপুরে ছিলেন শান্তি লাহিড়ী। প্রথমে আলাপ, পরে তাঁর বসার ঘর থেকে রান্নাঘর পুরোটাই রৌরবের দখলে। দুপুর-রাত্রি কোনো বাছবিচার নেই, ঢুকে পড়ছি। কখনো চা কখনো দারু কখনো যা-পাই খানাপিনা। বৌদি ছেড়ে দিয়েছেন রান্নাঘর। শান্তিদা সবগুলোই। আর সেই যে সম্পর্কের সুতো জড়াতে থাকল আজও অম্লান। ওই সময়কালে শান্তিদার বহরমপুরের বাসায় দিনদুয়েকের জন্য সস্ত্রীক শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাজির। মূলত শান্তিদার ওকালতি, আর সন্ধেয় ডাক, চলে আয়। আমরাও গোলাবারুদসমেত হাজির। নির্দেশ শান্তিদার। ফলে যথেষ্ট কবিতা এবং যথাসম্ভব আগুনজল। শক্তিদা কবিতা শুনছেন। সঙ্গে পানভোজন। বিপুল রাত। অবশেষে শক্তিদা আমাদের হাতগুলো একে একে ওঁর বুকে টেনে 'দেখ এখানে ধুধু জঙ্গল, জটিলতা। কিন্তু বনের গন্ধ, কুসুম, সুবাস, ছমছমে আলোআঁধার কিছু নেই! সব ফক্কা!' আমরা এক অপরিমেয় কবির বিশাল ডানার ভেতর কেবল মুছে যাচ্ছি। আর শক্তিদা তাঁর পাতালফোঁড়া গলায় গান ধরেছেন 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ...।' আমরা বুঁদ। শক্তিদা থম হয়ে বসে। বললেন, দেখ মীনাক্ষীর সঙ্গে আজ আমার আড়ি। তোরা পারবি না ভাব করিয়ে দিতে। মুহূর্তে আমরা সাষ্টাঙ্গে মীনাক্ষীবৌদির পায়ে। ছাড়ছি না। ভাব। বৌদি বললেন, ভাব। আমরা সেই শিশুপ্রায় ডানাঅলা দেবদূত-কবির সান্নিধ্য ছেড়ে ভাসমান, নিজস্ব গুজরানে এলাম। শান্তিদা সেসময় অসামান্য কিছু নতুনভঙ্গির চতুর্দশপদী লিখেছিলেন। রৌরব তার অনেকটাই চিবিয়ে নিয়েছিল। হাঁক দিলে 'চলে আয়'-এর মতো চওড়া অনুরণনময় ধ্বনি অন্য কার গলায় মিলবে; আজ সেই শান্তিদাও নেই। শান্তিদার বাসাবাড়ির দু-বিঘত দূরেই এক প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকতেন অসীম দাস। রসায়নের ছাত্র। কিভাবে যে যোগাযোগ হল! রৌরবের সোঁতা থেকে জোয়ারের পথে গুণটানা সন্ন্যাসীসুলভ এক মানুষ। তাঁর বাড়ি প্রায় রৌরবের দখলে। সেখানে বেঠোভেন বাখ মোসার্টসহ বহু বিদেশি গান বাজনা। আর অসামান্য কবিতা। অসামান্য রসবোধ। প্রজ্ঞা। রৌরবের সংসারে শ্মশ্রুময় প্রশান্ত মানুষকেও আমাদের

উদ্দামতার দায়ভার খুবই কষ্টকরভাবে বহন করতে হয়েছে বলে সত্যিই মাথা নুয়ে আসে। রৌরব নেই। কিন্তু তিনি আজ একক বৃন্তেও ক্ষয়হীন প্রাণবান। একটা সময়, বলা ভালো মৃত্যুর আগে পর্যন্ত, রৌরবের প্রায়-নিয়মিত লেখক ছিলেন যজ্ঞেশ্বর রায়। রৌরবের তাপ অনুভব করতেন। বৃদ্ধ বয়স। অশক্ত হাত। চোখ চলে না। কিন্তু রৌরবের কেউ তাঁকে সাদা কাগজ আর কলম পৌঁছে দিতেই আমরা পেয়ে গেছি তাঁর দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত অসম্ভব সব গদ্য। কামু কাফকা তলস্তয় দস্তয়েভস্কি কিয়ের্কেগার্দকে তিনি আমাদের করের মতো চেনাতে চেয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে রৌরবে মজেছিলেন আর এক দার্শনিক মণি গুহ। একাধারে কবি ও গণ আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী কবি সমীর রায় বৌদির চাকরিসূত্রে বহরমপুরে মাঝেমধ্যেই ডেরা বাঁধতেন এবং দ্বিধাহীন রৌরবে। অত্যন্ত স্নেহশীল ও নরম মনের মানুষটি রৌরবের উচ্চণ্ড দামালদের মধ্যে ঋষির মতো সদাহাস্যময় নিবিড় আড্ডায় জুড়েছেন। লিখেছেন রৌরবে। আমাদের কিঞ্চিৎ মেরামতির চেষ্টারও কসুর করেননি। আর আমরা আমাদের যাবতীয় গ্লানি অপরাধ অবাধ্যতা ওঁর অগ্নিপ্রায় শুদ্ধ বুকের কাছে সমর্পণ করে কিছুটা স্বস্তিও পেয়েছি। সেই তিনিও কানোরিয়া জুটমিলের মরণপণ আন্দোলনে নিজের শরীর-শ্রম-সময়-সর্বস্ব বিলিয়ে ভেঙেচুরে নিজের ওপরই সমাপ্তির ট্যাঁড়া টেনে দিলেন। এসেছে অসংখ্যগুণপনায় মোড়া তরুণ কৌশিক রায়চৌধুরী, রৌরবে পদ্যগদ্য দুই লিখেছে, এঁকেছে প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জার দায়িত্বও, এমনকী রৌরবের যাবতীয় সভা সমাবেশে হল কিংবা মঞ্চ সাজানোর ক্ষেত্রেও তার অপরিসীম অবদান ভোলার নয়। এই শহরেই তাঁর নাটকসত্তার যতখানি স্ফুলিঙ্গপ্রাপ্তি ঘটেছিল, পরবর্তীকালে নান্দীকারে যোগ দিয়ে সেটুকুই হল বহ্নিমান। লিখলেন 'প্রফেসর তলাপাত্র', 'গণ্ডি', 'মা অভয়া', 'নগর-কীর্তন, 'ইয়ে'-র মতো একাধারে মেধাবী ও মঞ্চসফল নাটক। যখন কাজের জোয়ার তার অবসর ভেঙে চুরমার করছে, তখনই ভর করল এক মারণ অবসাদ। যে আগুনকে সে পোষ মানাল কলমের গোড়ায়, সেই আগুনই ক্রমশ তরলে-গরলে তাকে পোড়াল একা করল, ফিরিয়ে নিল তার সর্বগ্রাসী জিভে। রাত্রি-ভাগীরথীর গর্ভে আমরা প্রবীণ বন্ধুরাই তাকে ভস্মস্বরূপ সমর্পণ করলাম। এসেছে তরুণ রক্ত মেধাবী গল্পকার সব্যসাচী সমাজদার। বর্তমানে দিল্লিবাসী। একটি খবরের কাগজের বড় চাকুরে। কবি তাপস সরখেল, গৌতম সেন (গুরুত্বপূর্ণ তথ্যচিত্রকার এবং ইতিমধ্যে প্রয়াত), শিবশংকর পাল, লালগোলার শক্তিমান গল্প-লিখিয়ে নীহারুল ইসলাম যে আজ বহু উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থের প্রণেতা। ডোমকলের গল্পকার সদর আলি, বিচিত্র লেখককতায় সমৃদ্ধ সেখ আনিশ, ইসলামপুরের ধীমান গল্পকার বিশ্বজিৎ মণ্ডল, খোসবাসপুরের তপন সৈয়দ, কান্দির শ্যামলবরণ নম্রলাজুক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, যাকে আমরা ওর পত্রিকার দ্ব্যর্থবোধক নামেই কখনো কখনো ডেকে থাকতাম 'অমলকান্তি'। বর্তমানে সে বিশিষ্ট কবি এবং চিত্রী। তারও পরে আচ্ছন্নকারী দুই তরুণের প্রবেশ। অনুসন্ধিৎসু পলাশ ভাদুড়ি এবং অয়ন গোস্বামী। প্রথমজনের স্রেফ পাঠক হিসেবে অনুপ্রবেশ এবং ক্রমান্বয়ে কবি ও পরবর্তীকালে চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠার উদগ্র ও যন্ত্রণাদীর্ণ প্রকল্পনায় একান্ত অনুসরণযোগ্য বিশিষ্ট তরুণ। পলাশ এই মুহূর্তে আক্ষরিক নিরুদ্দেশ। দ্বিতীয়জন নির্ভেজাল তৈরি কবি। নিজস্ব ভাষা ও মিনাময় শব্দের প্রয়োগে আমরা আপ্লুত। বর্তমানে লেখা ছেড়ে সংসার ও সমৃদ্ধির জোয়াল টেনে ছেলেটা কি খুব ক্লান্ত! বড় জানতে ইচ্ছা করে। ২৪/৩ শহিদ সূর্য সেন রোডের যে বাড়িতে রৌরব-দপ্তর, সে বাড়ির মালিকও সৌভাগ্যক্রমে কবি দীপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি তো যে-কোনো মুহূর্তেই দপ্তরে হানা দিয়ে মৌতাত সেরে নিচ্ছেন। তাঁর অগোচরে তাঁরই কবিপুত্র রাজন গঙ্গোপাধ্যায় কখনো কোনো ছুতোয় হাজির। হাফপ্যান্ট, গোঁফের রেখাও ওঠেনি, পকেট থেকে একচিলতে কাগজ খুব সন্তর্পণে টেবিলে রেখে 'দেখো তো এটা' বলেই দৌড়ে দোতলায়। তরুণতমদের মধ্যে সে এখন সমান প্রাণোচ্ছল এবং নিজস্ব কাব্যভাষা সন্ধানে অনেকের নজরে। ওর মা আমাদের দীপালিবৌদিও অবিকল বিরক্তিহীন এবং অত্যন্ত স্নেহের সাথেই এই দুর্বৃত্তদের বহু হ্যাপাই সামলেছেন। সুদূর সাঁওতাল পরগণা থেকে এসেছে এবং বর্তমানে এই জেলার অধিবাসী বিশিষ্ট গল্পকার সঞ্জীব নিয়োগী ও এই শহরের নতুন ভাষা-নির্মাণকারী গল্পকার দেবাশিস ঠাকুর যার 'গসপেল' গল্পগ্রন্থটি ইতিমধ্যে ব্যতিক্রমী গদ্যনির্মিতির এক নব্যবয়ান হিসেবে আদৃত। মূলত চাকরির চক্রযানে বহরমপুরে এসেছিল কবি উৎপল বসাক। বছর তিন চারেকের অধিবাস। ওর মতো শুভ্র সৌম্য ও বুদ্ধির ঝলকে ভরপুর তরুণ আমরা খুবই কম দেখেছি। ঠিক ওর কবিতার মতোই। রৌরবের আস্তানা ঠিক টুঁড়ে নিল। ইতিমধ্যেই লিখে ফেলেছেন দুটি মেধাদুরন্ত কাব্যগ্রন্থ। আজ রৌরব নেই, কিন্তু উৎপল এখনও আমাদের মজ্জায় জুড়ে। এসেছে একাধারে পদ্য ও গদ্য লিখিয়ে কৃষ্ণেন্দু ঘোষ এবং কবি রাজা ভট্টাচার্য প্রমুখ। সুদূর পুরুলিয়া থেকে মবিনুল হক ডাকে পাঠাতে থাকল উর্দু গল্পের অনুবাদ। অসাধারণ কাজ। সেই সূত্রে খুব অল্প দিনেই হয়ে উঠল রৌরবের বন্ধু। আজ সে বিবাহসূত্রে এ-জেলার স্থায়ী অধিবাসী অনুবাদ সাহিত্যকর্মে সে খুবই সুপরিচিত নাম। এবং বেশ ক'টি অনুবাদগ্রন্থের প্রণেতা। রৌরবের বিপুল বন্ধুত্বের টানে মৃদুল দাশগুপ্ত (কখনো স্ত্রী কন্যাসহ) অনীক রুদ্র ফল্গু বসু প্রমুখ কবিরা এই শহরে স্বেচ্ছায় হাজির হয়েছে। চুটিয়ে কবিতা পড়েছে। শহর দাপিয়ে আড্ডায় মজেছে। ফেরার বিষণ্ণতায় অঙ্গীকার করেছে আবার ফিরে আসার। বহরমপুরের নাটকের বহু তরুণ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্যামল দাস, কথা প্রায় বলতই না, কিন্তু অমোঘ আকর্ষণে রৌরবের বেঞ্চ দখল করে থাকত। একবার রৌরবের প্রচ্ছদও এঁকেছে। বর্তমানে এ জেলার অন্যতম বিশিষ্ট অভিনেতা হিসেবে তাঁকে আমরা সম্মান করি। প্রেমের সূত্রে আরামবাগ থেকে এ-শহরে আসা অজয় বিশ্বাস অসম্ভব কিছু ভালো গল্প লেখার নিরিখে রৌরবের একেবারে ভেতরের

মানুষ। বর্তমানে তথ্যচিত্রকার। কলকাতায় তার বাড়িই আমাদের শেষ আত্মীয়গৃহ। রৌরবের প্রায় শেষ পর্বে উদয়ন ঘোষের সাথে আমাদের মোলাকাত। বহরমপুর এলেই সন্ধেয় ঢুকে পড়তেন রৌরবের গুহায়। উদয়নদার সাথে আড্ডা মানেই এক সুদূরপ্রসারী অভিজ্ঞতা। বিশ্বসাহিত্যের নানান ঝলক উগরে দিতেন গল্পচ্ছলে। অসাধারণ পাণ্ডিত্য আর অমলিন মন। রৌরবে গোটা চারেক গল্প লিখেছেন। আর মাঝেমধ্যেই তাঁর ঝোলা থেকে বের করে দিয়েছেন সঞ্জীবনী সুধা অর্থাৎ কর্পূর মেশানো মদ। এটা নাকি কমলকুমার মজুমদারের প্রেসক্রিপশন। তিনি সঞ্জীবনী সুধাই বলতেন। গদ্যসাহিত্যের এই খননোন্মুখ জাদুনির্মাতা সামান্য কিছু পাঠকনন্দিত হয়ে অলক্ষ্যেই শেষ করলেন তাঁর বেদনাশ্রয় সংগ্রামসংকুল ও অভিঘাতময় গদ্যপ্রয়াস। এঁদের ঋণ রৌরবের ভোলার নয়। তাছাড়া রৌরবের রক্তমাংসময় মানুষ তাদের লেখা, উদ্দাম জীবনাচার, স্ফূর্তি, প্রেম-প্রতিবাদ-প্রতিরোধে খ্যাপার মতো ঝাঁপিয়ে পড়া শিরদাঁড়ার টানে, ভালোবেসে লেপটে থেকেছেন বহু প্রান্তের বহু রুচির নানা বয়সের একবর্ণ-না-লেখা মানুষ। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলেন জয়নাল (অনল) আবেদিন, প্রীতম পাল, রামধর, অলোক বিশ্বাস, সমর চক্রবর্তী প্রমুখ। রৌরবের আড্ডায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসেছে, কবিতা গান শুনেছে। রৌরবের সভা-সমাবেশে কিংবা নানা প্রয়োজনে সামর্থ্য অনুযায়ী ভেসেছেন। অর্থ ও সাহচর্য দিয়ে এই বিপজ্জনক নৌকোয় সওয়ার হয়েছেন। মনে পড়ে সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত, অমিতাভ রায়, কিশলয় সেনগুপ্ত, সাদেক আলির মতো একাধারে স্বনামখ্যাত এবং অসংখ্য গোপন প্রশ্রয়দাতাদের। রৌরবের প্রেস ও দপ্তর, এমনকী শুভর বদলে-বদলে-যাওয়া প্রতিটি ভাড়াবাড়ি ছিল আমাদের যৌথ জীবনচর্চার অভাবনীয় ক্ষেত্র। আমাদের কমিউন। একদিকে শুভর অন্নপূর্ণা স্ত্রী তুলু, যার দশহাত অন্ন আর বরাভয়ময়, অন্যদিকে শুভর ডানার মতো লম্বা দুই হাত বিশাল বুক আর ওর হাটখোলা দরজা দিয়ে আমাদের সময় স্বপ্ন হুল্লোড় দামালপনা কিংবা দৌরাত্ম্যের প্রবেশ-প্রস্থান চলতেই থাকল যতদিন না ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪। শুভর ছায়াশরীর এই প্রথম মাথা নিচু করে বলল এবার থাক। এবার আমি আমার জন্য এক দূরের তারায় গিয়ে বসব। নদীর পাশে শ্মশানের নিঃঝুমতা থেকে সেই তারাকেই আমরা জানালাম বিদায়।

অন্দরমহল : ঝড়ের রাতে অভিসার।

শুরু থেকেই রৌরব সাহিত্য ও সংস্কৃতির কাগজ। ফলে সাহিত্যই একমাত্র বিষয় নয়। সমাজ রাজনীতি যে সময় তার দরজায় টোকা দিয়েছে, রৌরব প্রবিষ্ট হয়েছে তার অন্দরে। কোনো দলীয় রাজনীতি রৌরবকে কব্জা করতে পারেনি। কিন্তু রাজনীতির ভেতর তার প্রবেশ ছিল পরিব্রাজকের মতোই অনুসন্ধানপ্রিয়। তাই এসইউসি নকশাল গদার থেকে এনভার হোজা অব্দি তার গতায়াত ছিল অবিরাম। ফলত সাহিত্যের পাশাপাশি সমাজসংস্কৃতির প্রতি তার মনোযোগ ছিল ঈর্ষণীয়। মুসলিম নারীবিলের বিরুদ্ধে আয়োজন করেছে সেমিনার। গৌরকিশোর ঘোষ হোসেনুর রহমান স্বেচ্ছায় এসে অংশ নিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে তার জেরে বসেছে সভা। সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ বিরোধী কনভেনশনের প্রস্তুতি চালিয়েছে সারা জেলায়, শেষে বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে সর্বদলীয় সভা। বক্তা রেজাউল করিম ও মানিক মুখোপাধ্যায়। সোভিয়েতের পতনের পর আর একটি সর্বদলীয় সেমিনার 'মার্কসবাদের বিপর্যয়'। যাতে হাজির ছিলেন সদ্য-কারাবাসমুক্ত আজিজুল হক। কাটরা মসজিদকে কেন্দ্র করে উগ্র সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি হতেই মানবাধিকার সংগঠনগুলির সাথে একযোগে কাজে জড়িয়েছে রৌরব। যার অপরিমেয় ফসল শুভর 'এত রক্ত কেন' পুস্তিকা। যার হাজার হাজার কপি নিমেষে উধাও। কোনো সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক কর্মী পুলিশি আক্রমণের শিকার হতেই রৌরব এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। শহরে ক্যাবারে নাচের প্রতিবাদে অনেকের সাথে রৌরব। সিনেমাহলে রুচিহীন দেয়ালচিত্রের বিরুদ্ধে রৌরব ও প্রদর্শনী বানচাল। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে, তার দৌত্য, ফলশ্রুতি গুন্ডা ও পুলিশের দৌরাত্ম্য এবং কেন্দ্রে শুভ ও রৌরব। এই সময়কালে এই অধম-ঘরছাড়াকে রাতের পর রাত আশ্রয় দিয়েছেন রৌরবের একদা-ঘনিষ্ঠ কবি প্রাবন্ধিক অনুবাদক নাসির আহমেদ। সেলাম নাসিরদা। জেলার বইমেলায় সরকারি আধিপত্য, লিটলম্যাগের ওপর কোপ, সেখানে সবার হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো রৌরব। এরকমই আকছার লাভা-আগুনের মধ্যে সফরের দরুন, হাজতবাস হয়েছে শুভর। বিপন্ন ওর পরিবার। গুন্ডা পুলিশের তাড়ায় জেরবার রৌরবের অনেকেই। জেলা বা রাজ্যের প্রয়াত কবিসাহিত্যিক শিল্পীর স্মরণসভার দায়ও অবশ্যম্ভাবীভাবেই এসে পড়েছে রৌরবের কাঁধে। জেলার বিশিষ্ট পণ্ডিত, মহাতপস্বী, সম্প্রীতির মগ্নপথিক রেজাউল করিমকে এক অভাবনীয় স্মরণ করেছিল রৌরব। সারাদিন ধরে শহরের বিভিন্ন মোড়ে একযোগে ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাতটি আশ্চর্য সভা। তার মরদেহ সারা শহর পরিক্রমা করছে আর সভাগুলি থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে গান কবিতা ও তাঁর রচনাংশ। তাছাড়া কবিতা গান গল্পের কত অফুরান রকমারি আসর বসিয়েছে রৌরব তার প্রায়-পঁচিশ বছরের জীবনকালে। বহরমপুর বইমেলায় রৌরবের টেবিল মানেই জেলার সাংস্কৃতিক মিলনমেলা। যেন ওই মহার্ঘ সাতটা দিনের জন্য আমাদের বছরভর অপেক্ষা। কে ভিড় করেনি সেখানে! নাটক গান ছবি-আঁকিয়ের দলও উজাড় হয়ে বসেছে। সন্ধেয় কারো-না- কারো বাড়ি থেকে পৌঁছে যাচ্ছে তোফা সব খাবার। মুহূর্তে লুঠ। বই পত্রপত্রিকা বিকোচ্ছে দেদার। গান চলছে আর 'হার্ড এইচটুও' লেবেল-সাঁটা বিশাল ওয়াটার পট থেকে ছলকে উঠছে সুধা। আর মেলাশেষে গোটা মেলাচত্বর ঘিরে গান নিয়ে গান হয়ে ওড়া। গান রৌরবের প্রাণের সম্বল। যা নিয়েই প্রায় শূন্য পকেটে কত না হিল্লিদিল্লি হয়েছে। পত্রিকা

বিক্রি আর কবিতা গান নিয়েই গ্রামের পর গ্রাম নদী পাহাড় জঙ্গল চষে ফেলেছে রৌরবের দস্যুকুল। শান্তিময় আমাদের মূল গায়েন। রবীন্দ্রনাথের গান ওর গলায় এক মূল্যবান প্রাপ্তি। আর রৌরবের তাজা জীবনবোধ, একে অপরের প্রতি অপার অসীম ভালোবাসা। যে-প্রেমকে স্ত্রীরা পর্যন্ত ঈর্ষা করেছে। যূথবদ্ধ বাঁচা আর মানুষের প্রতি বিশ্বাস রৌরবের আদত জীবনীশক্তি। একাধারে অগ্রজ ও অনুজদের প্রতি বরাবরই প্রগাঢ় মমত্ব, অটুট শ্রদ্ধা। ফলত তাদের প্রাণান্তকর চেষ্টায় প্রায় পঁচিশ বছর ধরে অন্তত একশোর কাছাকাছি সংখ্যা অনায়াসেই বেরিয়ে গেছে। বেরিয়েছে বিপুল ব্যয়সাধ্য 'রৌরব বারোবছর' যার অনবদ্য প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন গণেশ পাইন। এবং তৎকালীন সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সাগ্রহে চতুর্থ প্রচ্ছদে ছিল 'দেশ' পত্রিকার পূর্ণপৃষ্ঠার অত্যন্ত দামি বিজ্ঞাপন। প্রকাশকাল : জানুয়ারি ১৯৮৮। প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার বিপুল আয়তনের পত্রিকার নিদর্শন তখন প্রায় ছিল না বললেই চলে। 'আলবেনিয়া' এক ও দুই, 'মনীশ ঘটক', 'যোশেফ স্তালিন' 'জাত গেল জাত গেল বলে'র মতো অসংখ্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যা। আলবেনিয়া-১ প্রস্তুতিকালীন খুব আকস্মিকভাবেই আমাদের পরিচয় হয় জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষক বিজয় সিং-এর সঙ্গে। তাঁর অপার বদান্যতায় আলবেনিয়া-১ ও ২ সংখ্যার লেখসামগ্রী আমরা বহরমপুরে বসেই নিরন্তর পেয়ে গেলাম। উপরন্তু যোশেফ স্তালিন সংখ্যায় এমনকিছু লেখা তিনি আমাদের পাঠিয়েছিলেন যা ভারতবর্ষে শুধু নয়, বিশ্বেই প্রথম প্রকাশিত। যোশেফ স্তালিন সংখ্যার উদ্বোধনে দিল্লি থেকে উড়ে এসেছিলেন এই শিষ্ট সৌম্য পণ্ডিতমানুষটি। যাঁর সাথে আমাদের বন্ধুতা বহুদিন অম্লান ছিল। টেবিলে পড়ামাত্র সেসব ধীরে ধীরে উধাও। কলকাতা বইমেলায় দূরদূরান্তের পাঠক রৌরবের টেবিলে ভিড় করেছেন। খোঁজ নিয়েছেন জমে উঠেছে আলাপ। পত্রিকা কিনেছেন দাবি জানিয়েছেন নানান সংখ্যার। নতুন কোনো সংখ্যার গ্রাহক হয়েছেন, বুকে বুক লাগিয়ে পরবর্তী সাক্ষাতের জন্য অঙ্গীকার। এইসব অফুরন্ত প্রাণের আঁচেই রৌরব মেরুদণ্ডময় জ্যান্ত এক কাল। ছিল হেতালের ডাল হাতে দাঁড়ানো বন্ধুপ্রাণ, হিড়িম্বাপ্রায় বুক ও শরীরের শুভ চট্টোপাধ্যায় এবং তার কুশলী নেতৃত্ব। সে কখনো কারোকে থিতু হতে নিভে যেতে দিত না। জীবন ও গতিই ওর অবিনশ্বর প্রাণভ্রমর। যা সে অন্ধগভীর জলার ভেতর সাপখোপ রাক্ষসখোক্কসদের পাহারাদারি থেকে ফুৎকারে ছিনিয়ে এনেছিল। যে ভ্রমস্পর্শে আমরা জেগেছি, ছুটেছি, হুল্লোড় করেছি, বের করেছি রৌরব। জেনেছি প্রাণকে কীভাবে হাজার ঝড়ঝাপটার মধ্যেও জ্বালিয়ে রাখতে হয়। আসলে তো ঝড়ের রাতেই অভিসার। শুভ নেই। সে ক্ষতি কি শুধু আমাদের জন্যই তোলা রইল!

বাকবুল হক

- **রৌদ্রের আমন্ত্রণ লিপি (কাব্যগ্রন্থ)**
  দিবারাত্রির কাব্য
- **আমাদের জন্য কেউ দাঁড়িয়ে নেই**
  (যৌথ কাব্য সংকলন)
  আরম্ভ
- **স্পর্শে জাগে অর্চনা** (প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ)
  আরম্ভ

যোগাযোগ : ৯৭৭৫৪৬২৬৭৭

কৃষ্ণা মালিক

কাব্যগ্রন্থ

অনন্তে ভেসে যায়

পরম্পরা প্রকাশনী

মণিশঙ্কর

- **মধুমাস যাপন ও অন্য এক**
  (কাব্যগ্রন্থ)
- **ব্রাত্যজন-কথা** (গল্পসংকলন)

ব্রীহি প্রকাশনী

তপন দাস

কাব্যগ্রন্থ

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

সীমান্ত বাংলা প্রকাশনী

যোগাযোগ : ৯৫৬৪৩৪৫৫৬৪

সা ক্ষা ৎ কা র

‘আত্মত্যাগ জরুরি, সাধনা জরুরি’

নিত্য মালাকার

অধুনা বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার ভদ্রঘাটে ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট জন্ম নিত্য মালাকারের। কৈশোর যৌবন কেটেছে নবদ্বীপে, বর্তমানে কোচবিহার-এর মাথাভাঙ্গায় স্থায়ী বাস। প্রচারবিমুখ মানুষটি নিরালায় স্বতন্ত্র কবিতাযাপনে মগ্ন থাকেন। তাঁর কবিতা বাস্তব ছুঁয়ে রহস্যময় অনন্তের দিকে ক্রিয়াশীল। ‘সূত্রধারের স্বগতোক্তি’ (১৯৮৮), ‘অন্ধের বাগান’ (১৯৯৪), ‘দানা ফসলের দেশে’ (২০০২), ‘গীতবিতান প্রসূত রাত্রি এই বৃষ্টিধারা’ (২০০৮) ‘যথার্থ বাক্যটি রচনার স্বার্থে’ (২০১২) ‘নিমব্রহ্ম সরস্বতী’ (২০১৫) কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠক মহলে আদৃত হবার পাশাপাশি তাঁর বহু মনোযোগী পাঠক তৈরি করেছে।
এক বর্ষণসিক্ত সন্ধ্যার বিশুদ্ধ আড্ডার ফসল এই সাক্ষাৎকারটি। সাক্ষাৎকার গ্রহণের এই আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন কবি সন্তোষ সিংহ এবং কবি সুবীর সরকার।

প্রশ্ন : আপনার বাল্যকাল, কৈশোর নিয়ে বলুন।

কবি : বাল্যকাল কৈশোরের শুরুর সময়গুলি ঘিরে আছে অবিভক্ত বাংলাদেশের ভদ্রঘাটের জীবন—নদী-মাঠ-ধান বাৰলার স্মৃতি। পৌষের কুয়াশা ঢাকা কাকভোর, আদুল গায়ে নদীধারে ঘুরে বেড়ানো। আমার ‘সূত্রধারের স্বগতোক্তি’ অনেকটাই ভদ্রঘাটের জীবন। যেখানে খোদাবক্স, কেরামতুল্লা, সিয়ারাম, বুলবুল বাস্তব মাটির মানুষ।

প্রশ্ন : সূত্রধারের স্বগতোক্তি’ কাব্যগ্রন্থে সূত্রধার কে?

কবি : ‘সূত্রধার’ কবি নিজেই, ‘স্বগতোক্তি’ আত্মকথন। এখানে ‘সূত্রধার’ একান্তভাবেই বিশুদ্ধ আমি। ‘সূত্রধার’কে উদ্দেশ্য করে পাঠক এগোবে। আসলে কবিতা রচনা হয়ে গেলে, শেষ পর্যন্ত তা আর কবির থাকে না।

প্রশ্ন : স্বপ্ন ছাড়া জীবন সার্থক নয়—আপনি কেমন স্বপ্ন দেখেন?

কবি : কবি এবং একজন কেরিয়ারিস্টের স্বপ্ন আলাদা। কবির স্বপ্ন ভাঙ-চুর করার স্বপ্ন—নৈরাজ্যের স্বপ্ন। যদিও স্বপ্নদর্শী স্বাপ্নিক কবি সমাজে সাবলীলভাবে সমাদৃত হন না। নন্দিত নন, নিন্দিত হন। তবে শেষ পর্যন্ত কবির জয় হয়। ‘কবি ছাড়া জয় বৃথা’।

প্রশ্ন : কলকাতা থেকে ৭৫০ কিমি দূরে বসে আপনি কবিতাচর্চা করেন, আপনি কি মনে করেন কবিতায় কলকাতা কেন্দ্রিকতার মিথ ভেঙে গেছে? আপনার কী মতামত?

কবি : অবশ্যই। কবিতা এখন প্রান্তের। শুধু উত্তর নয়, দক্ষিণেও কবিতা এখন প্রান্তমুখী। সমস্ত প্রচারের বাইরে থেকে কবিতাচর্চা এখন কেন্দ্র ভেঙে ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ এক্ষেত্রে অত্যন্ত উজ্জ্বল।

প্রশ্ন : কবিতাচর্চায় গুরুবাদের প্রাসঙ্গিকতা আছে কি?

কবি : আধুনিক কবিতায় গুরুবাদ বিষয়টি মোটা দাগের কথা। সে পূর্বসূরী বা সমসাময়িক হতে পারে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই আসবে বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের কথা। একজন দিশা যে দেখায়। কবি অরুণ বসু সে অর্থে আমাকে পরিচর্যা করেছেন। আমার স্মৃতিকথায় তাঁর কথা অনিবার্যভাবে এসেছে। কিন্তু তিনি বলতেন কারো দ্বারা প্রভাবিত হবে না। অরুণদা আমাকে স্বতন্ত্র হতে সাহায্য করেছেন।

প্রশ্ন : আপনার জীবনযাপন কবিতায় কতটা প্রতিফলিত হয়?

কবি : আমার জীবনযাপন এবং কবিতা-যাপনকে আমি আলাদা করে দেখি না। জীবনযাপন নানাভাবে প্রতিফলিত হয় আমার কবিতায়, যারা আমার কবিতার মনোযোগী পাঠক তারা কিছু বোঝে বলে আমার ধারণা।

প্রশ্ন : কবি নিত্য মালাকারের জীবনে কবি অরুণেশের প্রভাব কতখানি?

কবি : আমার খলিসামারীর জীবনে শেষ পর্যন্ত থিতু হওয়ার পিছনে অরুণেশদার প্রভাব অনেকখানি। এখানে আসবার বছর খানেকের মধ্যেই অরুণেশদার সাথে যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। তাঁর নিয়মিত যাতায়াতের ফলে আরো ঘনিষ্ঠতা তৈরি হল। গ্রামের নতুন স্কুল, অবুঝ না-বুঝ ছাত্রছাত্রী এবং এখানকার সরল গ্রামীণ জনজীবন, নির্মল নিসর্গ প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে কিছুদিন বেশ উৎসাহে ভরপুর ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা দুর্যোগের কালোমেঘে সব স্বপ্ন-পরিকল্পনা তছনছ হয়ে গেল। ওই সময়ে যে গভীর মানসিক যন্ত্রণা ও যে সংকটে দিন কাটছিল, তার সবটুকু দেখেছেন অরুণেশদা। শেষে একদিন বলছেন—‘কেন পালিয়ে বাঁচতে চাও বরং যা অনিবার্য তা মেনে নাও।’ দীর্ঘ পাঁচ বছর কবিতা লেখালেখি এবং ‘অজ্ঞাতবাস’-এর

প্রকাশনা সূত্রে চিঠিপত্রের মাধ্যমে এবং নিয়মিত নবদ্বীপ-কলকাতা যাতায়াতের সূত্রে বন্ধু সংসর্গ গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থায়ও একমাত্র অরুণেশদাই আমার পাশে ছিলেন, কাঁধে আস্থার হাত রেখে অনুকূল সময়ের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন আমাকে।

প্রশ্ন : আপনার সমসাময়িক কোন কোন কবি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে?

কবি : অনেকেই শক্তিশালী। ভাস্কর চক্রবর্তী, শামসের আনোয়ার, রণজিৎ দাশ, নির্মল হালদার এদের কথা অবশ্যই আসবে। এদের বাক্‌নির্মিতি এবং স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর আমাকে মুগ্ধ করে।

প্রশ্ন : আপনার কবিতায় তৎসম শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে আপনি কিছু বলুন।

কবি : যা অনিবার্য ছিল বা হয়, তাই অপরিহার্য বিবেচনায় কবিতায় প্রয়োগ করে থাকি। আশা করি আমার এই কথার ভেতর থেকেই আমার মানসিক ঝোঁক বা পক্ষপাতিত্বের খোঁজ পেয়ে যাবে। —আমার প্রথমগ্রন্থের শিরোনাম ছিল 'সূত্রধারের স্বগতোক্তি'। এই শিরোনামটির বিকল্প কিছু হয় কি? আমার জানা নেই। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম 'অন্ধের বাগান'।—'অন্ধ' শব্দের বিকল্প আমার জানা নেই। একটা কথা অবশ্যই সকলকে জানাতে চাই যে কবিতাকে অনর্থক ভারাক্রান্ত করতে আমি তৎসম শব্দের আশ্রয় নিই না। নিতান্তই অপরিহার্য বোধে আপনা- আপনিই লেখায় আসে আর অন্তত তাৎক্ষণিকভাবে তৃপ্তিসুখ পাই বটে, বলা যায় এই মাত্র আর কী।

প্রশ্ন : গদ্যই যে কবিতার উচ্চতর স্তরের উপযুক্ত বাহন—তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ আপনার কবিতা—আপনার মতামত।

কবি : 'সূত্রধারের স্বগতোক্তি'র প্রথম আলোচক হিসাবে মনস্ক কবি-প্রাবন্ধিক মণীন্দ্র গুপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে এ-রকম ধরনের একটা মন্তব্য করেছিলেন আমার কবিতা প্রসঙ্গে। এই মুহূর্তে তাঁর 'দ্রাক্ষাপুঞ্জ, শুঁড়ি ও মাতাল' গ্রন্থটি হাতের কাছে নেই। থাকলে হুবহু কী বলেছিলেন উদ্ধৃতি যোগে বলতে পারতাম। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে তুলকালাম ঝড়ঝঞ্ঝা আর তীব্র দিনগুলোয় আমি কেবলি আত্মবিনাশের কথা ভাবতাম। কিন্তু দেখেছি বুঝেছি যে আত্মনাশ প্রকৃত পুরুষের কাজ নয়। বরং বারবার মরে গিয়ে বেঁচে ওঠাই প্রবল পুরুষধর্ম। অতএব কীভাবে, কীভাবে যেন... মিথ্যা আত্মোপকারিতা নয় গদ্যবন্ধে বাঁধা পড়ে গেল দশদিক সবকিছু। সে অনেককাল আগের কথা। বেশি কথায় এত গোল বাঁধে, বিবেচনায় এখানেই এ-বিষয়ে ইতি টানছি।

প্রশ্ন : 'গীতবিতান প্রসূত রাত্রি এই বৃষ্টিধারা' কাব্যগ্রন্থে গীতবিতান কে?

কবি : 'গীতবিতান' একটি নারীসত্তা। যে আমার নতুন ঈশ্বরী। যার সাহচর্যে গীতবিতান খুলে দু'জনে প্রচুর গান গেয়েছি, আবেগে ভেসেছি এবং অনিবার্যভাবেই এ দিন আঘাতও এসেছে। যার ফলশ্রুতিতে 'গীতবিতান প্রসূত রাত্রি এই বৃষ্টিধারা'— কবিতা সিরিজ লেখা হয়েছিল।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকে সাম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ 'নিমব্রহ্ম সরস্বতী'-র কোনো মৌলিক পার্থক্য বা পাল্টে যাওয়া আপনি সচেতনভাবে লক্ষ করেন?

কবি : প্রথম জীবনের কবিতাগুলোর মধ্যে যথেষ্ট আবেগতারল্য ছিল। যেমন—'সূত্রধারের স্বগতোক্তি' কাব্যে—'হা-মানুষ' সিরিজের শেষ পঙ্‌ক্তিতে—'এ খোলস শরীর পাল্টে দাও, হে হা-মানুষ' এই পঙ্‌ক্তিতে আবেগ ছাড়া আর কিছুই নেই। তেমনি আরো কবিতা 'ভাতের মানদণ্ডে ইদানীং শিল্পবোধ' বা '১১ আগস্টের স্বপ্ন' উচ্চারণস্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও আবেগ অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে। ''নিমব্রহ্ম সরস্বতী' অতি সাম্প্রতিককালের রচনা। প্রথম যৌবনের আবেগ এখানে নেই। বরং এক ধরনের নির্লিপ্তি প্রাধান্য পেয়েছে। কথা বলার ধরনটিও অনেকখানি পাল্টে গিয়েছে।

প্রশ্ন : হাংরি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আপনার অবস্থান কেমন ছিল?

কবি : হাংরি আন্দোলন বা ওই ধরনের কবিতার কোনো প্রভাব আমার মধ্যে নেই বা ছিল না। প্রথম রচনা সংকলনে শৈলেশ্বর ঘোষের ইচ্ছায় কবিতা থাকলেও তাকে অংশগ্রহণ বলা যাবে না। 'সূত্রধারের স্বগতোক্তি 'কাব্যের কিছু কবিতায় বীজ ছিল মাত্র।

প্রশ্ন : 'প্রতিষ্ঠান প্রকৃত কবিকে খুন করে'—আপনি কি সহমত পোষণ করেন?

কবি : কবিকে প্রাতিষ্ঠানিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রয়োজন। একজন কবির প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশ মেনে চলা বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে প্রকৃত কবির মৃত্যু ঘটে। এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। কবিকে প্রাতিষ্ঠানিক মায়া ছাড়া উচিত।

প্রশ্ন : এখন যারা কবিতা লিখতে আসছে অর্থাৎ তরুণদের উদ্দেশ্য কিছু বলুন।

কবি : পূর্বসূরীদের জানো-পড়ো, তাৎক্ষণিক প্রচারের মোহে গুলিয়ে গেলে চলবে না। হোয়াটস অ্যাপ, ফেসবুক সাময়িক পরিচিতি দিলেও প্রলোভনগুলো পাশ কাটিয়ে চলাই ভালো। লেখার ক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা যেমন জরুরি আবার over smartness স্বতন্ত্র বাক্‌শস্য তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। আত্মত্যাগ জরুরি, সাধনা জরুরি।

★

কবির কয়েকটি কবিতা

অবশিষ্টাংশের খসড়া

ইহার পর আর দেখিবার কিছু নাই। চিকিৎসক নিদান দিয়াছেন। ইদানীং ঝিমঝিম নিদ্রাবশ চোখে দেখিতেছি যাহা বিগত ছিল। যাহা অতীত ঘটমানতার বৃত্ত ছাড়িয়া আসিয়া বড় বাতাবির নীচে এক্ষণে মুহ্যমান আছে।

দেখিতেছি উহার সকর্মক ক্রিয়ার হুল্লোড়-হুজ্জতির বহু কিষ্কিন্ধ্যাবাসর। আর, হাসিতেছি। পাইতেছি বুকে হিহি ঝিমিঝিমি শেলব্যথা। এক্ষণে, এমহা নিশীথ যামে উহাকে অকর্মক ভাবিয়া উপেক্ষার বাক্য রচিতেছি।
এইখানে আসিয়া অবশেষে এক মহা গোল বাঁধিয়া গিয়াছে—
সুভগাটির তবে কে লইবে ভার।
সন্ধ্যারবি হো হো হাসিয়া ফাঁকতালে কখন যে পলাইয়া গিয়াছে মহাযামিনীর দেশে।
কাহিনিচুম্বকে অদ্য ইহাই সকর্মক কথা, ইহাই বোধিনী।
অবশিষ্টাংশগুলির কথা লিখিবে সুজাতা স্মৃতিকণা।

১১ আগস্টের স্বপ্ন

শিরদাঁড়া ভেঙে পড়ে বুকের পাষাণ ভারী হয়,
স্থবির মানচিত্রে মুখ চোখ থেকে ভাষা—
নিশ্চল জলের আয়না;
অন্ধকে শেখায় জ্ঞান, নাভি থেকে উঠে আসে
যৌবনের সরল প্রণালী;
কণ্ঠনালী উদ্বেল হাসিতে ভেঙে পড়ে।
(এইরকম মিলনের সুষম বণ্টন কিন্তু পরীক্ষক
কখনও চান না,
অণু থেকে পরমাণু—সমূহ বস্তুর ধর্ম বৈশেষিক;
এইরকম কঠিন কুটিল পথে যৌবনের দাহ।)
মানচিত্রে নতুন দেশ বা দ্বীপ, সমুদ্রের মগ্ন পাহাড়,
এইসব; চোখ থেকে বিচ্ছুরিত যদি কোনো ম্লেচ্ছভাষায়
তোমার ব্যাখ্যা চায় সুঠাম তলপেট নাভি অথবা নির্দেশমতো
যেকোনো আয়নায়,
তুমি কি সচিত্র মুখে অন্ধকে শেখানো জ্ঞানে
উদ্বেল হাসিতে তুমি, নাভি থেকে উঠে আসা সরল বিশ্বাসে
সত্যিই দেখাতে পারবে আমাদের স্বপ্নময় যুগ্ম প্রতিচ্ছবি?

আত্মঘাতকের সামনে একদিন

একটা মিথ্যে নামের মধ্যে ওত পেতে বসে আছি বহুকাল,
আশা—একদিন-না-একদিন খুঁজে পাবই।
সুদূর বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপরে এককোণে
একটা কালো বিন্দুর মধ্যে থাকি,
খুব ঘাড় গুঁজে থাকা;
কোনোক্রমে চাদরের ঢাকনার তলায়
সারাবচ্ছর শীত আর বর্ষার আচ্ছাদনের নীচে
নিজেকে বাঁচিয়ে চলা।
ইচ্ছা—একদিন-না-একদিন যাবই বর্ষার ছাতা খুলে
শীতের চাদরের ঘোমটা খসিয়ে, মুখে ফুর্তির হাসি,
শরীর ঝলকিয়ে উঠবে—পরিচয় দেব :
নে, সিগারেট খা!

পর্দা ও নিশান উড়ছে

পর্দা ও নিশান উড়ছে, উঠোনে কাঁঠালপাতা জড়ো হওয়া ধুলো—
চোখের ভিতরে ভাঙছে বনস্পতি, ঢেউ—দিঘা, ঝাউ গাছ
সমতল মাটির উঠোনে
এখন রোদে ও জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে তুলসীবেদি,
তোমার শাড়ি ও শায়া ঝুলন্ত কাঁচুলি।
পর্দা ও নিশান উড়ছে বড় ভয়ে—আকাশ ভাঙছে বুঝি,
ছাতা ও আয়নার ওপরে জমছে ধুলোময়লা, জীবাণুভরতি হাওয়া
অলস উনুনের ধোঁয়া...
এখনও তো অভ্যাস গেল না।

নিঝুম হয়েছে মানুষ স্বপ্নে ও সঙ্গমে লীন, হাতে হাত
কারা যায় ওই মাঠে—ধু-ধু শূন্যে
শূন্য নদীর বুকে নিঃসঙ্গ জোছনায়...
পর্দা ও নিশান উড়ছে, অলস রোদ্দুরে এদিক ওদিক
চতুর্দিকে মুখর স্তব্ধতা ছাড়া কিছু নেই, দুমড়ে-মুচড়ে
হাত পা আমার,
তোমার উনুনে ঢুকছে কাঠি-কাঠি—আগুন নিবিয়ে
তুমি এখনও কি ঘুম যাও, চিরমধ্যাহ্নের খেলা...
পর্দা ও নিশান উড়ছে, তোমার শরীর আর চোখ।

অনিমেষ মণ্ডল

ঈশ্বরের ছায়া (কাব্যগ্রন্থ)

আদম

প্রাপ্তিস্থান : ধ্যানবিন্দু

যোগাযোগ : ৯৭৩৪০৭৩৪৫৪

পূর্বা মুখোপাধ্যায়

যক্ষিণীর জার্নাল (কাব্যগ্রন্থ)

রাবণ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আত্মপাথর

মুগ্ধ, সকল প্রশংসা পেয়ে
আজ আমি গাছ হয়ে গেছি,
তবু এতটুকু ঈর্ষা কমেনি আমার!

লোভ দ্বেষ কাম পাতায় পাতায়
আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে তোমাকে
ছিদ্রপথে রক্ত নয়;
ঢেলে দিচ্ছি দমন-অঙ্গার!

আবীর মুখোপাধ্যায়

একলা

এভাবেও যে যাওয়া যায়...
যেন ঘুমের মধ্যে কেউ সরিয়ে নিল ঘুমপাড়ানি হাত।
বন্ধ হল ঘরের চাবি, মাঠের গান।
চমকে দেখি ভুবনডাঙায় বিষম অন্ধকার,
মাঠের মাঝে একা আমি,
একলা অকস্মাৎ!

ব্রেকআপ

চাঁদনিচকে শেষ বিকেলের আলো
সুদূরে সন্ধ্যাতারা, ঠান্ডা কফির কাপ।
কাছাকাছি ভিজছে দু'জন মানুষ,
তবু ওদের একলা বলাই ভাল...
আজ ওদের ব্রেকআপ!

অদিতি বসুরায়

প্রাক্তন

হিরণ্ময় আমাকে বিয়ে করবে বলেছিল।
হিরণ্ময় আমাকে ভালবাসার কথা বলেনি কখনও
এমনকী বিছানাতেও নয়।
তবে সে তুখোড় খেলুড়ে ছিল, মানতেই হবে।
হিরণ্ময় আইস্ক্রিম ভালবাসত; চকোলেটও
শুনেছিলাম, কিশোরকুমার মারা গেলে সে নাকি একমাস দাড়ি
কাটেনি।
সে সময় ক্যারাম খেলা হত খুব
হিরণ্ময় আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত ছাদে
রাস্তায় রাস্তায় তখন বজ্রপাত, উল্কা ও মিছিল...
হিরণ্ময়কে আমি ড্রিবল করে গেছি সুসময়ে
তখন সে ক্রমাগত তার মৃত মায়ের কথা বলত
আমি তাকে রাধাচূড়া শিখিয়েছিলাম মাত্র ছ'মাসে!
...ডুব সাঁতার, বাটারফ্লাই সব সব।
আসলে হিরণ্ময় আমাকে বিয়েই করতে চেয়েছিল
অথচ ও প্রোপোজ করার সাড়ে তিন হাজার দিনের দিন,
জানতে পারলাম হিরণ্ময় বলে আসলে কেউ ছিল-ই না
আমার পায়ের চেয়ে দু'সাইজ ছোট মোজাকে আমি বরাবর
'হিরণ্ময়' বলে ডেকে এসেছি!

রেহান কৌশিক

কফিন

নিজের কফিন ছুঁয়ে বসে আছি বহুজন্মকাল
কফিনে শায়িত যে-শরীর
সে কেবল অন্ধ হয়ে তোমার অপার স্পর্শ গেঁথে রাখে নিজের
ভিতর
আমি শুধু এই দৃশ্য পাহারা দিয়েছি একা কালের রাখাল
যে-মানুষ প্রকৃত প্রেমিক
সে-মানুষ অন্ধজন ... সুনিবিড় স্পর্শ দিয়ে চিনে নেয় সব
চিনে নেয় পাতাঝরা, আভার উৎসব
কোনও এক টান যেন খুব
গভীরে কোথাও ওঠে বেজে
হলুদ বিকেল জুড়ে আশ্চর্য পালক কত উড়ে আসে মৃতের শহরে
আমি সব চিনে নিতে পারি
কে না চেনে এই চিঠিপত্র
নিঃশব্দ বয়ানে যার গাঁথা থাকে মুগ্ধ ঋতু পুরানো অক্ষরে!

সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছায়াবন্দর

কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে একদিন
মিলিয়ে গিয়েছিলাম দিগন্তরেখায়
পেরিয়ে গিয়েছিলাম মাইল মাইল বালিয়াড়ি
আর ক্রুদ্ধ সমুদ্রের প্রকাণ্ড হাঁ-মুখ
গোধূলির রক্তিম আভায় একদিন
সমুদ্র ও আকাশের চুম্বনদৃশ্যের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে
হাতড়ে বেরিয়েছিলাম গোলকধাঁধায় হারিয়ে ফেলা সিম্ফনি
ছায়াবন্দরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকা ভাঙা জাহাজ দেখে
আমার মনে হয়েছিল মেহফিল বসবে আবার ওই ডেকে...
একদিন কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে
দিগন্তরেখায় মিলিয়ে যেতে যেতে
আমার মনে পড়েছিল উঠে পাওয়া কফিশপ, কোণের টেবিল
আর আমি দেখতে পেয়েছিলাম মেনুকার্ডে লেখা আছে—
একটা জীবন দিলে এক প্লেট বিচ্ছেদ কিনে ফেলা যায়।

তিলোত্তমা বসু

রাইকমল

একা কথা
ঘুঙুরের ছম ছম
ছম ছম
এ প্রাসাদে ঝাড়বাতি জ্বালে...
কে শুনছ তাকে?
জানলায় চাঁদ বলে,
জন্মেরও আগে থেকে
বধিরতা শুনেছে আমাকে
শোনে ওই পাথরদেবতা
প্রাচীন মন্দিরে

ঘণ্টাধ্বনি হয়ে উঠে আসে বাক
মৃণালবাহিত আত্মা
সহস্র পাপড়ি মেলে
পড়ে থাকে পায়...

রক্তচন্দনের ছিটে দিতে দিতে
রাত পোহালেই অশ্রুত ধ্বনিরা ডাকে
রাই জাগো ...রাই জাগো ...রাই ...

বব

শিল্প

অর্জন আমারও আছে, অবহেলা প্রেরণা ভেবেছি।
চিরকুটে দূরত্ব লিখে দু'বসন্ত হেঁটেছিস মেয়ে!
তাসের ঘরের মতো নিখুঁত নিপুণ উদাসীন...
দ্যাখ... আমি বাতাস এঁকেছি।

ঋপণ আর্য

কবিতা

হিমি উঠোনের চাঁদ ভালবাসে আমি মাঠের চাঁদ ভালবাসি
রাস্তার চাঁদে মাঝেমধ্যে দু'জনের দেখা হয়
আজ চাঁদের রাস্তায় চাঁদ নেই চাঁদমারির ব্রিজটা আছে
নিজের সাথে দেখা করার একেবারে মাঠের ভেতরে এই
ব্রিজে সব ঘড়ি থেমে আছে
এইসব ক্ষেত-ফলন অদি ও অনাথ ছদ্ম মালিক এখন
দূরের গ্রামে যেখানে সময়ের মার
মশা মারতে মারতে গ্রামে বাজার ঢুকিয়ে ফেলছে
শহুরে গলি ঢুকিয়ে ফেলছে অন্যমনস্কতা বাজারদর
দেখিয়ে বলছে
এই হল তোমার নিস্তব্ধতা

আমিও ফলন এক নিঃসঙ্গতার
মশার কামড় সহ্য করা নিঃসঙ্গতা
উদ্দেশ্যে পৌঁছেই যার মনে হয় আরও কিছুটা যাই

বিদিশা সরকার

কবিতা

অ-বারণ বৃষ্টি নামল রাতে। নিভে গেল মশাল শহর।
আমার জানলার পরদা, তোমার জানলার পরদা সরে গেল
মৌসুমি হাওয়ায়। শুধু তোমার আমার মাঝে কাচের দেওয়াল।
দেখতে পারছি উভয়ত, জলনূপুরের শব্দ মনে গুনগুন।
একটু আগুন দেবে? তরপ তরপ জিয়া রাহতের ধুন।
কেমন উদাস তুমি, কেমন পাহাড়ি পথ বেয়ে বেয়ে উঠে যাচ্ছি
দেখো। বিদ্যুৎ টনক দিল, দাঁড়িয়ে রয়েছি পথে একপশলা
তোমার সমীহ।

ঋকপর্ণা ভট্টাচার্য

মিথোজীবী ভালবাসা, মৃতজীবী না

এসো ঠিক ততটুকু নির্ভরতা পাক আমার আবেগ
যতটুকু গুল্ম হতে পেরে ধন্যবাদ দিতে পারে
ভিতু লতাটুকু বৃক্ষরাজের কঠিন বস্তুবাদী ডালে।
এসো, ঠিক ততটুকু কান্না মেপে ভরে দাও আমার শিকড়-আঁচল,
যতটুকু কান্নাকে চাতকীয় ভালবাসা ভেবে,
হৃদয়মথিত হয়ে, প্রাণরস কোমলতা দিয়ে,
জেনে-বুঝেও উপেক্ষা করি
প্রয়োজন তত্ত্বটিকে,
অনায়াসে।
আমিও পরিবর্তে যেন ওই লোনাজলে
লিখে যেতে পারি দিনের হিসেব।
আসলে সবটাই মিথোজীবী জীবন।
তুমি চাও খাদ্যরস,
আমার আনন্দ শুধু দৈনন্দিন মৃত্যু উদ্‌যাপন!

সম্রাজ্ঞী বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর

যেটুকু দিয়েছ যদি সেইটুকু নিয়ে
থেকে যেতে পারতাম...

তাহলে হয়তো এই আরও ভাল শান্তির জীবন।
ঈশ্বর দু'দিনের,
বিশ্বাসও পালটে পালটে যায়!
অর্থহীন জীবনে
ঈশ্বর কেউ নয়
প্রসাদই সত্য আর
নিখাকির পৃথিবীতে প্রসাদের স্মৃতি
আমি সেই নিখাকি...

যে প্রসাদের স্মৃতি থেকে
ঈশ্বরকে তুলে নিয়ে
খেয়ে নিতে চেয়েছিল...

নিবেদিতা আচার্য

হেঁটে চলেছে সকাল

জেগে থাকতে থাকতে ঘুমের কথা ভুলে যাচ্ছিলাম প্রায়
ফুটবল মাঠের পাশে ঘাপটি মেরে আছে জীবন
কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা মানুষ দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল স্টেশন
ঘুমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছেন তলস্তয়
জেগে থাকার মধ্যে ঢুকে পড়ছেন তলস্তয়
ট্রেনের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়াটা কোনো কাজের নয়
আমাকে বোঝাচ্ছিল তালেবর এক কুমোর
বরং মাটির প্রকাণ্ড তাল পিটতে থাকো
চাকার ওপর ঘোরাতে থাকো দলাদলা নরম মাটি
বারবার জল ছেটাও, কাজটার মধ্যে মেজাজ আছে
চাকা ঘোরাতে ঘোরাতেই একদিন পেয়ে যাবে নায়িকার ছটফটানি
চাকা ঘোরাতে ঘোরাতেই তুমি দেখে ফেলবে
উইটিবির থেকে উঠে আসছে মিল্কিওয়ে
খ্যাতির লম্বা কুর্তি গায়ে হেঁটে চলছে সকাল

পূর্বা মুখোপাধ্যায়

সমগ্র পতন ঈর্ষারং

তোমার ছন্দ স্পর্শের এমন দুর্দান্ত চমৎকার
বনে বনে বাতাসকে এই খেপিয়ে তোলার ষড়যন্ত্র
ভিজে আলোয় খসিয়ে দেওয়া পালক-ভর্তি রং
কুড়োতে হৈ হৈ পড়ে যাক!

আমার ঈর্ষা হয় না।
আমি তোমার ডানায়, উড়ছি ...

বেগুনি নীল আকাশি ....
বেগুনি নীল আকাশি ...

সবুজ হলুদ কমলা লাল ...

শূন্যের ভেতর আরো শূন্য খুলে যাও ...

হে ঈর্ষা, হে মাদকতাময়ী, এইবার
তির ছুঁড়ে দ্যাখো, কীরকম
পতন সমগ্র ভালোবাসি
ঈর্ষা মূল শক্তি। ঈর্ষা
শ্বেত পীত নীল লোহিত বহুবর্ণ কালি...
জিহ্বায় সংকেত। তবু তাকে বুকে নিয়ে একটি নিরীহ কলম
শুকিয়ে শুকিয়ে মরছে খালি।

সুজিত দাস

যা কিছু চতুর্থ

আমি কিন্তু লুকিয়েই আছি।
খয়েরবনে জমে থাকা মেঘের মতো লুকিয়ে আছি,
তোমার চেস্ট-অফ ড্রয়ারের চতুর্থ খোপে লুকিয়ে আছি।
জানো সেই কথা। এটা সেটা খুঁজছ কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়টা ঠিক
এড়িয়ে যাচ্ছো।
অথচ এই চতুর্থ অধ্যায়েই লুকিয়ে রেখেছ কত কিছু...
ময়ূরের পালক, জগজিৎ-চিত্রা, আকাশি নীল খাম, রেড-ইন্ডিয়ান
যোদ্ধা,
সাবওয়ের মতো হাইফেন। আরো কত কী , ওই চতুর্থ খোপেই।
যে-কোনও চতুর্থ চ্যাপ্টার আসলে
কঠিন মনোযোগ দাবি করে। দাবি করে তোমার নিজস্ব সব কিছু।
পুরনো চিঠি, একলা বিকেল, দুর্দান্ত মনখারাপ।
চতুর্থ খোপ জানে তোমার নবজন্মের ইতিহাস, রেনেসাঁসের
কমা-সেমিকোলন।
এই যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
আবিষ্কার করলে তোমার প্রথম বলিরেখা আর চোখের নীচের
কলঙ্ক...
এসবের আই-উইটনেস আমি। চতুর্থ খোপে আমার কোনও
বন্ধু থাকতে নেই।
এই বিতর্কিত চারশো একর জমিতে একা আমি
আর তোমার অনিচ্ছুক প্রসাধন-সামগ্রী, প্রাক্-মোবাইল যুগের
চিঠিপত্র।
চতুর্থ শেলফ তোমার দুপুরের যদিচিহ্ন, সন্ধ্যের টক শো
তোমার হারিয়ে যাওয়া প্রেমিক। রিস্কল-ফ্রি ইতিহাস।
উড়োচিঠির পোস্ট-বক্স
চেস্ট-অফ-ড্রয়ারের চতুর্থ খোপ আসলে তোমার কৈশোরের
চড়ুইভাতি, চল্লিশের চাঁদমারি।
চতুর্থ খোপে এত কিছু রেখো না
চতুর্থ শেলফ এক লুকনো বাঙ্কার, চতুর্থ অধ্যায় নিজেই এক
বারুদের স্তূপ।
চতুর্থ শেলফ পড়তে না বসা এক ফাঁকিবাজ কাঠবেড়ালী। ঠোঁটে
চিনেবাদাম
চতুর্থ সবকিছু এক নগণ্য নয়ানজুলি। এক বেগুনি দুর্গাটুনটুনি।
এক ভয়ডরহীন ফিদাইন।

মেঘ বসু

বিবাহ বার্ষিকী

ভালোবাসো কত ভাবে যে বোঝালে
চিরচেনা হাতে মুছে দিলে শেষতম স্বেদবিন্দু
হতক্লান্ত রান্নাঘরে ঝুল, টিকটিকি
টগবগ করে ফুটছে অফিসের ভাত, মেয়ের টিফিন বাক্স
সামান্যই খোলা, না জুড়োলে বন্ধ করা মানা
আর, তারই ফাঁকে ... এভাবে ... সত্যি ভাবিনি!

রাহুল সিনহা

উড়ান

ফিরিয়ে দিচ্ছি এই সমুদ্রমেখলা দেশ,
আজন্মের বাতাস, স্পন্দিত হৃদয়পুর।
ভেবেছো এসব বাদ দিয়ে কী থাকে আর?
স্থান অকুলান, তাই চলে যায় বহুদূর।
দূরত্বও জলের মতোই পাত্রধর্মী
তাই আপেক্ষিকতার এই খেলা
দূর থেকে উপভোগ করি আর
পরিযায়ী বাতাসে ওড়াই ঘুড়িচিঠি
হাওয়ারা দিক বদলালে হয়তো
তোমার ছাদেও হবে তার সাকিন।

অনিন্দ্য রায়

সংসার

১

সন্দেহ দুর্দান্ত কল, সংঘটিত এবং ধারালো
উপহার দিতে এসে কেটেছে নিজের হাত...
ফিনকি দিয়ে ব্যথা
ছুটছে কবজি থেকে, চেপে ধরি, মুখে নিয়ে চুষি ইহলোক

দুজনে ঝিমিয়ে পড়ি, দুজনেই নিদ্রা পাই, দুজনেই শতখণ্ড হই

২

বিপরীতে চেয়ারকাহিনি, পায়ে ঠেলি চার্ম
আর গানের আস্পর্ধা ঘষা খায়
শুনি তার অ্যাপিল কত যে
আমাকে বসাতে চেয়ে টানে ছায়াপথ

কোথায় পৃথিবী ছিল ভুলে যাই
রাধিকা রশ্মির বোউ
যে কৃষ্ণে ঢুকেছি তার ঢোলোকটি ফুটো

সুশোভন দত্ত

শ্রাবণ

আকাশ জুড়ে মেঘলা গুঁড়ো গুঁড়ো
গহীন আরো গহন ছিলে তুমি
বাইরে যদি ঝড় ওঠে খুব জোরে
পাগল কিন্তু ভয়েই মরে যাবে

উড়ছে ধুলো উড়ছে পাতা-লতা
দুলছে দুলুক গোত্তা খাওয়া ভোর
বাইরে এত আলোর ঝলকানি
বাজের ভয়ে কান চেপেছে দেশ

আকাশ নাকি নিটোল কোন মেয়ে
শরীর জুড়ে ধারণ করে মেঘ
করোটি ভেঙে তরল ঢেলে দিলে
তাকেই নাকি শ্রাবণ বলে চিনি

শ্রাবণ তুমি আপন বেগে ঝরো
প্রতিটা ফোঁটা অমূল্য এক প্রেম
মুঠোয় ধরে পাগল মাখে দেহে
যদি শরীর থেকে গজায় অঙ্কুর

ভিজে শরীর, ভিজেছে ডালপালা
পাগল কাঁপে বেজায় থরোথরো
মুচকি হেসে বিষণ্ণ এক সাঁকোয়
জড়ো করেছে বিপজ্জনক ঢেউ

আঁতকে উঠি। থামতে বলি, তবু
সাঁকোয় বসে পাগল ধরে বাজ
পশ্চিমে মেঘ মুখ করেছে ভার
এবার বুঝি পাবো না নিস্তার

দুলছে সাঁকো, ফুলছে জল-বায়ু
এবার বুঝি ভেসেই যাবে দেশ
হঠাৎ দেখি এলোচুলের মেয়ে
সাঁকোটা ধরে দোলায় বারবার

হায় রে প্রভু! বিচিত্র সংসারে
পাগল দেখি বাড়িয়ে দেয় হাত
হাতটি ধরে সাঁকোয় ওঠে কালি
চুল যে তার মাটিতে লুটোপুটি

বাড়ছে রাত, সাপের মতো নদী
আদিম পুরুষ খুলে ফেলেছে জটা
বজ্রালোকে চমকে উঠি, একি
পাগল দুটি ঠোঁট রেখেছে ঠোঁটে

সোমেন মুখোপাধ্যায়

ভয়

তোমার ঝোলা থেকে বেরিয়ে আসছে
আশ্চর্য ফল। সাদা পায়রা, কাচের গ্লাস
অথচ তুমি কোনও জাদুকর নও
কেবল গন্তব্যে পৌঁছাতে চাইছ।
এই সুনিপুণ খেলায়
দূরে থেকেও নিকটে চলে আসি,
দেখি, যে পায়রা তুমি ওড়াচ্ছ
ডানায় তার আগুন লেগে আছে।
তুমি, তোমার পার্শ্বচরিত্ররা বলছে
আগুন নয়, ডানার রং সাদা ...

তারপর যত আমি সাদা দেখি
তত ভয় পাই, আগুনে ভয়।
ভয় লাগে মাতৃস্তনেও
দুধের ভেতর থেকে আগুন আসে যদি?
আমি তো গোপালের মতো
সুবোধ বালক নই...

মুকুট সেন শর্মা

গুহার ভেতরে বসে আছি

এখানে পিঠ পুড়ে যায়, রোদ এত কড়া এত চড়া
তবুও সাদা গলে না এক ফোঁটা
ফোন সব স্যুইচড অফ
কাজ করে শুধু পোস্টপেড মোবাইল
যেন গুহার ভেতরে বসে আছি—আদিম মানব
মেয়েগুলো যেন এক একটি কমলার তাজা কোয়া
বেদানার মতো ঠোঁট, আপেল রঙের মতো গাল
তারপর শুধু সাদা আর সাদা
সাদার ওপার থেকে কাঁকড়া বিছারা আসে
তারা আত্মগোপন করে থাকে ফট্‌ফটে ধবলের স্তূপে
আর আঘাতের অপেক্ষায় সময় গোনে
আমাদের বন্ধু নেকড়েরা দাঁতে আর নখে
সাদার স্তূপ ভেঙে বের করে তাদের
আর ভেঙে দেয় আঘাতের হুল।

অপাংশু দেবনাথ

প্রতিমা

প্রতিবার বাঁক নেয় নদী অতঃপর সমুদ্রে সে মিশে।

কখনো নুড়ি কুড়াই রোদে, কখনো ঝিনুক, জানো সব।
তোমার থেকে আলোক নিই, তোমার থেকেই পাই দুখ।

এ সম্বলে তোমাকেই রোজ ভাঙি, পুনর্নির্মাণে সাজাই।

তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতৃতর্পণ

এই যে ছায়ার নীচে বসেছি লুকিয়ে—
আজ কার প্রতীক্ষাদিবস?

আজ কার না-থাকার পাশে কেঁদে উঠছে
আমাদের দিনান্ত-প্রয়াস?
তাকে যদি সহজে ভাসাই...

ও শীতল, ও আমার নিঝুমের আলো
এই যে সামান্য জুড়ে মহাবৃক্ষবাসনার মতো
তুমি এক বনস্পতি, ছিলে বলে পেয়েছিল আশ্রয়—
তার শূন্য শরীরের পাশে
আজ কেন আমাকেই গাছ হতে বলো?
বৃক্ষহীনের দেশে কেন দাও আমাকে আবাদ ...

শুভঙ্কর বিশ্বাস

মফস্‌সল

এখনও অনেক রাত ঘুমহীন জেগে থাকে চাঁদ
তারার ভেতরে তাকে আলো নিয়ে ঝলকাতে দেখি
চাঁদের ভেতরে জমে আরো কত ঘোর ব্যাধি ক্ষত
এখনও অনেক দিন ঝলমলে আলো দিয়ে যাবে।

পৃথিবী রঙিন কেন? ফুটপাতে জেগে থাকে শিশু।
চাঁদের আলোর রাতে দাউদাউ চোখ দুটো জ্বলে
হাজার তারার নীচে এইভাবে শুয়ে থাকে চুপ
রোগে ভোগা হাড়গিলে খিদেপেটে ওরা দলে দলে
এইভাবে কত রাত পার হয়ে যায়
শহুরে বাসিন্দা যারা শরীর জুড়ায়।
কখনও জ্বালে না কেউ ফুটপাতে আলো
শিশুদল চাঁদ দেখে সে রাতে ঘুমাল

ক্রমশ সকাল হয়, সবাই হারিয়ে যায় ভিড়ে
কষ্ট পাই শুধু আর বসে থাকি রুগ্ন নদীতীরে!

তাপস মাল

ছায়া এবং ঈশ্বর

ছোটোবেলায় সাতামনীদের পাড়ায় কত ভিড়
যে যখন খুশি আসত। উঠোনে বুনোফুল
আর বন ঘেঙুরের গাছ চারপাশে শীতল বৃষ্টি

রাত্রির উঠোন জুড়ে পায়ের শব্দ। অন্ধকারে যৌবনের গর্জন
আমি তখন ইশারা বুঝতাম না। তর্জনী কাকে বলে

এক একটি রাত ওদের কাছে ঈশ্বর
চিরকাল ঈশ্বর...

শুভঙ্কর সাহা

জীবনের মাঝখান থেকে দুটো লাইন

তোর জন্য বাঁচিয়ে রেখেছি দুটো কুমড়ো ফুল।
মৌমাছি আসে, আসে প্রজাপতি
মধু আর নিশিজলের লোভে।
ঘুরতে ঘুরতে শূন্যতার মাঝে লেপে দেয় মুখ;
এক ক্যানভাসে সবটা ঠাঁই দিতে পারি না বলে
আস্ত এক দীঘির জলে ঢেলে দিই সব রং
নতুন নতুন রঙের নেশায়, আগুনের নেশায়
মুঠো করে ধরি আকাশের চাবি

সময় তো জানে, বোঝে সব
কখনও কখনও কঠোর বাস্তবের চেয়ে
সত্যি হয়ে ওঠে কিছু নির্লোভ ভুল
এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি দুটো কুমড়ো ফুল।

অতনু চক্রবর্তী

হাঁড়িয়া

এরূপ দৃশ্য দেখি মাঝে মাঝে পথের ধারে বটগাছটির ছায়ায়
পাছার নীচে শূন্য থলি পেতে বসে থাকা মধ্যবয়সী নারীদু'টি।
সামনে হাঁড়িভর্তি হাঁড়িয়া। প্লাস্টিকের মগ। অ্যালুমিনিয়াম
জামবাটি।
বটপাতায় মোড়া বুটসেদ্ধ, লঙ্কা, নুন ইত্যাদি।

তপ্ত দুপুর। উপযুক্ত সময়ে তারা বিক্রিতে বসে। আর, তাদের
ঘিরে বসে থাকে অনুরাগী খদ্দের হাঁড়িয়ার পাঠশালায়।

ক্রমে বেলা পড়ে। বটগাছের তলায় হাঁড়িয়ার বাস মেশা ছায়া
আরো ঘন হয়। দু'-একটি পাখি ফিরে আসে আবার উড়ে যায়।
নারী-দু'টিও চলে যায়। আর তারপরও দু'-একজন তখনো
দূরপানে চেয়ে উদাস, বিন্দাস বসে থাকে হাঁড়িয়ার পাঠশালায়।

দীপশিখা ঘোষ ভৌমিক

কুয়াশাসন্ধানী

বাবা ছিলেন কুয়াশাসন্ধানী...
পাতার প্রচ্ছদে, গাছের আড়ালে
লুকিয়ে থাকা রোদ্দুরে
কুয়াশা হাতড়াতে হাতড়াতে...
ভোরের ভাঙাচাঁদ মুচকি হাসত,
গৃহধর্মে নিবিড় দিনগুলোতেও...
প্রকৃত প্রস্তাবে
কুয়াশার কাছে
বাবা প্রগাঢ় বিষাদ জমা রাখত...
মৃদু মৃদু কান্নাও হয়তো...

সুশান্ত ভট্টাচার্য

দাহ

বাবার পূজাপাঠ, আমার বিড়িবাঁধা

পাঁচ ভাই বোন
টুকরো টুকরো বেড়ে ওঠা

বুঝতে পারিনি, মাকে এত উদাস লাগত কেন;

কত খরা, বন্যা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ
এক কিলো ভুট্টার চালে পাট পাতা মিশিয়ে...
ধানের চালের স্বাদ কতদিন বুঝিনি।

মেজ ভাই খুব কাঁদত, মাও আঁচলে চোখ মুছত
আমি কাঁসার বাটি নিয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি
বাবার মুখে খিলি পান, হাতে রুহিতনের টেক্কা
সাহেব, বিবি, গোলাম

আনারস বাগানে কতদিন সাপে শঙ্খ লাগত
মা নতুন গামছা ছুড়ে দিতেন
গুন গুন করে গাইতেন মনসার পালাগান

তীব্র দমকা হাওয়া—বারান্দা ভেঙে চুরমার
অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন বাবা
শুধু ভাঙাটালির টুকরোয় কপাল কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত।
আমি এই প্রথম চিনলাম রক্তের প্রকৃত রং
আমি এই প্রথম চিনলাম প্রতিটি মা এক দুরন্ত ঝড়
আমি এই প্রথম চিনলাম আমরা পাঁচ ভাই বোন মারাত্মক ঢেউ
আর
আগুনের প্রবহমান
ও পৃথিবী তুমি আমাকে আর কি চেনাবে—দুঃখিত বাবার ঠোঁটে
চুমুর বদলে পাকাঠিতে আগুন ছোঁয়ানোর কষ্ট

দেবপ্রতিম দেব

মৃগনাভি

আমার মনে—আছে মৃগনাভি,

তাই আমি জানি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গভীর সত্তা খুঁড়ে দেয় না,

আমার মৃগনাভি আমার মুরশিদ তার সুগন্ধ এক চাবি

আমার মনে আছে, তলায় মাটিহীন সারি-সারি বাঁশের খুঁটি।

সাধনা যৌনতার মতো,
আঙ্গিকের জোরে ধরে না রাখলে, ফ্যান-ফ্যানানো ফসকে
বেরোয়।

আমার মৃগনাভি এক পাখি তার সুগন্ধ গভীর নীড়,

এই শ্রাবণ ভাসিয়ে নিল খুঁটি, কোনো শ্রাবণ ভাঙল নীড়।

আমার মৃগনাভি আমার নৌকো তার সুগন্ধ
স্বপ্ন-সাগর,
স্রোতে ভেঙে পড়ে নৌকো আর জলের খেলা ডুবছে মোহনায়,
আমার মনে আছে মৃগনাভি,

আমার ভেতর মৃগনাভি।

সুপ্রভাত রায়

অবশ ঠোঁটের উচ্চারণ

১

শান্ত ... দীর্ঘ... ছায়া নেমেছে গায়ে। রক্তচলাচলে উঠে এল গাঁয়ের ছেলে পটু। অথচ বর্ণমালার হাত ধরে রোদের আঙুল। 'নখের' আশ্চর্য উপস্থিতি ... আলো, দৃশ্য থেকে শব্দতে এসে ঘর বাঁধে। দেখি তীব্র প্রকাশ; ফোন না করেই, সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে...

২

ঘুম ভাঙতেই, সে এক আকাচা নেগেটিভময় দিন উঠে এল বিছানায়। স্বাভাবিক স্বভাবে পাশ ফিরব বলে পথে পথে আত্মীয় জড়িয়ে—অপেক্ষা না লিখে; ছায়া দিয়ে কাটাকুটি খেললাম, আনলিমিটেড। বসে বসে। তারপর; আলোর প্রবেশের উদ্বোধনী সঙ্গীতসঙ্গীত গন্ধ। চেনাজানা গ্রিল দেওয়া ফ্রেম নিয়ে সাদাকালো জানলারা দেখা দিল একে একে। সবাই আমাকে একটাই রুমের অনেকগুলো দরজার প্রত্যাশিত গল্প শুনিয়ে গেল। শুনতে শুনতে চোখ জুড়ে যতিচিহ্নের ঘুম নেমে এল, অথচ কী তীব্র ভাবে জেগে জেগে থাকলাম। জলের কাছে গিয়ে গল্প ধুয়ে আনব বলে।

তিস্তা

শয়তান

কোনো এক ধর্মগ্রন্থে পড়েছিলাম
''প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্রে শয়তান আছে''!

আমি সেই থেকে
একটা শয়তানের সাথে সহবাস করব বলে
একশো আটটা বাদ্যযন্ত্র শরীরে সাজিয়ে বসে আছি।

এসো শয়তান, আমাকে চুম্বন করো
আদর করো আমায়
লালায় লালায় মাতিয়ে তোলো উচ্চকিত সুর...

এসো, সহবাস করি
আবেগহীন... ভালোবাসাহীন...মৃত্যুহীন...

শৌভিক দে সরকার

মেজবিল

গান ও গঠনের অন্য একটি দিক আছে
স্তনের অন্য প্রান্তর, কুয়াশাচ্ছন্ন বুদবুদগুলি
পার হয়ে ভেসে ওঠে তোমার সদ্য, কাঁচা চুল
একটি বিকার স্তব্ধতার দিকে ছুটে যায়
শোলার গ্রহাণু, কুগ্রহের বাতাস
জলের খুব নীচে গাঢ় হয়ে ওঠে সন্ধ্যাবেলার যখ

কিংশুক চট্টোপাধ্যায়

খুলো না ভোরের জামা

সরল জলের কাছে দুঃখ বোলো না
খুলো না ঝিনুক-ডানা মৌরিগন্ধওলা নদী
মরা পালকের হাড়-গোড়
খুঁজো না কতটা গান কতটা তুলোর জ্বর মাপে
ধরেছ হাতের রেখা সুতোর লাটাই ঘুরিয়ে
ক্ষতি নেই; কিছুমাত্র তাতে
খুলো না ভোরের জামা, রোদ্দুরে-স্নান অজুহাতে।

বেবী সাউ

এপ্রিল

অভিযোগনামা যত দীর্ঘ হচ্ছে
গরম সকাল চাইছে ঠান্ডা কফির মগ

দূরে কুলকুল দৃশ্য নদী
ছেড়ে আসা দেউড়ির রক্তজবা গিঁট
দৃশ্যমানের নীচে
অস্বীকার রপ্ত গান পড়ে আছে

গুমোট কাটছে
লাল চুলের মেয়েরা বেরিয়ে যাচ্ছে শিকারে

কোল্ড ড্রিংকস পৌঁছানো কালো যুবকের রেখচিত্র আর
চাপে থাকা চুনী পান্না পোষ মানাচ্ছে
বিগত কর্ম-চিহ্নকে

এত্তসব শুধুমাত্র বিস্তারের বিরুদ্ধে
প্রস্তুত বিরোধের সুপ্রশস্ত দলিল

এর কোনো ঘরবাড়ি নেই
জমিজমা নেই

পার্থসারথি দে

তারপর একদিন

পা শুধু চলতে শিখেছে, চিনেছে শুধু পথকে
তাই পায়ের স্মৃতিতে কেবলই পথের ভূমিকা
কখনো সে মাটির ভিতরে খোঁজেনি শিকড়
কোটি কোটি বছর ধরে দৌড়ের দীর্ঘ ইতিহাস
পায়ের বুকের ভিতর
তার হৃদয়ে কোনো সম্পর্কের ভার নেই
সংগ্রামী অক্ষর ছাড়া কোনো পাঠ নেই

জলের উপর পা শুধুই শব্দ তোলে
দাগ রাখে না, সময়ের ব্যবধানে শব্দও
মিলিয়ে যায়, থাকে শুধু অন্ধকার

তারপর একদিন সকল বনলতা সেনদের
চেনা পথ ছেড়ে, পায়েরা অমসৃণ দেয়ালের
প্রতিটি রোমকূপে নিশ্চুপ গল্প হয়ে ওঠে
তার কোনোটা কিংবদন্তী, কোনোটা বা কান্নার রূপকথা।

পার্থজিৎ চন্দ

অসুখ

ট্রেনের জানালার ধারে বসে তুমি দেখতে পাচ্ছ বৃষ্টি হয়েছে খুব। হাওয়ায় হাওয়ায় ছেঁড়া কলাপাতা তবুও সবুজ। কী এমন জাদু এইসব ছেঁড়া পাতাদের আয়ু দেয়! তোমার বাঁচার পাশে কোথাও জাদু নেই। জাদুকর নেই। জাদুঘর নেই। তোমার স্বপ্নে ভেসে থাকে ডুবো-জাহাজের শেষ সিম্ফনি। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের আগে অসতর্কের ঘুম। সতর্ক নও তুমি। মুখোশ না নিয়ে নেমে গেছ অতলের দিকে। জলের ভেতরে পথঘাট ... নাক ফাটা হাত খসা বুকের ফলসা খসে পড়া পাথরের নারীর মূর্তি। যেন কোনও ডুবো কয়লার দেশ পার হয়ে ট্রেন ছুটেই চলেছে। বৃষ্টিতে ভেজা নুড়িগুলি জলের ভেতরে সাজানো নিশানা। জলের ভেতর দিয়ে ছুটে যাওয়া ট্রেন। দু'ধারে সাজানো দোকানপাট ... উঠে যাওয়া কলের দেওয়াল ... খালের ওপরে সাঁকো। নতুন পাগল আজ নাড়াতে এসেছে তাকে। নিপুণ তুলিতে আঁকা ছবির ভেতর থেকে যেন এখনই জাগবে আটলান্টিস। শুধু হাওয়া কম। প্রাণ ধারণের বায়ু ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। বিকেলের মতো...

সেই জলের ভেতরে কেউ ক্রমাগত বুঝিয়ে চলেছে আজ, স্বাভাবিক, খুব স্বাভাবিক ভাবে নাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। মনোবিদ সন্দেহ করা এক মনের অসুখ, আর কিছু নয়।

মনীষা মুখোপাধ্যায়

ফিরে যাওয়ার আগে

এসো মন
এইখানে আসনপিঁড়ি হয়ে বোসো।
কত ধানে কত চাল তা তো জেনেইছ এতদিনে।
আজ তবে অন্য শিক্ষা হোক।

বোঝাতে অক্ষম সব দুঃখকে গালিচা করে নাও
সংগ্রহ করে রাখা চোখের জলে কমণ্ডলু ভরো
যে-ক'টা অভিমান গুনেগেঁথে সরিয়ে রেখেছ গোপনে—
সে সব আজ ধূপদানিতে গুঁজে দাও
যতশত অপমান ছিঁড়ে দিয়েছিল তোমায়—
তাদের আজ পুষ্পপত্রে রাখো
যাবতীয় উপেক্ষায় ঘৃতাহুতি দাও
বেদি সাজাও আশাভঙ্গের আলোয়
না মেটা সাধেদের একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখো
ওদের কপালে জয়টিকা দাও,
ওরা বলির উপকরণ।

প্রস্তুতি সেরে
কুলকুণ্ডলিনীতে জাগিয়ে তোলো নিজেরই মুখ
কানে কানে শুনে নাও উদাসীনতার মন্ত্রগুপ্তি।

এসো মন,
এভাবেই
তোমায় সরে যাওয়ার পাঠ শেখাই।

পম্পা দেব

নির্মাণের মানচিত্র

প্রতিটি পূর্ণতার পাশে একটি বিচ্ছেদ—
প্রতিটি বিচ্ছেদের পাশে একটি আরম্ভ।
এইখানে বাগান,
সাধের গাছপালা,
সোনাঝুরি, শিমুল, অশ্বত্থ,
ঝুরি বেয়ে নেমে আসা স্মৃতি,
ফল কুড়োনো বৃষ্টিদিন,
সাইকেলে যুবক-যুবতী,
শীতের পিকনিক সেরে ফিরে যাওয়া মন,
খুঁজে নিলে পাওয়া যাবে উষ্ণতার ওম,
সেই সব পাখি বিকেল, কমলা দুপুর,
উৎসাহ ভরা শরীর যাপন।
হাজার নাকছাবি জ্বলা রাত,
এভাবেই ফিরে ফিরে আসে
রেডিওতে গানের আসর,
নিবিষ্ট শালিখের মতো কবিতা জীবন।

মেঘনা চট্টোপাধ্যায়

কাজরী

খেয়ালি হাওয়া বুঝি আঁচল ছুঁয়েছিল
আঁচল জুড়ে রাঙা ঝড়ের ত্রাস
আমার কূলে কূলে নেহাত ভরাডুবি
মন বলেছে আজ চৈত্রমাস

সিঁদুরে মেঘ দেখে প্রদীপ সামলেছি
শিখায় লেগে তবু বাসনা রঙ
দু'হাতে ঢাকি তবু মন মানে না কেন
অলখে বেজে চলে জলতরং

হাসছে পলাশের আগুন ধিকিধিকি
কৃষ্ণচূড়া তার দোসর সই
আমার মধুকর সপ্তডিঙা ডোবে
কে আছে কাণ্ডারী সুজন বই

ভাসাবে নাকি শুধু ডুবে ডুবেই যাবে
অতলে থই থই মরণ ডাক
তেমন হয় যদি ভেসে যেতেও পারি
জোয়ারবেলা থাক বা নাই থাক

ফিরছে ঘরমুখো মেঘ কয়েকখানা
ফিরছে ঝড়মুখো গোমড়া ঢেউ
এমনি দিনে বুঝি একলা ঘরে থাকে,
দুয়োরে খিল দেয় আজকে কেউ!

খেয়ালি হাওয়া তাই আঁচল ছুঁয়ে গেল
আঁচলে রেখে গেল প্রলয়দাগ
আমার কূলে আজ নিছক ভরাডুবি
বিপ্রতীপে রাঙা অস্তরাগ

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

ভ্রান্তিবিলাস

থতমত দিনগুলোর খুব কাছেই এক ভ্রম বাস করে
তাকে ডেকে মাঝে মাঝে কুশল আলাপ
সে শোনায় মস্ত ফানুসের পেটে ছ'মাসের নষ্ট ভ্রূণকথা
খুব মায়া দিয়ে ভাত মেখে বেড়ে রাখে পদ্মপাতায়
এত বাষ্প জমেছিল আকাশ অবধি

তবু সমস্ত বৃষ্টিঋতু জুড়ে শুধুই পিপাসা লিখেছ
হলুদ সংকেত ভেঙে কোথায় জল উঠে এল গলা অবধি
সেসব খবরে নেই, অক্ষরে নেই

জল সরে যেতে যে এলোমেলো পায়ের ছাপ
তার যাওয়া আসা নিয়ে দ্বন্দ্বের ভেতর
দু'একটা তারিখ শুধু হতবুদ্ধি লেখা হয়ে থাকে
অভ্যস্ত হয়ে ওঠার দিকে অসতর্ক উড়ে আসা ফুলকি
বাতিল স্মৃতি পোড়ায়, কাজললতা পোড়ায়
ভেবে নাও কান্না, ভেবে নাও মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

জয়দীপ মুখোপাধ্যায়

সম্প্রদান

আমোদিনী নামের নদীটি
আমার বুকের পাশ দিয়ে বয়ে যায়
এ নদীর জলে আর্সেনিক নেই
তবে ফল্গুধারার মতো খুঁড়ে খেতে হয়
নিত্যদিন পারি না

শহুরে লোকেরা এ নদীর কথা জানে
আর জানে নদী মানে বালি আর জল
আমি জানি আমোদিনী মানে
আরো কিছু কলতান কথা
অকারণ স্রোত অনাবিলতা
ইতিহাস ও সভ্যতা

আমোদিনী নামের নদীটি
বসন্তের মধুমতী সাধন অথবা
বর্ষার দ্বাদশ মল্লার
যে আমার কান টেনে বলে
সভ্যতা বেঁচে থাকে নদীর পরশে
আমার স্তনে বেঁচে থাক
তোমার সৃজনী।

শুভেন্দু দলুই

জোড়াকেঁউদির মাঠ

এখানে ধানের রং প্রবাহিণী
আঁকাবাঁকা পথ, নিজ গৃহ মুখে
ঢেউ ঢেউ বাতাস বয়, অনাবিল
ওই দোলা লাগে
ওড়ে কার একগোছা চুল
খড়ের আঁটির মতো
শুয়ে আছে কাল
আমি তারে ফেরাব না
গোচারণ মাঠ
যে ছেলে কালো, রাখাল বালক ভেবে
এখানে আকাশের রঙ ময়ূরপালক

তারককুমার পোদ্দার

স্তবক

তোমাকে পড়তে গিয়ে এক জোরালো তেষ্টা
ভুলে যাওয়া আর মনে পড়ার মাঝখানে অদ্ভুত সিঁড়ি
বিপরীত ওঠা নামার ক্ষয়াটে সময় কিছু ছাপ রাখে
কিছু থাকে উত্তাপহীন

যেখানে দাঁড়িয়ে আছ নিঃশব্দ নতভারে
তিনটে স্তবক যেন তিনদিক থেকে আসা
একটা ট্র্যাজেডি

তোমাকে পড়ার পর বাকরুদ্ধ হই
নিজেকে কেবলই দেখি
আর দেখি না কিছুই

কিশোর ঘোষ

অফিস সরিয়ে দ্যাখো

অফিস সরিয়ে দ্যাখো, একদিন এমনি বেরিয়ে পড়ো
নিঝুম নিজের দিকে, ক্লান্ত হলে
নাইট ডিউটি করা চাঁদের তীরে মাদুর পেতে
ঘুমাও আবার
ওঠো ভোর হয়ে...
মনে করো তুমি এই শহরের, নিয়তির
কেউ নও আর
নার্সিংহোম ভরে উঠুক বিষাদ-ভ্রূণে, এবং জানো
নিউ মার্কেটে আজকাল সস্তায় শিশ্ন পাওয়া যায়, তাছাড়া রেশনে
অবিকল দিগন্ত দিচ্ছে নতুন সরকার...

ধরো তবুও তুমি ভুলে গেলে না; সকালে অনাদি সূর্য খেলে
রাতে ঘুমোতে যাবার আগে
জীবনজ্যোৎস্নার দুধে
মুখ দিলে আবারও, আবার!

জিয়া হক

হয়ে ওঠা

সংগীত বাজে গৃহে ও দোকানে যেভাবে
আত্মকথা রচিত হয় দেশে।
দেশজোড়া সুরেলা সুবেশার কৃতকর্মে সাদা
সাদা সব ফেলে আসা শিশুমুখী ছবি
ফুটে ওঠা সব ফুল তাই শয্যাগত তোমাকেও
এইবার পুষ্প হতে হবে।
ফুটে উঠতে হবে বংশলতিকার পায়ে বা কপালে

প্রাঙ্গণে বয়ে যায় বালি ও বালিকা
ভেবেছ কী সাজবে সন্ধ্যায়, বাদ্যযন্ত্র নাকি
খামারবাগান?

সুপ্রিয় নাথ

হাল

আর পারছি না এ দাবদাহে
প্রতিটি বিকাল দূরে সরে যাচ্ছে তাসের আড্ডা থেকে...
প্রতিটি লিপিস্টিকে মন বসানোর ঘ্রাণ আমার কবিতায় নেই...

এভাবে মাইকে মাইকে তর্জনী তুলে উগরে দিচ্ছি বমি
নোটা বা সেফটিপিন...

সন্দীপন দাস

ফিরিয়ে দেবার গান

আমরা যারা কথা দিয়েও দিন ঢলে পড়ার পর
ঘরে ফিরতে পারিনি
যারা ঈশ্বরের কাছে অনর্গল চেয়েছি একটা প্রেম,
একটু মুখর সন্ধে কিংবা আদুরে ডাকনাম
তারা আজ তোমাকে বৃষ্টি ভিজতে দেখে
নিজেদের সময়টাকে আরো একবার ঝালিয়ে
নিতে চাইছে শহর
তুমি জানো না আমাদের শিরা-উপশিরা জুড়ে
আছে অব্যক্ত কবিতা, গুনগুন করে গেয়ে ওঠা
সূর্যাস্তের পর বেসুরো দু'এক লাইন, তোমার
জমানো অভিমান থেকে জন্ম নেওয়া জন্মান্তরের বিষ...
আমরা চাইলেই নদীকে খোলা জানলা বানিয়ে
দিতে পারি আর সেই জানলা দিয়ে রাতবেরাত
তাকিয়ে থাকতে পারি যে পথ দিয়ে ঘর ছেড়ে
বেরিয়ে গেছিলাম ইতিহাস লিখব বলে
সেই পথের দিকে ... সেই পথের দিকে যে পথ
দিয়ে তুমি বলেছিলে কোনোদিন আমরা ডানাপোড়া
পাখিরা ঘরে ফিরতে পারব না ...

আমরা যারা জীবনকে কথা দিয়ে সূর্যাস্তের পর
আজও ঘরে ফিরতে পারিনি, আজ তারা তোমার
পথে তোমার নিজের ফিরে যাওয়া দেখে নিজেদের
না পাওয়া সময়টাকে আরো একবার নিজেদের
মতন করে ফেলে যেতে চাইছে ...

পঙ্কজকুমার সরকার

পোশাকি মাছরাঙা

যারা জলের কাছাকাছি থাকে
হাসির মধ্যে পোষে মাছরাঙা
তারা আমার সরীসৃপ জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়;
মাছারাঙাটাই প্রতিদ্বন্দ্বী;
কিছুটা রঙে
কিছুটা শিকারের ঢঙে।

ওর ডানার ঈর্ষাকাতর রং
বুকপকেটের নীচে চাপা পড়ে আছে ...
শুধু, আকাশ মেঘলা ব'লে
রামধনু দেখাতে পারি না;
লুকিয়ে রাখি শিকারি নখ ...

''আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনো কালে সঞ্চয় করিনি''

আল মাহমুদ

প্রবুদ্ধসুন্দর কর

- **নৈশশিস**
- **আত্মবিষ**
- **যক্ষের প্রতিভূমিকা**

অক্ষর পাবলিকেশনস্

২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ১২
সঞ্জীব ভিলা, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা

রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

- ফেরা (কাব্যগ্রন্থ)

এবং মুশায়েরা

- মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে (কাব্যগ্রন্থ)

পত্রলেখা

- দেশের মাটি (কাব্যগ্রন্থ)

প্রতিভাস

প্রাপ্তিস্থান ঃ

দে বুক স্টোর, বইপাড়া, কলকাতা

তন্বী ও ময়ূর

নন্দদুলাল আচার্য

ময়ূর
তৃষিত ময়ূরের কলাপ দেখে আপনি কি বিস্মিত হয়েছেন তন্বী!
আসলে আমি ময়ূর নই, ভ্রাম্যমাণ এক মানবপুত্র।
তন্বী
কিন্তু আপনাকে দেখে তো ময়ূরই মনে হচ্ছে।
ময়ুর
সে আপনার ভ্রম। আপনার মতো অনেকেই এই একই ভ্রমের পথে হেঁটে চলেছেন।
তন্বী
আপনার পেখম কী সুন্দর, অনিন্দিত গ্রীবাভঙ্গি, দুই পায়ের নৃত্যচঞ্চলতা। আপনার নীল বর্ণ সুষমার সঙ্গে নীল আকাশের কী চমৎকার মিল।
ময়ূর
আকাশ? আকাশ তো আমার মতো চঞ্চল নয়; শান্ত, গম্ভীর, উদার, প্রসারিত। আর আমি? সুদূর কঙ্কন থেকে বনে-বনান্তরে শুধু অধীর এক ভ্রামণিক।
তন্বী
আপনি যখন এত ভ্রমণশীল, পরিব্রাজকের অভিজ্ঞতার কথা বলুন।
ময়ূর
অভিজ্ঞতার কথা কী বলব তন্বী, ওই যে জম্বু গাছের মগডালে বিহঙ্গটি বসে আছে, আগে কখনও এমন সুন্দর পাখি দেখেছেন?
তন্বী
অহো, কী সুন্দর পাখি : দেখে দু'চোখ যেন সার্থক হ'ল। সত্যি বলছি ময়ূর, আগে কখনো এই অপূর্ব পাখিটি দেখিনি।
ময়ূর
হতে পারে এই মাত্র প্রকৃতি তাকে সৃজন করল। এই পাখিটি আগে ছিলই না।
তন্বী
তা কি সম্ভব ময়ূর!
এই যে সন্ধ্যার মেঘ, তার নীচে প্রহেলিকময় ঝাউ গাছ, তাও কি সৃজন করল এইমাত্র পৃথিবী!
ময়ূর
অসম্ভব নয়। অসুন্দরকে সুন্দর করে তোলার সাধনায় বসুন্ধরা এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতি যাকে বর্জন করেছে, তাকে বিনাশ করছে, ভদ্রে, তার এই লীলা বিলাস, আমাদের চেতনা পরিধির বাইরে।
তন্বী
আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।
ময়ূর
চারপাশের কলহ প্রলাপ, ঈর্ষার বিষবাষ্প একদিন চলে যাবে। প্রকৃতির বনৌষধি নিরাময় করে না কি সভ্যতার ক্ষত!
তন্বী
এ আপনার অলীক কল্পনা, পথচারী!
প্রতিরোধী বস্তুকণিকার ক্ষমতা কী ভয়ংকর, আপনি জানেন না? প্রকৃতি কীই-বা করতে পারে সেই কৃষ্ণশক্তির সমীপে?
ময়ূর
পৃথিবী যে প্রাণময়ী, পৃথিবী জীবন্ত নির্দিষ্ট অরবিটে ঘোরে আর প্রাণময়ী ধরিত্রীর শক্তি যে অসীম; তুমি কি জানো না?
তন্বী
আপনার প্রলাপকথন বন্ধ করুন ভ্রামণিক।
ময়ুর
আমি সঠিক কথাই বলছি তন্বী। ধরিত্রী এক জীবন্ত সত্তা। আমাদের আদিম মানুষেরা তা জানতেন। তপোবন সভ্যতার প্রাজ্ঞ ঋষি পুরুষদেরও তা অজানা ছিল না। তাই তারা পৃথিবীকে যথেচ্ছ ভোগ না করে, সীমিত রেখেছিল তাদের চাহিদা।। ধরাকে মাতাজ্ঞানে জীবনের প্রয়োজনীয় ভৈক্ষটুকু ধরিত্রীর কাছে ভিক্ষা করত। বৃক্ষের পরিচর্যা, ক্ষেত্রভূমির পরিচর্যা, গাভীর পরিচর্যা, দীর্ঘিকাসৃজন ছিল দিনানুগ কাজ। নির্লোভ জীবনের স্রোত সারিতে অবগাহন ছিল তাদের জীবনধর্ম।
তন্বী
আর আজ?
ময়ূর
কী দেখছো, তুমি নিজেই বলো, তন্বী।
তন্বী
আজ যা মহানগর, কাল তাই হতে পারে পরিত্যক্ত জঙ্গল। জগতে কিছুই নয় শাশ্বত সত্য। ময়ূর তোমারও অজানা নয়।
ময়ূর
আমিও আনন্দ হয়ে ঘুরেছি প্রত্যন্ত গ্রামে, নগরে ও রাজদ্বারে,

আভীরের ঘরে ঘরে, শালবনে, প্রান্তরে, পাহাড়ে। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার রূপ, অন্তর্ঘাতে পাল্টে গেছে আজ।

তন্বী

পৃথিবীর মানুষেরা বুঝি শুরু থেকে এরকমই আত্মধ্বংসী, বিশুদ্ধির আর্তিহারা, জট ও জটিল?

ময়ূর

একই ধরিত্রীতে জেনো অজস্র মানব কথা।

এসো, তোমাকে শোনাই আজ স্রোতবতী নিসকোয়ালি'র কথা। মাঝে মাঝে রোগা বৃষ্টি ঝরে। সন্তত নদীর দুই উপত্যকা জুড়ে ফুলেরাও রাত্রি জাগে। অর্বাচীন ভাষায় ওরা কথা বলে, দেবদূতের মতো শৌর্যবান।

যেখানে, বসন্ত বর্ষা শিশির ঋতুর আনাগোনা। পতঙ্গের ওড়াউড়ি, বাসন্তীর ডাক, পরাগে ভ্রমরলীন—এমনই সম্পন্ন সেই আদিম পৃথিবী। আর সেই পৃথিবীর আদিম সন্তান এতদূর সুখী ছিল, বিদ্বেষ তাদের চিন্তনের থেকে বহুদূরে।

সেই সুখী মানুষের দুই দলপতি, একই গর্ভজাত দুই জন্মসহোদর কলহে জড়িয়ে পড়ল। অনুচারী দল সহ কোনও এক রাক্ষসীবেলায় হনন ছুরির মতো ধেয়ে এল দুই দিকে থেকে। খড়্গো—ভল্লে, পাথরে, পাথরে ডেকে আনল বিনাশের প্রেতসারি, নগ্ন ধ্বংসপট।

মেঘলোক থেকে নেমে বিপন্ন বিধাতা ঘুম থেকে শূন্যে তুলে ওদের স্থাপন করল নতুন ভূমিতে, যেখানে সুন্দর এক নদী। নদী তীরে কল্পবৃক্ষ; পাখিরা অচেনা সুরে গান গায়; উড়ন্ত মেঘের ফাঁকে উঁকি দেয় সবুজ পাহাড়। ঘুম থেকে উঠে ওদের বিস্ময় যেন ফুরোতে চায় না। স্মিত হাসি ছড়াল দেবতা : আজ থেকে, এই পয়স্বিনীভূমি তোমাদের দেশ; আজ থেকে সমস্ত সন্তাপ ভুলে যাও। ভুলে যাও শোক। কৌম সমাজে থেকে জীবনকে উপভোগ করো।

তন্বী

আখ্যানের এটাই কি শেষ পথচারী?

ময়ূর

না তন্বী। জেনো, শেষেরও রয়েছে শুরু। স্রষ্টার নির্দেশে দুই দলপতিদ্বয় দু'টি উপত্যকা ঘিরে, অতীত যা হয়ে যাবে কিছু কাল পরে, গড়ে তুলল নিজস্ব বসতি; সঙ্গে এল লক্ষ অনুব্রজী। নীচে নীল জলধারা, নদীর উপর দেবতা কুশলী হাতে বানালেন পাথরের সেতু। নবজায়মান ওই শান্তি সেতু ঘিরে, শান্তি এল, মৈত্রী এল গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে; দুই ভাই আলোর ঈশিত্বে কিছুটা বা ধনী হল।

তন্বী

সবই যেন স্বপ্নের অস্পষ্ট কায়া!

বলে যাও, তারপর বলো হে ময়ূর।

ময়ূর

অধীর হয়ো না তন্বী, শোনো; দু'পারের লোক ভাবল ওপারেই সব সুখ। দু'পারেই জেগে উঠল ঈর্ষার পিঙ্গল চোখ। ক্রুদ্ধ দেবতার চোখে ঘুম নেই। শূন্য থেকে তিনি সরিয়ে দিলেন আগুন। আকাশ ঢেকে দিলেন প্রগাঢ় অন্ধকারে। শপ্ত মানুষ দল প্রবল ঠান্ডায় গেল জমে। শুরু হল হেমন্তের বৃষ্টিপাত। সৃষ্টি দেবতার কাছে বিপন্ন মানুষ, বিনতিতে ভেঙে পড়ল। দ্রব হল দয়াল বিধাতা। তিনি জানতেন একটু আগুন শুধু বেঁচে আছে লু-উইট বৃদ্ধার কুটিরে। ওই প্রবীণাকে ঘিরে সদাচারের সুষমা। তাই তার ঘরে আগুন এখনো নেভেনি। সৃষ্টি কর্তা লু-উইটের কাছে আগুন চেয়ে নিলেন, পরিবর্তে ঈশ্বরের বরে লু-উইট হলেন পরমা সুন্দরী কন্যা। সারা শরীরে উচ্ছ্বসিত যৌবন। ভ্রমর কালোচুল। কপালে চূর্ণ অলক। তরুণ গণ্ডে লাবণ্যের আজ। মেঘলা শোভিত ক্ষীণকটি। সুডৌল স্তনমণ্ডলে অমরার সুষমা। সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে রূপবতী আগুন বহন করে সেতুর উপর দাঁড়ালেন। অরুণ আলোয় ভরে উঠল আকাশ। সেতুর ওপর আবার সূর্য উঠল। লোকেরাও আগুন বরণী সুন্দরী কন্যার কাছ থেকে আগুন গ্রহণ করল। ভুলে গেল কলহ বিবাদ, বিনাশের পট। শস্য শেষ প্রান্তরের ঔদাসীন্য ভুলে পরস্পরের মধ্যে ফিরে এল মৈত্রী আর গাঢ় উষ্ণতা।

তন্বী

কী মনোমুগ্ধকর আখ্যান! যেন কালপুরুষের মুখ থেকে কথা শুনছি।

ময়ূর

উত্তর-দক্ষিণের দুই দলপতির চোখ তবু লু-উইটের দিকে। দু'জনেই চাইল তাকে বিয়ে করতে। দু'জনেই বিয়ের প্রস্তাব দিল।

তন্বী

কী আশ্চর্য! তারপর?

ময়ূর

দুই প্রান্ত থেকে দু'জনের ব্যগ্র করতল ধেয়ে আসে তাঁর দিকে। শ্রাবণের দুরন্ত প্রহারে নুয়ে পড়া মালতীর মতো সিদ্ধান্ত অক্ষম। 'হা, মর্মবেদনা বলো এখন কী করি!' লু-উইট দ্বিধায়। দু'পক্ষের মধ্যে আবার কলহ। আবার জড়িয়ে পড়ল তুমুল বিবাদে। অট্টহাস্য করে উঠল সন্ত্রাসী বাতাস। কেঁপে উঠল নদী উপত্যকা। ভূমিতেও নেমে এল স্রোতের ধুরস প্রচ্ছায়া। সৃষ্টির দেবতা ক্রুদ্ধ দুই দলপতিকে বানিয়ে দিলেন দুই আগ্নেয় পর্বতে। দ্বন্দ্ব তবু থামে না ওদের। কামাবর্তে, লেলিহ ঈর্ষায়, একে অপরের দিকে ঢিল ছোড়ে, আগুন বর্ষণ করে চলে নিরন্তর। বক্ষতল ভেঙে যায় লু-উইটের। নিজের রূপের কাছে নিজেকেই অসহায় লাগে। মানুষের মধ্যে থাকাটাই এ কী বিষময়! ঈশ্বরের করাঙ্গুলি দু'পক্ষের মাঝখানে স্থাপিত করল ওই সুন্দরীতমাকে। পরিচিত হল সেন্ট মাউন্ট হেলেনা নামে। শান্তিতে ঘুমোয় সেন্ট হেলেনা। মানুষ যদি ভূমি ও প্রকৃতিকে মর্যাদা না দেয়, ঘুমন্ত সেন্ট হেলেনা আবার জেগে ওঠে শুরু করবে অগ্নিবর্ষণ। উদ্‌গীরণ করবে লাভা ও ব্যাসাল্ট।

তন্বী

একটি আখ্যান যেন জেগে ওঠা মানব সভ্যতা। একটি আখ্যান যেন, একটি ধ্বংসস্তূপ ময়ূর, ময়ুর, আদিম মানুষ, এ কথা কি আজও বিশ্বাস করে, মাউন্ট হেলেনা, জেগে উঠতে পারে?

ময়ূর

হ্যাঁ তন্বী, আদিম মানুষ আজও বিশ্বাস করে, মানুষের লোভ আর পাপ বেড়ে গেলে হেলেনা আবার জাগবে। প্রতি মুহূর্তের এই বিনাশ দেখেও কথার পৃষ্ঠে তবু থেকে যায় আরো ঢের কথার ইশারা। তবুও বিজ্ঞান, তবুও বিজ্ঞান এই মহাবিশ্বে একটি মাত্র নীলগ্রহ শনাক্ত করেছে, আমাদের প্রিয় পৃথিবী। যেখানে প্রাণ জাগরূক। সূর্যের সবথেকে কাছের যে উজ্জ্বল নক্ষত্র—আলফা সেন্টাউরি, সেই সৌর-পরিবারে প্রাণময় এমন সজল গ্রহ অশনাক্ত থেকে গেছে আজও।

তন্বী

প্রত্যাশা ও আনন্দের কথা আজ শোনালে ময়ূর। তবু ভয়? বিনাশের অন্ধকারে, আমরাও নিভে যাব একদিন। দীর্ঘ হবে দুখের প্রান্তর। খণ্ডিত আয়ুষ্কালে আমরাও অভিশপ্ত। নই!

ময়ূর

আমরা বিনাশ যাকে ভাবি, বস্তুত তা লীলা। ঈশ্বরের কল্পান্তের শুরু। বিনাশের নানা মুখ। ধাবমান পূর্বকাল থেকে ফের ভবিষ্যের শুরু। মনে রেখো প্রতিটি পতঙ্গ, কীট, লতাগুল্ম, বৃক্ষসারি, জল ও প্রস্তরখণ্ড মানুষের বন্ধু ও স্বজন। মৃত্যু আসে, ধ্বংস আসে, ধ্বংস ফিরে যায়। দিগ্‌বধূরা ফিরে আসে জীবনের, সৃজনের সীমন্তিনী রূপে। তন্বী জেনো, পৃথিবীর অজস্র নদী আর স্রোত সারি অঢেল অঢেল নুন ঢেলে দেয় সমুদ্রের অগণিত নদী মোহনায়। তাহলে তো ভয়ংকর নুনে জরে জলজ প্রাণীরা মারা যাবে। তা হলে তো সামুদ্রিক লতা-গুল্ম, শঙ্খ, কাঁকড়া কেউ আর জীবিত থাকবে না। তা হলে তো অঢেল নুনের প্রভাবে সমুদ্র শুকিয়ে যাবে কোনো একদিন। জলই জীবন। জলের বিনাশে, স্থল পৃথিবীর আয়ুষ্কাল শেষ।

তন্বী

এ কী ভয়ংকর কথা শোনালে ময়ূর!

ময়ূর

কিন্তু তা কখনো হবে না। প্রৈতি আসে আকাশের বরেণ্য ভর্গের থেকে। ধরিত্রীর অনুভবে আত্মশক্তি নিহিত যা স্নায়ুতে শিরায় স্বতঃপ্রণোদিত, সাগরের জলে তাই জন্ম নেয় অযুত অযুত ব্যাকটেরিয়া; লবণ যাদের খাদ্য। ওরা প্রতিপলে, অনুপলে খেয়ে নেয়, মিলিয়ন মিলিয়ন নুন কণা। ধরণীর সমতাকে নষ্ট করবে কারও সাধ্য নেই।

তন্বী

উৎকণ্ঠায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল, বাঁচালে ময়ূর।

ময়ূর

ভয় নেই তন্বী, পৃথিবীর উষ্ণায়ন, ব্যাধিমুক্ত হবে একদিন, পৃথিবীর অন্তঃসার, ওজন স্তরের ছিদ্র মেরামত করে নেবে কোনও একদিন। প্রকৃতির বনৌষধি যে রকম যুগে যুগে বার বার নিরাময় করে তোলে সভ্যতার ক্ষত। প্রকৃতির সৃষ্টি ঘিরে বিস্ময়ের শেষ নেই!

এসো, আমরা বরং, এই নীপবনে নৃত্য করি। শ্রী ও সম্পন্ন হোক আমাদের বসুন্ধরা মাতা। আকাশ মায়ের গর্ভে, সূর্যবীজে যার জন্ম, সেই নীল গ্রহটির মৃত্যু নেই, কোনও দিন মৃত্যু নেই, শুভা!

জয়দেব বাউরী

• ঘোমটা তোলো, শিমুল আকাশ (কাব্যগ্রন্থ)

বাংলাভাষা চেতনা সমিতি, দুর্গাপুর

● ময়ূরপঙ্খি নাও (কাব্যগ্রন্থ)

ব্রীহি প্রকাশনী

যোগাযোগ : ৮৪৩৬৯৩৫১৯৮

অমিত সাহা

ক্লোরোফিলের কান্না

(নতুন কাব্যগ্রন্থ)

চয়নিকা

যোগাযোগ : ৯৪৩৪৪৩১৩৬২

কান্তিময় ভট্টাচার্য

• কাব্যগ্রন্থ •

- শব্দে বারোমাস
- জল দাও বৃক্ষ দাও
- জন্মান্তরের কথামালা
- তোমার উপমা তুমি
- যে ছবি টুকরো হয়ে যায়
- আমার মেঘদৌড়

জলধি হালদার

• কাব্যগ্রন্থ •

ফৌজদার হাঁস মেরেছে (শিস/১৯৮১)
সত্যি মানুষ, মিথ্যে মানুষ (১৯৯২)
সম্পূর্ণ বৃক্ষের বাসনা (বসুন্ধরা/১৯৯৭)
সমুদ্রতান্ত্রিক (প্রতিশব্দ/২০০০)
বিষকরবী (উবুদশ/২০০৪)
নুড়িপাথরের শব্দ (গাঙচিল/২০০৮)
নোনাজলের কবিতা (গাঙচিল/২০১৩)

‘মার’-যুদ্ধ

রজতকান্তি সিংহচৌধুরী

[শ্রীঅশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত’-সহ বহু নাট্য ও কাব্যে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে ‘মা-র’ যুদ্ধ করেছিল বলে উল্লেখ। এই সব কাব্যময় বর্ণনার মূলাধার সুত্তনিপাতের প্রধান সুত্তে। বৌদ্ধশাস্ত্র ললিত বিস্তরের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে এই সুত্তের (সংস্কৃত) অনুবাদ বিদ্যবান। এ থেকে প্রমাণ, সুত্তটি খুব প্রাচীন।]

(সূচনায় নান্দীপাঠ, নান্দ্যন্তে সূত্রধর)

(বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধ ধ্যানমগ্ন। পটভূমিকায় ধীরগম্ভীর নান্দীরোল।)

।। নান্দী।।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।।

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেষু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।।
—মা যেমন নিজ আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ করুণা জন্মাবে।

(বুদ্ধের ডানপাশে অবতীর্ণ হয় সূত্রধর)

।। সূত্রধর।।

লোভ ও ভোগের মহামারী
বাতাসকে করে তোলে ভারী
যুগে যুগে ইমানের গ্লানি
মানুষকে দেয় হাতছানি
পণ্যবাহী উটের কাফেলা
সম্পর্ককে ভাঙে যেন ঢেলা
কেবল বাহ্যিক আড়ম্বর
কথা খালি অক্ষরডম্বর
আচারেই আবিল বিচার
দিগন্তে উঠেছে হাহাকার
ভিন্নমত-অসহিষ্ণুতার
মা-র মা-র, যাকে পাবি মার...

(নদীকূলে বোধিদ্রুমতলে পদ্মাসনে সমাসীন বুদ্ধের করুণাঘন মুখে ধীরে ধীরে আলো পড়ে। সূত্রধর বলে যায়...)

।। সূত্রধর।।

সেইখান থেকে অকস্মাৎ
নৈরঞ্জনাতীরের প্রভাত
বহু যুগ পার হয়ে আসা
পাঠক, তোমার—ভালোবাসা
সঙ্গী হোক যেখানে বুদ্ধের
মহাতপ—লক্ষ্য নির্বাণের...
শাক্যসিংহ শ্রমণ গৌতম
নরপতি নন, নরোত্তম
দুনিয়ার দুঃখের কারণ
কী উপায়ে হবে নিবারণ
অহর্নিশ তারই তপস্যায়
ধ্যানে মগ্ন ন্যগ্রোধতলায়
রাজবেশ ছেড়ে জীর্ণ-চীর
পরেছেন, প্রাসাদ-প্রাচীন
চিরে তীর্ণ নৈরঞ্জনাকূলে
ব্যক্তিগত ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে
উপবিষ্ট মন্ত্রের সাধনে
নেই ভয় শরীর পাতনে...

[বুদ্ধের মুখে আলো আরো ঘনীভূত হতে দেখা যায়। তিব্বতি গুম্ফার অনুরূপ শিঙা-করতাল-গং সহ যন্ত্রসংগীতের মৃদু মূর্ছনা।]

।। সূত্রধর।।

চাঁদের সাম্পান রাতের উপকূলে
যেমন দোলা দেয় জ্যোতির ঢেউ তুলে
তেমনি বুদ্ধের হৃদয়ে করুণার
হয়েছে উন্মেষ। হবে না অবসান সাবেকি বেদনার?

[বুদ্ধের বাম দিক থেকে ‘মা-র’ আসে। যে সময় সূত্রধরের কণ্ঠে ‘সাবেকি বেদনার’ এই শেষ শব্দদুটি উচ্চারিত হচ্ছিল, সেই মুহূর্তেই ‘মার’ তার দৃঢ় নাটকীয় পদক্ষেপে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। ‘মার’-এর পোশাক সিকিমের গুম্ফায় চিত্রিত বৌদ্ধকাহিনীর অনুরূপ—সবুজ-লাল-নীল বহুবর্ণে রঞ্জিত। তার কোমরে বীণা। বীণায় থেকে থেকে করুণ সুর। মুখশ্রী কখনো রমণীয়, কখনো ছদ্মকরুণায় মাত্রাতিরিক্ত পেলব, কখনো বীভৎস মৃত্যুমুখোশে ঢাকা ঘনকৃষ্ণ মুখে ভয়াল আরক্ত দু’চোখ]

।। সূত্রধর।।

এমন সময় এল ‘মার’
সব ছল করায়ত্ত যার
কী হল? কী হল, তারপর?

ধৈর্য রাখো বলব সত্বর...
শ্রোতাদের জানিয়ে প্রণাম
ছেড়ে যাই এ প্রসেনিয়াম।

[প্রস্থান]

[বুদ্ধ এবং মার। বুদ্ধ নৈরঞ্জনাকূলে বোধিদ্রুমতলে পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন। 'মার' বুদ্ধের বাঁদিকে। নিরঞ্জন আনন্দমূর্তির সেই জ্যোতিপ্রভ ধ্যান 'মার'-এর দর্পিত আগমনেও অটুট দেখে 'মার' কপট মায়া দেখিয়ে কথা বলতে শুরু করে।]

।। মার।।

(তাচ্ছিল্যময় ছদ্ম সহানুভূতির সুরে)
এ হে হে! হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ! শ্রমণ গৌতম!
[বুদ্ধ নীরব, ধ্যানমগ্ন। মারের কথার কোনো প্রভাব তাঁর মুখমণ্ডলে নেই। করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি তাঁর মুখে অম্লান। 'মার' তা দেখে কৌশল বদলায়। তাচ্ছিল্য ঢেকে মুখে করুণার ভান আনে। তার কাঁকাললগ্ন বীণাটি থেকে করুণ একটি ধুন তোলে—মৃত্যুমদির আবহে। বীণার তীব্র সুর ততক্ষণ চলে যতক্ষণ না বুদ্ধ চক্ষুরুন্মীলন করেন। বুদ্ধ এবার চোখ মেললেন। তাঁর সেই দৃষ্টি-চিরন্তন সুধাস্রাবী।]

।। মার।।

(গলায় এবং বীণায় অতিকরুণ সুর)

রুগ্‌ণ হলে তুমি, ওগো শ্রমণ,
মৃত্যু এল, দেখো পেছন ফিরে
হাজার ভাগে হবে জীবন শেষ
একটি ভাগ তার এখনো বেঁচে
ভালোমানুষ তুমি, জীবিত রও!
জীবিত থাকাটাই জরুরি খুব
তবে না হবে যত পুণ্যকাজ
যজ্ঞে আছে কত পুণ্যফল
ব্রহ্মচর্যেও কত না কত—
এতই এত যদি পুণ্যভার
নির্বাণের তবে কেন প্রয়াস?
অগ্নিহোত্র তো বিদ্যমান
শাক্যবংশের ভদ্রাসনে।
নির্বাণের পথ ঋজুকঠিন
শীর্ণদুর্গম ভয়ংকর!
বন্ধু ভেবে শুধু এইটুকুই
বলার কথা,ব্যস্ বলে দিলাম।

['মার' গৌতমের ঠিক বাঁ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।]

।। বুদ্ধ।।

(ধীর প্রশান্ত স্বর বীণার সরু আওয়াজকে ম্লান করে মন্দ্রসপ্তকে বাজে। রাগ দরবারী।)

বিচারহীন যারা বিলাসিতায়,
তাদের বান্ধব ওহে ও 'মার'!
এখানে কেন আসা জানতে নেই
একটুকুন বাকি আজকে আর।

।। মার।।

(তারসপ্তকে সরু স্বরে, প্রায় আনুনাসিক)

পুণ্যে রত হও, পুণ্যবান্!
পুণ্যে কত শত প্রাপ্তিযোগ
আকাশপৃথিবীতে কত না সুখ
রোধসীরেখা সুখে কম্পমান
এসব ত্যাগ করে নির্বাণের
বলো না এ কিসের আকিঞ্চন?

[একটু থেমে 'মার' বুদ্ধকে সরু চোখে লক্ষ করতে থাকে, তার কথার কোনো প্রভাব বুদ্ধের মুখভাবে পড়ল কি না দেখতে চায়। হতাশ হয়ে নতুন আবেগে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে বলে ...]

।। মার।।

পূর্ণগর্ভিণী হাজার গাভী পাবে
পূর্ণযৌবনা হাজার কন্যা
তাদের স্তনচূড়া নমিত হয় না
এবং সেইসব সঘনজঘনার
চোখে তড়িৎ, ঠোঁটে পক্কবিম্ব—
এসব ফেলে খোঁজো অশ্বডিম্ব?
বন্ধুভাবে বলি আমার কথাগুলি
রাজার ছেলে তুমি দেমাকি, একগুঁয়ে
যখন বুড়ো হবে ভাববে খাটে শুয়ে
মিষ্টি লাগে শুধু বাসি হবার পরে
গরিব বন্ধুর সুপরামর্শ!
পুণ্যে ফিরে এসো যজ্ঞে রত হও
অযুত বলি দাও পুণ্যফল নাও।
পরী ও হুরীদল মাংসসুখ দেবে
এবং গোলেমান-কোমল খিদমৎ ...

।। বুদ্ধ।।

পুণ্যে প্রয়োজন নেই আমার;
তাদের কাছে তুমি যাও বরং
যাদের পুণ্যের আকিঞ্চন
শ্রদ্ধা আছে, বীর্যও অটুট,
প্রজ্ঞা পরিণত, মনোনিবেশ
করেছি আমি নিজ আদর্শেই।
এখন তুমি কেন জপাতে চাও
বাঁচার জন্যে এ মহোপদেশ!

।। মার।।

কিছুই পারবে না তুমি হে বুদ্ধ।
'মারে'-র সঙ্গেই করবে যুদ্ধ?
এতটা ধক্ নেই তোমার এ শরীরে

অস্থিপঞ্জর রুগ্‌ণ-ভগ্ন।
নদীর বালুতট যেমন রুক্ষ
তৃষায় কাঠ হবে কপাটবক্ষ
এখনো দিন আছে বালুর খেলা ফেলে
ঝম্প দিয়ে পড়ো কোমল কালোজলে।

।। বুদ্ধ।।

শুকিয়ে নেবে এই নদীর স্রোত
হয়তো কোনোদিন কোনো বাতাস।
চিত্ত রয়ে গেছে আদর্শের
উপরে ধ্রুব, স্থির—এখন আর
রক্ত শুষে নিতে তুমি আমার
পরাঙ্‌মুখ এই বলে দিলাম।

।। মার।।

রক্ত শুষে যাবে, শরীর ক্ষীণতর
যেমন নিশাশেষে মলিন চন্দ্র...

।। বুদ্ধ।।

আমারই চেষ্টায় রক্ত শুষে যায়
মাংস ক্ষীণ হয় যদি আমার
চিত্ত সুখী হয় প্রজ্ঞা, স্মৃতি আর
সমাধি ক্রমাগত বর্ধমান।

।। মার।।

জগতে কামভোগ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার
তুমুল বৈভব, রাজার ছেলে তুমি
শুদ্ধোদন-সুত, কপিলাবস্তুর,
ক্ষাত্রধর্মের এ কী অমর্যাদা!
তরুণ বয়সেই কি ছার সন্ন্যাস!
ঈশ্বরেচ্ছার, বেদের বিধানের
চরম ব্যত্যয় মূর্তিমান তুমি,
আমার হাতে আছে দশটা ফৌজ, তারা
ধ্বংস অনায়াসে করবে তোমাকেই—

।। বুদ্ধ।।

চিত্ত কাম-ভোগ আর তো চাইছে না
লক্ষ করো তুমি শুদ্ধি এর।
তোমার সৈন্যরা? পয়লা কামভোগ,
অসন্তোষ দুই, তিনের দাগে নাম
ক্ষুধা ও তৃষ্ণার, বিষয়বাসনা সে
চারের দাগে,
পাঁচে আলস্যটি— ষষ্ঠ ভয়
সাতে কুসংশয়, আটে অহংকার,
আত্মপূজা আর লাভ ও সম্মান—
এগুলি মিলেমিশে নবম ফৌজ,
দশের দাগে আছে মিথ্যা যশোলোভ
পরের নিন্দা ও নিজের যশ—

[বুদ্ধ যতক্ষণ এই দশ বাহিনীর কথা বলছিলেন, ততক্ষণ মার নানা মারণ-উচাটন, যজ্ঞ-মন্ত্র, তুকতাক সহযোগে ফৌজগুলির দশটি রূপ আবির্ভূত করছিল। প্রত্যেকেই বিদায় নিচ্ছিল ম্লান মুখে। প্রথমে কামনা ও শেষে যশোলোভ—এক একে দশ বাহিনী বিদায় নিল।]

।। বুদ্ধ।।

এই ক্লীবের ফৌজ তবু মানব
এস্নু একে জয় করতে অক্ষম
কিন্তু সুখী হয় যে একে জয় করে
দৃঢ়প্রতিজ্ঞিত শুধু সে-জন।

।। মার।।

চারটি আশ্রম চতুর্বর্ণ
বেদের বিধি সে তো—সেটাকে ভেঙে ফেলা।
তোমার কর্ম? রাজার সন্তান
রাজ্য, গণ ফেলে এখানে কেন এলে?
বিধির যে বিধান মান্য সকলেরই
তোমার হাতে শুধু সেটার হেলাফেলা
মানীর মান-রাখো, ছাড়ো এ ছেলেখেলা
চন্দ্রাহত তুমি! কেন এ জটাজূট?
মাথার থেকে ওই মুঞ্জ তৃণ ফেলো
কারণবারি নেবে? পক্ক কুক্কুট?
পণ্য বিপণিতে ভোগ্যসম্ভার
মুখের কথাতেই মানুষ বিক্রয়।
যৌবনের রীতি অগ্রপশ্চাৎ
অবিবেচনা আর বিপদে ঝাঁপ দেওয়া
তোমাকে সাবধান করতে আসা তাই
তোমার পরাজয় কপালে লেখা, জানি।

।। বুদ্ধ।।

মুঞ্জ তৃণ আমি মাথায় ধরে আছি
এখন পরাজয় মরার চেয়ে বেশি
বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো
যদিচ হেরে যাই তোমার কাছে!
শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তোমার সেনাদলে
কত যে মিশে আছে চেনাই দায়।
যে পথে চলে যায় সাধুরা তার দায়
ওরা কি কোনোদিন জানবে আর?
দেবতা-মানবক তোমার সম্মুখে

দাঁড়াতে অপারগ সে তো জানাই।
প্রজ্ঞাবলে আমি তোমার সৈন্যকে
হারাব নিশ্চিত—লোকে যেমন ভাঙে
ছোট্ট ঢিল ছুড়ে মাটির হাঁড়ি।
আর আমি একা নই—বহু শ্রাবক
তাদের দেশে দেশে সদুপদেশ
দিতে পাঠাব আর শিষ্যদল
শোককে জয় করে মুক্তপ্রাণ
বিফল হবে 'মার'-তার শাসন।

[বুদ্ধ স্মিত মুখে নীরব হন। চোখ উন্মীলিত, দৃষ্টি করুণাঘন। মনে হয়, আবার পূর্ববৎ ধ্যানমগ্ন হবেন। মার হতাশ।]

।। মার।।

সাতটি বৎসর—সাতটি বৎসর
বুদ্ধ-পশ্চাতে বেকার ঘুরলাম
মাংসবর্ণের পাথর দেখে কাক
যেমন উড়ে বসে, অযথা ঠোকরায়
লাভের আশা নেই দেখেই অবশেষে
বিফল চলে যায়—আমিও তাই
গৌতমের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে
চলি গো চলে যাই—আজ বিদায়।

[প্রস্থান]

[প্রস্থানকালে তার কটিদেশ থেকে বীণাটি খসে পড়ে, ভেঙে যায়, আর্তরব তুলে স্তব্ধ হয়। বুদ্ধ ধ্যানমগ্ন।]

।। সূত্রধর।।

গৌতমের চোখের সম্মুখে
লুপ্ত হল মারের চেহারা
ছিন্ন বীণা কটিদেশ থেকে
খসে পড়ে আর্তধ্বনি তুলে
অবশেষে চিরস্তব্ধ হল
আত্মদীপ জ্বলে উঠল যেই
অনাবিল আলোর ইঙ্গিতে
লুপ্ত হয়ে গেল অন্ধকার
পড়ে রইল ছিন্ন বীণা আর
অবলুপ্ত হয়ে গেল মার।

[ক্ষণিক নীরবতা]

।। সূত্রধর।।

মারের ফেরারি দশ ফৌজ
আজও নাকি দশ দিকে ঘোরে
বুদ্ধের হৃদয় তাক করে
আজও নাকি বিষবাণ ছোড়ে?

(আবহসংগীতে সুরলহরী)

সমরেশ মুখোপাধ্যায় কাব্যগ্রন্থ • শামুকজন্ম (বিজল্প) • বিষণ্ণ দাবার কোর্ট (আদম) • তোমার ইঙ্গিত বুঝি (আদম) • পূর্বপুরুষের ছায়া (ছোঁয়া)	**জিৎ পাল** **পাগলের একতারা** (কাব্যগ্রন্থ) **অভিযান পাবলিশার্স**
শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী • আকাশপালক (পাঠক/২০১৪) • শিকারতত্ত্ব (আদম/২০১৫) • আড়বাঁশির ডাক (দাঁড়াবার জায়গা/২০১৬) • কাকতাড়ুয়া (পাঠক/২০১৪)	**তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়** **অদেখা বিষুবরেখা** (কাব্যগ্রন্থ) আদম

গ দ্য

বহির্বঙ্গের কবিতার বর্ণময় রংগোলি ও তার গোপন জলের দাগ

অর্ঘ্য দত্ত

‘‘তিনি যেখানে থাকেন, তাঁর চারিদিকে প্রায় কোনো বাঙালি নেই। যাঁরা আছেন তাঁরা সাহিত্যে আগ্রহী নন। ...আট দশ বছরেরও বেশি, কবিতা না শুনিয়ে, না ছাপিয়ে কেউ কি অবিচল ভাবে লিখে যেতে পারে? আমি তো অন্তত পারতাম না’’ কথাগুলো কবি জয় গোস্বামী লিখেছিলেন মুম্বাইবাসী এমন একজন কবির কবিতার বইয়ের ভূমিকায়, যিনি নিজেও একদিন লিখেছিলেন, ‘‘ভালোই তো আছি/ইঁদুরের গর্ত, মণ্ডূকের কূপ/সাবলীল শ্বাপদের মাঝখানে/হাইবারনেশন’’ (শবরী রায়)। এখানে যদিও শবরী হয়তো এক অন্যতম মৃতকল্প যাপনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তবু আমরা জানি, তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন না, কাউকে নিজের লেখা না শুনিয়েও তিনি অবিরাম লিখে যেতে পেরেছেন। এবং তিনি একা নন, এটাই পারতে হয়েছে বহির্বঙ্গের বেশিরভাগ কবিকেই। বছরের পর বছর। এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরের ছোটো শহরগুলোয়, মেট্রো-সিটিগুলো বাদ দিলে, এই অবস্থাটা ছিল আরো করুণ, মানে বাংলা কবিতা শোনানোর জন্য, ছাপানোর জন্য পাঠক পাওয়া ছিল সেখানে দুরূহতর। ছিল বলছি, কারণ উদ্ধৃতিটি লেখা হয়েছিল ছ-সাত বছর আগে। তখনও বোধ হয় রাজামুন্দ্রিবাসী কোনো অমুক বাঙালি কবির সঙ্গে তার রাজকোটবাসী তমুক বাঙালি কবি-বন্ধু বা পাঠকের ফেসবুকে বা ম্যাসেঞ্জারে কবিতা চালাচালি এত সড়গড় হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া ফেসবুকের চোখে না দেখা বন্ধুর ইনবক্সে কবিতা ছাপানো বা নিজের ফেসবুক ওয়ালে পোস্ট করে মুহূর্তে বাঁধা বন্ধুদের লাইক কমেন্ট পাওয়া এক কথা আর কবিতা লিখে তা রক্ত মাংসের ছুঁতে পারা পছন্দের বন্ধুকে মুখোমুখি বসে শোনানো, তার সঙ্গে আলোচনা করা অন্য কথা।

জানি অনেকেই বলবেন, কবিতা লেখা একার ব্যাপার, এ নিভৃতের সাধনা ইত্যাদি। ঠিক কথা। যে কোনো মায়ের গর্ভাবস্থাই তার একার, তাই বলে নতুন সন্তানকে প্রকাশ্যে আনতে কোন মা না ভালোবাসেন! এমনকী আমাদের ছেলেবেলার সেই সোনালী সময় থেকেই কফিহাউসে বা কবিতার বিখ্যাত সব ঠেকে কবিতার রাজপুত্রদের খদ্দরের পাঞ্জাবির পকেট বা শান্তিনিকেতনি ঝোলা থেকে কবিতা লেখা চিরকুট সযত্নে বের করার রূপকতা শুনে কি আমরা বড় হইনি! পশ্চিমবঙ্গের কবিদের, সে মফস্বলের হলেও, এই যে সুবিধাটুকু ছিল, বিশেষ করে ষাটের দশক থেকে লিটল ম্যাগাজিন সংস্কৃতির সূত্রপাত এবং সেই সব পত্রিকা ঘিরে কবিতা নিয়ে আড্ডা-চর্চা- আলোচনার পরিসর তৈরি হওয়া, বহির্বঙ্গের কবিদের কিন্তু সে সুযোগ সুবিধা বিশেষ ছিল না। আজও নেই। ভাতিন্ডা ক্যান্টনমেন্টের কবি ডাক্তার নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনিও স্বীকার করলেন তাঁর পরিচিত এমন কেউই আশেপাশে নেই ইচ্ছে করলে একটা কবিতা লিখে যাকে তা শোনানো যায়।

আর ঠিক তখনই মনে পড়ে যায় পুণেবাসী এক কবির কথা, যিনি লিখেছিলেন — ‘‘আগ্নেয়গিরির গর্ভে নিহিত নির্জন ইচ্ছা আছে /পাতালে আগুন জ্বলে ধিকি ধিকি টিমি আঁচে’’। তাঁকে শুধুই বহির্বঙ্গের কবি বলে পরিচয় দিলে যদিও অন্যায় হয়, তবু তাঁকেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছিল বহির্বঙ্গীয় কবির প্রান্তিক অবস্থান। শেষ বয়সে, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যখন ২০০২ সালের ২৫ জুন তাঁকে তাদের মঞ্চে কবিতা পড়ার জন্য প্রথমবার ডাকল, তখন খাসখবর, মুখোমুখির মতো বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিতে তাঁকে পরিচয় করানো হচ্ছিল বহির্বঙ্গের কবি হিসাবে। সেখানে একবারও উল্লেখ করা হল না যে তিনিই বাংলার প্রথম আধুনিক মহিলা কবি, তাঁর বাঁক ঘোরানো অবদানের কথা একবারও বলাই হল না। শেষ বয়েস পর্যন্ত কখনো পুণায় কখনো হরিয়ানার বাহাদুরগড়ে থেকে তিনি ধিকি ধিকি টিমি আঁচে জ্বলা নির্জন ইচ্ছাদের যতটা লালন করেছেন ততটা তাঁর যোগ্য মর্যাদায় প্রকাশ করতে পারেননি কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্য জগতের উপেক্ষা ও অবহেলায়।

হ্যাঁ, রাজলক্ষ্মী দেবীর কথাই বলছি। কারণ বহির্বঙ্গের কবিদের কথা বলতে গেলে আমার প্রথমেই তাঁর কথা মনে পড়ে যায়। ২০১৪-তে ‘কবিতা পরবাসে’ নামের একটি

বহির্বঙ্গের কবিদের লেখা বাংলা কবিতার সংকলন সম্পাদনা করতে গিয়েও মনে হয়েছিল যে তাঁর কবিতা দিয়েই সংকলন শুরু হওয়া উচিত। এবং তাই করেছিলাম। যদিও জানি, বহির্বঙ্গের কবি বলতে ঠিক কাদের বুঝব তা নিয়েও ধন্ধ আছে। এমনকি 'বহির্বঙ্গ' শব্দটা নিয়েও মতভেদের অন্ত নেই।

রাজলক্ষ্মী দেবীকে যে উপেক্ষা সহ্য করতে হয়েছে, শেষের দিকে তাঁকে যেভাবে বহির্বঙ্গের কবি বলেই দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, আজও কি সেই ধারা অব্যাহত? এই ইন্টারনেট-ওয়েব ম্যাগ-ফেসবুকের যুগেও? মনে হয় অবস্থার উন্নতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত অনেক নামী অনামী পত্রিকাতেই আজকাল দেখতে পাই অনেক বহির্বঙ্গের কবি-লেখকের লেখা। পাঁচ সাত বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতবর্ষের ছোটো ছোটো শহরগুলিতে ছড়িয়ে থাকা কবি লেখকদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির যোগাযোগ ঘটে যেত দৈবাৎ। গত দু'বছরে এই আন্তর্জালের সুবাদে আমি নিজে যত বহির্বঙ্গের কবি লেখকদের এবং পশ্চিমবঙ্গের মফস্বল ও বহির্বঙ্গ থেকে প্রকাশিত নামী-অনামী পত্রিকার সন্ধান পেয়েছি, তার অব্যবহিত আগের প্রায় পঁচিশ বছরের মুম্বাই বাসে তার এক-দশমাংশেরও খোঁজ পাইনি। পাওয়া সম্ভবও ছিল না। পাওয়া যেত শুধুই কলকাতা থেকে আসা কিছু জনপ্রিয় বাণিজ্যিক পত্রিকা। তাও শহরের সর্বত্র নয়। মুম্বাইতে থেকেও দীর্ঘদিন খোঁজ পাইনি মুম্বাই থেকেই প্রকাশিত বাংলা পত্রিকাগুলির। এমন ক্ষেত্রে বহির্বঙ্গের কবিদের নিজের লেখা খামে করে ওই একটি দুটি কলকাতার নামী পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পোস্ট বা কুরিয়ার করে তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে বসে থেকে থেকে নিরাশ হতে হত। এবং ওই পত্রিকাগুলির বাইরে উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করে চলা পশ্চিমবঙ্গ ও বহির্বঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকাগুলি থেকে বঞ্চিত থাকাতে অনেক কবি-লেখক ও পাঠকের সাহিত্যরুচিও গড়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিল ওই বাণিজ্যিক জনপ্রিয় পত্রিকাগুলিতে যা ছাপা হত তারই ছাঁচে। পড়ার সুযোগের অপ্রতুলতায় সাহিত্যের নানান ছোট বড় বাঁক বা ভাষাজগতের নতুন আলোর ঝলকানি তাদের চোখেই পড়ত না।

অর্থাৎ, না ছিল লেখা ভালো হলেও প্রকাশ করার সুযোগ, না ছিল শোনানোর মতো কবিতাপ্রেমী পাঠক—এমন অবস্থাতেই লিখে যেতে হত বহির্বঙ্গের বেশিরভাগ কবি লেখককে। তাঁদের লেখালেখিতে বিবর্তন ঘটার সুযোগই ছিল না। ছিল না বাহ্যিক প্রেরণা ও উদ্দীপনার কোনো ছুতো। তাঁরা লিখতেন, লিখে যেতেন শুধুমাত্র কবিতাকে ভালোবাসার এক অন্যরকম শক্তিতে। অথচ সুযোগ পেলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসে লেখালেখি করা সেই সব কবিদের কবিতা-ভুবন থেকে হয়তো আরো কিছু মায়াবী শাপলা মাথা তুলে দুলতে পারত আবহমানের বাংলা কবিতার বর্ণময় স্রোতে। সেই স্রোতে বহির্বঙ্গের কবিদের লেখা কবিতার যে ক্ষীণ ধারাটি মিশতে পেরেছে তা আরো একটু পুষ্প হতে পারলে বাংলা কবিতার ভাষায় হয়তো ফুটে উঠত ডায়াসপোরিক বাঙালির মুখের লব্জ-এর বিচিত্র কলকা। মূল স্রোতের পাঠকরাও পেত এক নতুন স্বাদ।

''পাখা উঠেছিল একটুক্ষণ/আগে ইতিহাস অন্ধকার,/ পরে কাচে ঢাকা বন্ধ দ্বার/ ... তবু পলভর পরাণপণ।'' সেদিনের রাজলক্ষ্মী দেবী থেকে শুরু করে আজকের দিল্লির পীযূষকান্তি বিশ্বাসও যখন লেখেন, ''আচানক বরফ হয়ে/গুণ ভাগ করে জেগে থাকে ভল্লার গিরিখাত'' তখন আমরা বাংলা কবিতার মুখশ্রীতে ব্রণ নয়, বরং এই সব 'পলভর', 'আচানক' শব্দগুলিকে পাই অন্য প্রদেশের ভাষা-খনি থেকে তুলে আনা এথনিক পাথরের নাকছাবির মতো। আমার জানার মধ্যে রবীন্দ্র গুহ বা দীপঙ্কর দত্তের লেখায় বহুল পরিমাণে আমরা এমন অনেক শব্দ বা শব্দবন্ধের ব্যবহার দেখতে পাই যা পশ্চিমবঙ্গবাসী কবিদের লেখায় সচরাচর পাওয়া যায় না। বাংলা অভিধানের বাইরে থাকা এসব শব্দের, প্রবাসী বাঙালির মুখের লব্জের এমন স্বাভাবিক প্রয়োগ বহির্বঙ্গের কবিদের কবিতাতেই বেশি পাওয়া যায়।

হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন এমন অনেক কবি যারা হয়তো সারাজীবন খাতা ভর্তি করে কবিতা লিখে গেছেন শুধুমাত্রই কবিতা ভালোবেসে। কলকাতার বাজারি পত্রিকা যাদের পাত্তা দেয়নি আর পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনগুলো যাদের সন্ধান পায়নি। আর দু'চার জন যারা ফি বছর বইমেলায় গিয়ে, বা জীবিকার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে বাইরে আসার আগেই ওখানকার লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে গড়ে তোলা সম্পর্কের সুবাদে দু'চারটে কবিতা এখানে ওখানে ছাপানোর ব্যবস্থা করতে পারতেন, যথেষ্ট ভালো লেখা সত্ত্বেও শুধুমাত্র দূরত্বের কারণে এবং যোগাযোগের অভাবে কলকাতার বা পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মতো প্রায় প্রতিটি পত্রিকার পৃষ্ঠায় অবিরাম উপস্থিত থেকে তারাও পাঠকদের কাছে নিজেদেরকে সমসময়ের গুরুত্বপূর্ণ কবি বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। অথচ তাদের লেখালেখি ঘাটলেই পেয়ে যাই থমকে যাওয়ার মতো অনেক পঙ্‌ক্তি, খুঁজে পাই উপড়ে আনা শিকড়ের ব্যথা, উপেক্ষার অভিমানে আঁকা মিহি আলপনা। কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের খাসতালুক থেকে বহুদূরে বসেও তাঁরা যখন লেখেন—''ডাক বাক্স শূন্য করে যে ছেলেটি দিয়ে গেল চিঠি/ তার পোষাকের খাকি খামে জমে আছে/কতকিছু না লেখা হরফ ...'' (সমরেন্দ্র বিশ্বাস—ভিলাই), ''প্রতিটি শোষণের শেষে, তার ব্যাপ্ত আর অসহ/কারুকাজের ওপর আমি আমার অদ্বিতীয়/জেহাদ রেখে আসি।' (সুকুমার চৌধুরী—নাগপুর), 'কলকাতা মনে আছে ভেংচি কাটাকাটি/মুখটা বেঁকে গেছে বয়সও দাঁড়িয়ে নেই/খোঁচা দাড়ি, চুলেও নেই নুন-মরিচ...'' (দিলীপ ফৌজদার—দিল্লি), তখন মনে হয় দূরের বাঁশি বলেই বোধ হয় এমন সুরে বাজতে পেরেছে এবং এমন সব সৎ সুর বুঝি আরো একটু মনোযোগের হকদার ছিল।

ফলে বহির্বঙ্গের কোনো কোনো শহরে, বিশেষ করে যেখানে অনেক বাঙালির বাস, যে সব শহরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাঙালিরা জীবিকার জন্য নিয়মিত মাইগ্রেট করতেন, সেখানে তারা গড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের সাহিত্য চর্চার নিজস্ব পরিসর। তাঁদের নিজস্ব পত্রিকা। কবিতাকে ঘিরে তাঁদের নিজস্ব আড্ডার

ঠেক। কিছুদিন আগেই দিল্লি বইমেলায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ওখানে আমি যেটুকু দেখলাম তাতে মনে হল দিল্লি এ ব্যাপারে বহির্বঙ্গের অন্য শহরগুলোর থেকে বেশ ক'কদম এগিয়ে। ক্রমশ জানতে পারছি মুম্বাই, নাগপুর, ভিলাই, কানপুর, পাটনা, ধানবাদ, জামশেদপুরেরও বহির্বঙ্গে বাংলা সাহিত্যচর্চায় যথেষ্ট অবদান আছে। তাছাড়া ত্রিপুরা ও বরাক সহ আসাম তো বাংলা সাহিত্যের সঞ্চয়যোগ্য ভাঁড়ারে দিয়েছে অনেক উল্লেখযোগ্য কবি ও কবিতা। আমি এত দূরে বসে সে'সবের কতটুকুই বা আর টের পেয়েছি! তবু বিভিন্ন সূত্র থেকে এরকম অনেক উদ্যোগের তথ্য এখন পাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, বিভিন্ন শহর থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে নানান বাংলা পত্রিকা! সে সব পত্রিকা ধারণ করেছিল কত কবি-স্বপ্ন, কত যে কবিতা, লেখালেখি! সবই নিশ্চয়ই বিফলে যায়নি।

চেন্নাই থেকে সাগরী, পাটনা থেকে বীজপত্র, কানপুর থেকে দূরের খেয়া, ভিলাই থেকে মধ্যবলয়, সংস্কৃতি, মাতৃভাষা, মধ্যমা, ধানবাদ থেকে শহর, বোধহয় দুর্বাসাও, নাগপুর থেকে খনন, পুণে থেকে প্রবাসী সাথী, রাউরকেল্লা থেকে শঙ্খ, ত্রিপুরা থেকে ভাষা, জলজ, ভদ্রকণ্ঠ, দ্বাদশ অক্ষর, অরণ্য, রূপান্তর, আকাশের ছাদ, পাখি সব করে রব, পূর্ব মেঘ, উত্তর মেঘ—আসাম থেকে সাহিত্য, অঙ্গীকার, গাজিয়াবাদ এবং দিল্লি থেকে উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস, আপনজন, শারদা, মরুশা, হননপর্ব, উত্তরমেরু, আত্মজা, দিল্লি হাটার্স। জামসেদপুর থেকে কালিমাটি এবং দিল্লি থেকে শূন্যকাল পাই অনলাইনে। আমি জানি এ ছাড়াও আছে আরও অগণিত পত্রিকা, আমি যাদের নামই জানতে পারিনি। এও জানি যে সব পত্রিকার নাম লিখলাম তার মধ্যে হয়তো বেশ কিছু অনেককাল আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, হয়তো কোনো কোনো পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রকাশও অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। তাও খেয়াল করুন যে ওপরের তালিকায় আমি মুম্বাইয়ের কোনো পত্রিকার উল্লেখ করিনি। করিনি কারণ গত প্রায় পঁচিশ বছর মুম্বাই বাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিরিখে একটু বিস্তারিত লিখতে চাই এখানকার বাংলা কবিতা চর্চার ইতিবৃত্ত। এই যে পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও দেশ জুড়ে এত বাংলা পত্রিকার প্রকাশ, এর পেছনে নিশ্চয়ই আছে বহির্বঙ্গের কবি লেখকদের নিজেদের সৃষ্টি প্রকাশের আর্তি, আছে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলো থেকে পাওয়া উপেক্ষার ব্যথা, আছে শিকড় থেকে দূরে থাকা মানুষের ভাষা দরদ, আছে সাহিত্য-চর্চার সজীব পরিসর তৈরি করার আগ্রহে মিছরির মধ্যের সুতোর ভূমিকায় একটি পত্রিকাকে রাখা, আছে আত্মপরিচয় নির্বাণের আকাঙ্ক্ষা ও পরভাষী অঞ্চলে সাংস্কৃতিক আত্মসংকট মোচনের আকুলতা। অথচ কাজটা আদৌ সহজ ছিল না। যেখানে, যে শহরে বাংলা ছাপানোর প্রেস নেই, বাংলা কবিতা তো দূরের কথা গদ্য পড়ারও পাঠক হাতে গোনা, যেখানে কোনো রকমে কলকাতা থেকে ছাপিয়ে নিয়ে এলেও তা বিলির কোনো মসৃণ বন্দোবস্ত করা ছিল প্রায় অসম্ভব, সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পত্রিকাগুলো ছিল আদপে একক প্রচেষ্টারই ফসল।

মুম্বাইয়ে বাংলা কবিতা লেখার ও কবিতা সংক্রান্ত পত্রিকার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে কথা হচ্ছিল 'মুখ চাই মুখ'-খ্যাত বর্ষীয়ান সাহিত্যিক মিলন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। স্মৃতি হাতড়ে তিনি জানালেন এমন একটি পত্রিকার কথা যার নাম ছিল 'কবিতা রিভিউ'। সম্পাদক ছিলেন মুম্বাই প্রবাসী কবি অমিতাভ চৌধুরী, সহকারী সম্পাদক কবি অমল ভট্টাচার্য। তাঁরা দুজনেই তখন ক'বছরের জন্য জীবিকার কারণে মুম্বাইতে ছিলেন। ১৯৯৬ সাল নাগাদ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। সে পত্রিকা মুম্বাই থেকে প্রকাশিত হলেও তার সূচিতে শঙ্খ ঘোষ, ভাস্কর চক্রবর্তী, সুনীল গাঙ্গুলী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত থেকে সুবোধ সরকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, গৌতম ঘোষ দস্তিদার, জয়দেব বসু এঁদেরই কবিতা ছিল বেশি। বহির্বঙ্গের বলতে সেই রাজলক্ষ্মী দেবীই। এই উদ্যোগের পেছনে ছিলেন সাগরময় ঘোষের ভাই, মুম্বাইয়ের বিশিষ্ট এবং উদ্যোগী বাঙালি সলিল ঘোষও। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবও পত্রিকাটিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেনি। অথচ যতদূর জানি, ওই 'কবিতা রিভিউ'-ই ছিল মুম্বাই থেকে প্রকাশিত শুধুমাত্র কবিতা ও কবিতা সংক্রান্ত গদ্যের একমাত্র পত্রিকা। মজার ব্যাপার, মিলনদার কাছে ওই পত্রিকার যে কটি সংখ্যা চোখে দেখেছি, তার সূচিপত্রে চোখ বুলিয়ে কিন্তু দেখতে পাইনি মুম্বাইয়ে বসে যে সব কবি তখন লিখছেন তাদের কারো কবিতা। জানি না, এর পেছনেও ভালো কবিতা মানেই কলকাতার নামী কবিদের লেখা কবিতা এমন কোনো উন্নাসিক ধারণাই কাজ করেছিল কি না। অথচ এই মুম্বাই শহরে বসেই তখন কিন্তু বাংলা কবিতা লিখছিলেন বেশ কিছু তরুণ কবি... মন্দিরা পাল, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, গোপীনাথ কর্মকার, সঞ্জিতা সেন, অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়, সৌমিত্র সেনগুপ্ত। রুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী রায়, মধুছন্দা মিত্র ঘোষ ও অরিন্দম চক্রবর্তী অবশ্য মুম্বাইয়ে বাস শুরু করেছেন তার অনেক পরে। তবে মুম্বাই থেকে বিভিন্ন সময়ে অন্য আরো কিছু সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বা এখনো হচ্ছে। এবং সে সব পত্রিকার পেছনে হয়তো ছিল উপেক্ষিতার অভিমান ও জেদ। হয়তো ছিল, কবি কমলেশ পালের শব্দ ধার নিয়েই বলছি, —"প্রান্তিকের মনে বড় আশা/বাংলার সন্ততি যেন বলে বাংলাভাষা।" এবং শুধুমাত্র এই অদম্য জেদ ও ভালোবাসার জোরেই গত পঁচিশ বছর ধরে প্রায় একা হাতে মুম্বাইয়ের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য পত্রিকা 'প্রবাসে নিজভাষে' প্রকাশ করে চলেছেন সম্পাদক মন্দিরা পাল। 'প্রবাসে নিজভাষে' ছাড়াও মুম্বাই থেকে দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত হয়েছে 'মায়ামেঘ', 'বোম্বাই-বিচিত্রা', 'চিরন্তন'। গত চার বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে 'লোনা হাওয়া'। এবছর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ওয়েব ম্যাগ 'বম্বে Duck'।

এগুলোর কোনোটাই শুধুমাত্র কবিতার পত্রিকা নয়। মলাটে এদের পরিচয় লেখা হয় 'সাহিত্য পত্রিকা' অথবা 'সাহিত্য সংস্কৃতির বাংলা ত্রৈমাসিক পত্রিকা'। অধিকাংশ পত্রিকার পেছনেই যদিও রয়েছেন কোনো এক বা একাধিক কবিই, তবু এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। পত্রিকাকে সবধরনের পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার কথাও তাদের মাথায় রাখতে হয়েছে। 'বঙ্গীয় মৈত্রী সমিতি, মুম্বাই' বরং শুধু কবিতার জন্য, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে

ভারতীয়দের লেখা বাংলা কবিতার সংকলন 'কবিতা পরবাসে' প্রকাশ করেছে, আমি যার সম্পাদনা করলাম ২০১৫ এবং ২০১৬ পরপর দু'বছর। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসে লেখা বাংলা কবিতা নাড়াচাড়া করার, মুম্বাইতে বসে কবিতা যাপনের এমন সুযোগ কোনোদিন পাবো আগে ভাবিনি। দেখেছিলাম, কবিতার ভাষায় স্থানিকতার ছোঁয়ায়, লোকাল লজে, বিশ্বজোড়া বিচিত্র প্রেক্ষিতের চরিত্রে কী ভাবে দু'মলাটের মধ্যে আঁকা হয়ে যায় বাংলা অক্ষরের দিগন্ত বিস্তৃত রামধনু।

যদিও মুম্বাইয়ের কান্দিভিলিতেই অনেক বছর ধরে আছেন হাংরি-খ্যাত শ্রীমলয় রায়চৌধুরী, তবু বহির্বঙ্গের প্রান্তিকতাকে তিনি নিজের শক্তিতেই ডিঙিয়ে যেতে পেরেছেন, রাজলক্ষ্মী দেবী যা পেরে ওঠেননি। রাজলক্ষ্মী দেবীর কবিতায়, বিশেষ করে তার পুণে বাসকালীন লেখায়, যেভাবে বহিরবঙ্গীয় শব্দ বা শব্দ-বন্ধ খুঁজে পাই, মলয় রায়চৌধুরীর এখনকার কবিতায় বোধহয় সে ভাবে তাঁর মুম্বাইবাসের প্রভাব পাই না। যাপন ও মনন দুয়েই তিনি প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক। মুম্বাইয়ে নিয়মিত যারা কবিতা লেখেন তাদের কবিতায় আমরা অনেক সময়েই পেয়ে যাই এ আজব শহরের মুখশ্রী, ফিসফিসানি ও আঙুলের ছাপ। 'চলমানে জ্যমে অটো ব্রেক কষলে/ধোঁয়া ধোঁয়া—মানুষের পা, অস্থিরতা।/অবাঙালি কবির শব্দ ভাণ্ডার এফোঁড়, ওফোঁড়—/ভালোবাসা—এই মহানগরী, এই কোলাহল,/বদবুদার উদ্দাম হাওয়া। (মন্দিরা পাল), 'ক্রিকের অনতিদূরে জমে ওঠে মানুষের উৎসব ক্রমশ/অন্ধকার সমুদ্রের জল থেকে রোদের আঙ্গুটি তুলে নেয়... (সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়), অথবা 'ফুল নিয়ে দাঁড়িয়েছে যে ছেলেটি তার কোনও টিউলিপ জ্ঞান নেই। পঁচিশকা দশ জানে, রং তাশা এবং কাটিং। খঞ্জ সিগনাল ও মিঠি নদীটির ধারে আঁধার ঘনাল।/আমাদের কান্তাবাই। কাছা, গুটকা, থেকে থেকে অই গ, অই গ।" (অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়)— এমন সব পঙক্তি পড়তে পড়তে আমরা এ শহরের হৃদস্পন্দন ছুঁয়ে নিই। ছোঁয়া যায়। শুধু মুম্বাই নয়, একইভাবে বিদর্ভকেও ছুঁতে পারি যখন নাগপুরে বসে সুকুমার চৌধুরী লেখেন, ''চমৎকার যুবতীর ঝকঝকে ত্বকে/নেচে ওঠে বিদর্ভের ধূর্ত হ্যালোজেন। এখন লু মাস।'' বহির্বঙ্গের কবিদের পৃথক ভাষাবৃত্তে বাস, পৃথক ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, তাদের আলাদা আলাদা জীবন অভ্যাস তাদের কবিতায় ফুটিয়ে তোলে স্বাভাবিক বৈচিত্র্য। তাদের কবিতার নিজস্বতা, আলাদা হয়ে ওঠার উপাদান তাদের যাপনের স্বাভাবিক নির্যাস, তা এতটুকুও আরোপিত নয়।

কবিতা আশ্রম যে তাদের এত সাধের, এত পরিশ্রমের পাতায় বহির্বঙ্গের কবিদের অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখেনি, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বসে লেখা বাঙলা কবিতাকে ভালোবেসে আসন পেতে দিয়েছে, তাতে যেমন তার নামটির যাথার্থ্য প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বহির্বঙ্গের কবিদের পশ্চিমবঙ্গের ভালো পত্রিকার সম্পাদকের কাছে গুরুত্ব না পাওয়ার, পাত্তা না পাওয়ার যে ক্রনিক বেদনা কিছুটা হলেও তার উপশম হয়েছে। কবিতা আশ্রমের উঠোনে নকশাদার কবিতা রংগোলি আঁকা হোক মেঘালয় থেকে মুম্বাই, কাশ্মীর থেকে কেরালাবাসী এবং দেশের বাইরেরও সারা পৃথিবীর বাঙালির জিভস্ব বাংলায়।

'ছোঁয়া'র গ্রন্থে মননশীলতার ছোঁয়া!

সংগ্রহ করুন...

সঙ্গী করুন ভাল বই...

শ্রেষ্ঠ কবিতা ৫০

মলয় গোস্বামী

কবিতা সংগ্রহ ১

কবিতা সংগ্রহ ২

নির্মল হালদার

ছোঁয়া প্রকাশন

।। সম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকার জন্য যোগাযোগ করুন।।

যোগাযোগ : ৯৪৭৪১৫৩৪৪১

বীরভূমের অনালোকিত কবিচতুষ্টয়

তৈমুর খান

এই লেখাটির উৎস বীরভূম জেলার কয়েকজন সম্পন্ন কবির কয়েকটি লুপ্তপ্রায় কাব্যগ্রন্থ এবং 'অয়োময়' (২০১৫) পত্রিকা ও ব্যক্তিগত জীবনে কবিদের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্কের টান। অধিকাংশ কবিরাই তাঁদের সৃষ্টিকর্ম থেকে দূরে সরে গেছেন চিরদিনের মতো। শুধু দু'জনই জীবিত আছেন এবং এখনো তাঁরা নিজেদের সচল রেখেছেন। তবে এঁদের কোনও একজনকেও বাংলার কবিতা পাঠক চেনেন কিনা জানি না, সারাজীবন কবিতা লিখলেও কখনো প্রকাশ করার তাগিদ উপলব্ধি করেননি। নিজের লেখাটি ছাপানোর বা অন্য কোথাও পাঠানোর কথাও ভাবেননি। শুধু আমরা কাছের কয়জনই জানতাম তাঁদের। প্রচারবিমুখ কবিরা আড়ালে থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। এঁরা হলেন—সত্যসাধন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩২- ২০০৮), মাস্টার বনঅলি (১৯৪২-২০১২), অশোককুমার সাহা (১৯৪৩) এবং লিয়াকত আলি (১৯৫২)। প্রায় ছাত্রজীবন থেকেই নানা সময়ে এঁদের পরিচয় পাই। আলাপ থেকে সম্পর্ক এবং মানসিক সংযোগও গড়ে ওঠে।

এক

সত্যসাধন চট্টোপাধ্যায় ১৯৩২ সালে বীরভূম জেলার কাবিলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামপুরহাট হাইস্কুল এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি ও ইংরেজি সাহিত্যে এম এ পাশ করে শিক্ষক হিসেবেই যোগদান করেন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বীরভূমের লাল মাটির রুক্ষ প্রান্তর শ্যামপাহাড়িতে এটি অবস্থিত ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ নামে। এখানেই তাঁর কবিজীবনের শূন্যদর্শনের নিঃসঙ্গ অভিমান জেগে ওঠে। ১৯৯৭ সালে অবসর গ্রহণের পর 'ডানা' নামে একক প্রচেষ্টায় একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। সেখানেই প্রতিফলিত হয় তাঁর সৃষ্টির নানা স্বাক্ষর। মালার্মে, র‍্যাবো, কাম্যু, টেনিসন প্রমুখ পাশ্চাত্য কবিদের কবিতা নিয়ে তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তেমনি জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর প্রিয় কবি। তাঁর লেখা কবিতার মধ্যে সেইসব কবিরই প্রভাব দেখতে পেতাম। নির্মোহ দৃষ্টিতে খোলা আকাশের দিকে চেয়ে থাকতেন। মানুষের ভিড়ে বা কোনও অনুষ্ঠানে সচরাচর তিনি যেতেন না। নিজের লেখা পড়েও শোনাতেন না। জোর করলে হয়তো দু'একটা পড়তেন। প্রায় কয়েকশো কবিতা লিখলেও কখনো বইপ্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। জীবনের শেষদিকে ২০০৭ সালে স্থানীয় প্রকাশনী 'কাঞ্চিদেশে'র উদ্যোগে 'শূন্যতার দরজা' নামে একমাত্র কাব্যটি প্রকাশিত হয়। প্রায় ৩২টি কবিতা আছে এতে। কোনও কবিতারই নামকরণ করেননি। আজীবন শূন্যতার ভেতর দিয়েই কবির নির্মোহ যাত্রা—এই কাব্যটিতেই তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'শূন্যতার দরজা' যেন সৃষ্টির স্তব্ধতা বা নীরবতার ভেতরই আমাদের অনবরত ধাবিত করে। সেখানে Emptiness এবং nothingness-রই প্রয়োগ ঘটেছে বারবার। আমেরিকান দার্শনিক তথা লেখক Wayne Dyer (১৯৪০-২০১৫) একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—"Everything that's created comes out of silence. Your thoughts emerge from the nothingness of silence. Your words come out of this void. Your very essence emerged from emptiness. All creativity requires some stillness." সমসাময়িক কবি সত্যসাধন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যেও এই ভাবনা জারিত হতে দেখি। কবি লেখেন—

''অন্তহীন এই সৃজন শুধু শূন্যতার অলাতচক্র
ভ্রান্তিময় মায়া?
সংশয়ের গূঢ়পাতাল সত্তা জুড়ে ফেলছে
এক গভীর থেকে গভীরতর ছায়া
এখন শুধু সর্বব্যাপী অপরিচয়
আঁধার গাঢ়তম
হে নির্বাক মহাপাতাল
হে সৃজনের অন্ধকার
হে অস্তিত্ব ভ্রান্তিময়
নমঃ নমঃ নমঃ''

অন্ধকার আর ভ্রান্তিময় অস্তিত্বযাপনের শূন্যযাত্রায় ব্যর্থ ও নিঃসঙ্গতাকেই কবি বারবার খুঁজে পেয়েছেন। জীবন মোহের অনুষঙ্গ মাত্র। তাই বেঁচে থাকাও অর্থহীন। অশরীরী শূন্যতার ছায়া সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে। শূন্য সমাকলনের গর্ভে শুধু ধ্রুবকেরই জন্ম হয়। সে ধ্রুবক অনড়, নিথর। অস্তিত্ব শূন্যতাতেই বিলীন হয়ে যায়। চৈতন্য শূন্যতারই ধ্রুবক। সুতরাং সবই যখন nothingness এবং emptiness দ্বারা নির্ণীত, সেখানে

জীবনের অর্থই বা কী থাকতে পারে? অন্য একটি কবিতায় কবি লেখেন—

''জীবনের মানে আমি খুঁজি না আর
কী হবে সে মানে জেনে?
বরং অনেক ভালো না জানার।
বুকের গভীরে এই নিহিত আঁধার
কী হবে জ্ঞানের দেশলাই কাঠি জ্বেলে?''

এই অন্ধকার যেন চৈতন্যদহনেরও যা মৃত্যুরই নামান্তর। সংশয়বাদী কবিকে বারবার পীড়িত করেছে। বাইরের জগৎ সম্পর্কেও নিস্পৃহ হয়েছেন। সাংসারিক জীবনেও মিশতে চাননি। বাস্তবিক বৈভবে নিজেকে ডোবাতে চাননি। উঁকি মারতে চাননি প্রকৃতির রোমান্টিক হাতছানিতেও—

''এই ঘরটায় মোটে একটা জানালা
আমার ভালো লাগে না, ভালো লাগে না''

বিষাদের অন্ধকারে আত্মজীবী এই কবি জীবনানন্দ দাশের মতোই যুগযন্ত্রণা থেকে পলায়নবাদকেই গ্রহণ করেছেন। ষাট-সত্তর দশক থেকে কলম ধরলেও কখনো উচ্চকিত হননি। 'চোখের তারায় ক্লান্তি এবং বিষাদ লেগে' গেছে কবিরও। আর নিজের দিকেই নিজেই তাকিয়ে থেকেছেন। যা দেখেছেন, যা শুনেছেন, যা করেছেন সবই emptiness-র সাবলীল প্রকাশ। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। ছায়ারা অন্ধকারে হাঁটছে। কবি বেঁচে থাকার অর্থহীনতা টের পাচ্ছেন। টি এস এলিয়টের ফাঁপা মানুষের মতো হয়ে গেছেন।

এই কবির কথা হয়তো আগামী প্রজন্ম জানবে না। কিন্তু তাঁর ছাত্ররা এখনো কেউ কেউ স্মরণ করতে পারে—মানুষটি কতটা বিচ্ছিন্নতার দূরত্বে বসবাস করেছেন। আত্মমগ্ন পথে একাকী হেঁটেছেন। ধূসর পৃথিবীর রণ-রক্ত-সফলতা তাঁকে এক বিন্দুও স্পর্শ করতে পারেনি। শুধু একটি 'না-বলা কথার বেদনা নিয়ে' চলে গেছেন এই পৃথিবী থেকে।

দুই

বীরভূম জেলার উত্তরের প্রান্তিক গ্রাম খানপুরে ১৯৪২ সালের কোনও এক সময়ে জন্মেছিলেন মাস্টার বনঅলি ওরফে অলি আহাদ ফোরকান। 'মাস্টার বনঅলি' এই নামটি দিয়েছিলেন সাহিত্যিক 'বনফুল' অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বনফুল ছিলেন কবির তরুণ বয়সের বন্ধু। নানা চিঠিপত্র আদানপ্রদান হত তাঁর সাথে। 'অয়োময়' (২০১৫) পত্রিকাটি মাস্টার বনঅলিকে নিয়ে যে সংখ্যাটি করে সেখানেই এসব তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। বনঅলি প্রথম জীবনে জমিদারের সন্তান ছিলেন। সত্তর দশকে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য নিয়ে এম এ-ও পাশ করেন। সারাজীবন কোনও চাকুরি করেননি। গ্রাম ছেড়ে শহরমুখীও হননি। পোস্টকার্ডে কবিতা লিখে, ছবি এঁকে বন্ধুদের পাঠাতেন। তবে একসময় কাফেলা, নতুন গতি, ঝংকার, কাঞ্চিদেশ, বীরভূম প্রান্তিক, চরৈবেতি, ময়ূরাক্ষী, আবার এসেছি ফিরে পত্রপত্রিকায় খুব লিখেছেন। সে সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট সখ্যতা ছিল। চিঠিপত্রে দেখা যায় সত্যজিৎ রায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আবুল বাশার, আবদুল আজীজ আল্- আমান, বনফুল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ—তাঁর খুব কাছের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। বীরভূমের দুইজন সাহিত্যিক আবদুর রাকিব ও কবিরুল ইসলাম ছিলেন তাঁরই সমসাময়িক। দু'জনের সঙ্গেই তাঁর গভীর হৃদ্যতা ছিল। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে নব্বই দশকের শুরুতেই আমার সঙ্গেও গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখনি বুঝতে পারি, জমিদারি আর নেই। অভাবের দারুণ এক অসহায়তা তাঁকে গ্রাস করেছে। জীবিত অবস্থায় কোনও কাব্য প্রকাশ করে যেতে পারেননি। কাব্যপ্রকাশের কথা বললেই বলতেন, 'অভাবের সংসারে বই ছাপানো বিলাসিতা মাত্র!' শুনে চুপ করে গেছি। গলার ক্যান্সারে মারা যাওয়াও একপ্রকার অভাবের কারণেই।

মাস্টার বনঅলির বহু কবিতা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। তাছাড়া তিনি প্রচুর চিঠি লিখে গেছেন। সেসব চিঠিতেও কবিতা লিখে পাঠাতেন। ষাট সত্তর দশকের কবিদের মতো তাঁর কবিতা নয়। এক ধরনের অন্তরের আকুতিতে জীবনের সহজিয়া উপলব্ধিকে নিসর্গের কল্পলোকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কবিতা নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশ কোথায়? জীবনে সুস্থিরতা নেই, রহস্যময় এক ভাঙনের তীব্র স্রোতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। অহম্ ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেছে। কবিতা তাই নিভৃতির আলো আর বন্দনার একান্ত নির্বেদ মন্ত্র। কখনো তা স্বয়ংক্রিয়তার আলো-ছায়ার অন্তর্মুখী বিন্যাস। আত্মপ্রচার বা যশ-খ্যাতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারলে তবেই নিজের মতো কবিতা লেখা সম্ভব। সম্পাদকের বরাত দেওয়া কবিতা নয়, বনআলি নিজের মতো নিজের জন্যই কবিতা লিখে গেছেন। কোনওদিন প্রত্যাশী হয়ে কলকাতামুখী হতে চাননি। বাংলা কবিতার বহুপ্রজ সন্তান-সন্ততি আজ যে সংসার পেতেছে, বহু সংঘ পরিবার, কমিটি তৈরি করেছে তাঁরা হয়তো কোনওদিনই মাস্টার বনঅলির নাম শুনবে না। গ্রাম্যজীবনের ধূসর আড়ালে বিস্মৃতির চির অন্ধকারে হয়তো তলিয়ে যাবে, তবু একটি সময়ের নিরীক্ষায় যে ঢেউ উঠেছিল, যে শব্দচাষি একদিন আত্মপ্রত্যয় জাগাতে চেয়েছিলেন অব্যর্থভাবেই তা মুদ্রিত এবং কথিত হয়ে থাকবে।

'ভোরে' নামে একটি কবিতায় বনঅলি লিখলেন—

''আকাশের নীল রঙ দেখে
যারা সমুদ্র দেখতে এল,
তাদের বলল, সেই মাছেদের কথা
যাদের মূর্তিতে মেয়ে মানুষের মুখ''

'ঐ তো' নামে আর একটি কবিতায় লিখলেন—

''ঐ তো তোমার চোখ কলমের ঠোঁটে,
ঐ তো সে গভীরতা কালিময় দেহে—
বেঁচে ছিল একদিন মৃত কেউ এখানে;
পাথরের চাঁই নেড়ে কত কথা বলি—
কারো যে বনের আঙুল স্মৃতিবিজড়িত,
কারো ঠোঁটে চামচের উৎকর্ষ ছিল!''

বর্ণময় এক রহস্যের ভেতর প্রবৃত্তিময় এক রূপান্তরের প্রাণধর্ম জেগে ওঠে তাঁর প্রতিটি কবিতায়। বস্তুত নতুন রূপ পায় যা আজকের কবিতায় লক্ষ করা যায়। 'সে—ঘোমটায়' নামে একটি দীর্ঘ কবিতায় কবি লিখেছেন—

''সে—নাকি এখন পর্দায় দাঁড়িয়ে,
ফুলের গন্ধে মাতাল পাখিদের ডাক
শোনে?
যেন প্রহর গুনে গুনে
ওই হাত ঘড়ির মতো পরিক্রমা করে!"

ক্রিয়া তখন বিক্রিয়ায় প্রবেশ করে। 'বুনো হাঁসের কাঁখে কলসি', 'দেহের ঘামফুলের গন্ধ', 'প্রজাপতি পাখনায় জলাশয়' প্রভৃতি চিত্রকল্পগুলি অলৌকিক মৃদু জাদুবাস্তবতায় আমাদের বোধাতীত করে। মনের কথা, মায়ার কথা, অনুভবের কথা, নিজের কথা এভাবেই তাঁর কবিতায় লেখা হয়েছে।

তিন

ভালোবাসার কবি অশোককুমার সাহা (১৯৪৩) বীরভূমের মল্লারপুরে বসবাস করেন। মল্লারপুর হাইস্কুল, রামপুরহাট কলেজ এবং বঙ্গবাসী কলেজেও তিনি পড়াশুনা করেছেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে সাম্মানিক স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অসমাপ্ত রেখেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তরের চাকুরিতে প্রবেশ করেন। ১৯৭১ সালে পিতৃ বিয়োগ এবং ১৯৯০ সালে অকালে স্ত্রীবিয়োগ তাঁর তারুণ্যকে অনেকটা ধূসর করে দেয়। দু'টি নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি শোকবিহ্বল হয়ে পড়েন। সেই থেকেই কবিতাকে আশ্রয় করে বাঁচতে চান। কবিতাই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের ও মনের ভাষা। ঐশ্বরিক মন্ত্রের স্তবস্তুতি। কবিতাতেই তিনি খুঁজতে থাকেন তাঁর প্রিয় নারীর মুখ। একান্ত কথোপকথন কবিতাতেই চলতে থাকে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলেও আজও তিনি একা কবিতাকে আঁকড়ে আছেন। একাধিক বইও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু প্রচারের আলোয় আসতে চাননি। সম্প্রতি সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে তাঁর বাছাই একশো কবিতাও প্রকাশিত হয়েছে, এমনকী কাব্যসমগ্রও। তবু কোথাও কোনও দৈনিকে তাঁকে নিয়ে একটা লাইনও লেখা হয়নি। আশ্চর্যভাবে উপেক্ষিত এই কবি পাঠকের উদাসীনতায় আবিষ্কৃত হননি। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলির নাম হল—সারারাত গোলাপ (১৯৭৪), ভালোবাসার আয়নায় (১৯৯১), নিস্তরঙ্গ জলের ভেতর (২০০২), সামনে এক জানালা আকাশ (২০০৪), চেতনার বিমূর্ত বাগানে (২০০৬), জলের মলাটে (২০০৮), একা ঘরে এক ঘর কথা (২০১০), বলা যায় তবে সবটুকু নয় (২০১১), হলুদ বসন্তের তৃষ্ণা (২০১২) প্রভৃতি। সমস্ত কাব্যের কবিতাগুলিতেই কবিহৃদয়ের শোক ও শূন্যতার হাহাকার গভীরভাবে ছায়া ফেলেছে। নারীও ঈশ্বর হয়ে উঠেছে, তেমনি প্রকৃতির যাবতীয় কানাকানিতেই ফুটে উঠেছে তাঁর অকালপ্রয়াতা স্ত্রীর মুখ। 'জীবনে বসন্ত আসে, বসন্ত যায়—তবু তৃষ্ণা থেকে যায় বাসনার ঘ্রাণে।' এই দর্শনেই কবি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। কবিতাগুলিতে বৈষ্ণবীয়- বাউলের সহজিয়া তত্ত্বটি যেমন সহজে লক্ষণীয় তেমনি রবীন্দ্রনাথের আত্মদর্শনের প্রজ্ঞাটিও ভাবসম্মেলনের বা মিস্টিসিজমের ছায়াপাতে উজ্জীবিত। কবিতার জটিল পরীক্ষা- নিরীক্ষায় তিনি যাননি। হৃদয় ও আবেগকেই প্রতিপালন করেছেন। নাম-যশের ঊর্ধ্বে আত্মস্থিত শূন্যতার তাগিদ থেকেই তাঁর এই যাত্রা। জীবনের রূপান্তর খুঁজতে খুঁজতে কবি প্রবহমান হয়ে ওঠেন—

''আমি প্রতিদিনই আরও একটা
ভোরের অপেক্ষা নিয়ে থাকি,
প্রতিটি ভোরই আমাকে হাত ধরে
কবিতা লেখায়—
রং বদলাতে বদলাতে কখন যেন সে
নিজেই রমণীয় নারীর মতো
কবিতা হয়ে যায়,
জীবনের গান হয়ে ভিতরে ভিতরে
শঙ্খ বাজায়!"

'ভোরের অপেক্ষা নিয়ে' এভাবেই কবির পথ চলা। যে ভালোবাসা গার্হস্থ্যজীবন থেকে আধ্যাত্মিক, স্বপ্ন থেকে আত্মোৎসর্গ পর্যন্ত ব্যাপ্তি রচনা করে—সেই ভালোবাসারই পথিক অশোক কুমার সাহা। বিখ্যাত লেখক ম্যাক্সমুলারের কথায় বলা যায়—"A flower can not blossom without Sunshine, and man can not live without love." (Max Muller). সূর্য ছাড়া যেমন ফুল ফোটে না, ভালোবাসা ছাড়া একজন মানুষও বাঁচতে পারে না। অশোক সাহা সেরকমই মানুষ। প্রেমের স্পর্শে তিনি জীবনের মহিমা উপলব্ধি করেন। 'নিস্তরঙ্গ জলের ভেতর' শুনতে পান পদধ্বনি—

''যে ঘরের অন্দরমহল তোমার
অমল হাতের স্পর্শে
পাহাড়ী ঝরনার মতো কথা বলে।"

এই কথা প্রেমিকের কানেই পৌঁছয়। প্রেমিকও সাধক হয়ে যান। দীর্ঘ তপস্যা চলতে থাকে কবিতাযাপনে। তখন লিখতে পারেন—

''বস্তুত, কবিতায় এখন আমার
ঘরবাড়ি,
কবিতাকে ভালোবেসে ঘর বেঁধে আছি।'

এই ঘর তো পৃথিবীময়। Love is world যেমন, তেমনি Love is wordsও। কেননা সেখানে তো হৃদয়েরই কথা থাকে। প্রিন্সেস ডায়ানা বলেছেন—"Only do what your heart tells you." তখন তো বস্তু আর বস্তু থাকে না। অশোককুমার সাহাও লিখেছেন—

''চৌকাঠ পেরিয়ে রোদ্দুর
ওই রোদ্দুরে বসন্তমেঘ
চুল শুকায়।"

মেটাফোরের আলোক পড়ে আবার কখনো তা মেটাফিজিক্স্ হয়ে যায়। রোদ্দুরের চৌকাঠ পেরোনো এবং বসন্তমেঘের চুল শুকানোতে এই ধর্মই ফুটে ওঠে। সর্বময়তার বোধে উদ্দীপিত হয় প্রেমের জগৎ। কবিতাও ভিন্নতার আশ্রয় পায়। ষাট-সত্তর

দশকের অনালোকিত কবি হলেও অশোককুমার নির্বেদ জীবনের স্বয়ংক্রিয় অভিমুখে পৌঁছাতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতা মোহের স্তর অতিক্রম করে নির্মোহ হতে পেরেছে। তেমনি ঘরকেও পৃথিবীর অঙ্গনে এনে বসিয়েছেন। ব্যক্তিকে করেছেন আবহমান প্রেমিক।

চার

উদাসীন আত্মভোলা কবিটির নাম লিয়াকত আলি (১৯৫২)। বীরভূম জেলার বাতাসপুর গ্রামে কবির জন্ম। থানার নাম কাঁখড়াতলা। ১৯৮৫ সাল থেকেই কবির লেখালেখি শুরু। প্রথাগত শিক্ষাতেও তেমন অগ্রসর হননি। তাঁর প্রথম কবিতা 'তার চিঠি' এবং প্রথম গদ্য 'বাউল ও বিদেশিনী' 'সাপ্তাহিক চণ্ডীদাসে' প্রকাশিত হয়। 'অন্য এক' ও 'অচিনপাখি' নামে দু'টি পত্রিকাও বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেন। তবে দু'টি করে সংখ্যা বেরিয়ে তা বন্ধ হয়ে যায়। কবির বেশ কয়েকটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে—'ঘাম অশ্রু রক্ত', 'অচিন পাখি', 'ঝর্নাজল অশ্রুই তো', 'ধূলিকণা জোনাকি' এবং 'কাব্যসমগ্র'। বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে মূলত কবিতাই লেখেন কবি। পীর-ফকিরের সঙ্গে ও আউল-বাউল নিয়েই সময় কাটান। ইচ্ছে হলে কলম ধরেন। জীবন-যাপনের মধ্যেও সুফী বাউলের প্রভাব স্পষ্ট। আত্মতত্ত্ব নিয়ে, কখনো দেহতত্ত্ব নিয়ে, কখনো সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে ভাবেন। সজীব রোদে পরাবাস্তবতাকে আলোকিত হতে দেখেন। যার মধ্যে সৃষ্টি রোদ ও জলের উপাদানে, আকাশ ও মাটির মর্মে গেঁথে আছে। চেতনার আদি স্তরে কবির অনুভূতি সেই প্রাগৈতিহাসিক কালকেই নির্ণয় করতে চায়। উদ্ভিদ, পাথর, মীন, পাখি, আকাশ ও সৃষ্টি সমূহের সকল বিস্ময়ে কবি নিজেকে বিস্তৃত হতে দেখেন। এ এক অসাধারণ বোধি, যেখানে পার্থিব আলোর বাইরেও এক অন্যতর আলো আছে; সভ্যতার ভেতরেও যে আরও মরমিয়া সভ্যতার ঠিকানা আছে; শব্দের বাচ্যার্থে সেসব ধরা যায় না। কবির কলমে উঠে আসে—

''আনন্দসাগরে নিয়ে চলো। শাস্ত্রছুট চাঁদের
হে বিপ্লবিনী, মরমিয়া গান গাও।
প্রেমের মুখাবয়ব মুখে, মেঘে মেঘে চুল।
মর্ত্যনৃত্যে ভাবের ভূষণ।
বাঁশির উপলব্ধিতে, একান্তই বাঁশের ভারতীয় বাঁশি—
জগৎ ঠোঁটে বেজে ওঠে।''

বিশ্বচৈতন্যের সৃষ্টিচৈতন্যের অনন্তপরিধির ভেতর কবি নিয়ে যেতে চান। শব্দাবলিও নতুনভাবে উচ্চারিত, ব্যবহৃত হয়। যেমন—মরমিনী, সঙ্গমশব্দ, নিসর্গতট, পথতত্ত্ব, উপাসনা অধর, পড়শিঘ্রাণ, আরশিফল প্রভৃতি। উচ্চারণে কোনও বাউল সাধককেই মনে পড়ায়। অলীক আস্বাদ তখনই নেমে আসে। নিজেকে ফিরে পান কবি। রুমি এবং মজনু শাহর মতো দেশাত্মবোধ থেকে জগৎবোধ, ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিহীন ঐশীলোকে। 'আমি'ময় বিশ্ব তখনই 'তুমি' ও আমি হয়ে যায়। কবিতার চিত্রকল্পগুলি অতিচেতনায় একটা নিজস্বতা অর্জন করে। কখনো পোস্টমডার্ন বলেও মনে হয়। আবার কখনো ছায়াবাদের নিরন্তর অভিক্ষেপ। মশারির কুয়াশার ভেতর পাখি ওড়া থেকে গানের মৈথুন অবধি, অথবা, কোমরে ঝোলানো কালপুরুষের ছুরি সবকিছুই মেটাফোরের প্রয়োগ ঘটেছে। আর একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

''পাখির বেদনাকে দেখি, আর দেখি
চাঁদের খালে উকুনের অন্ধকার।''

পাখির বেদনাকে দেখা, চাঁদের খালে উকুনের অন্ধকার স্বাভাবিক ব্যবহার নয়। জীবনের বুদবুদকুঁড়ের ভিতর রূপান্ধ অশ্রুরস কবির অন্তরস্থিত বোধেরই প্রকাশ। লোহার থাবায় পাথরের স্তন জড়িয়ে ধরাতেও সভ্যতার ছায়াবাদপ্রকট হয়ে ওঠে। সময় ও জীবনের ধ্বংস ও স্ল্যাং বারবার উঠে আসে তাঁর কবিতায়। মাটির রজে লাঙলের বীর্য ছড়ানো নয়, জোয়ালের ডিম ছড়ানোও সভ্যতা কবির কথায় 'চিরমূর্খ চাষা'। গিলবার্ট কে চেস্টারটন কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, "All slang is Metaphor, and all Metaphor is poetry." কথারই সার্থক উদাহরণ হল লিয়াকত আলির কবিতা। সময়, আত্মদর্শন, শিল্প এবং পোস্টমডার্ন ভাবনা সবই মিশে গেছে। শব্দ ব্যবহারের আলাদা এক মাধুর্যও এনে দিতে পেরেছেন। তাঁর ভিন্নধারার কবিতা পাঠকের কাছে হয়তো ততটা সমাদৃত হবে না, কিন্তু বাংলা সাহিত্য এক নতুন দিশা পাবে।

বিভাস রায়চৌধুরী

দশম কাব্যগ্রন্থ

বীজধান সংগ্রহ

সংবেদ

ঢাকা, বাংলাদেশ

কিছু কপি কলেজ স্ট্রিটে
'ছোঁয়া'র ঘরে পাওয়া যাচ্ছে

বই পড়ুন

বই পড়ান

সুজন ভট্টাচার্য

ঝুমুরের কথকতা

অভিমন্যু মাহাত

'বাঘমুন্ডির পাহাড়ে কার ছেইলা কান্দে হে... আইস ছেইলা কোলে লিব বড় দয়া লাগে হে...।' দয়াভরা পুরুলিয়া। গানভরা পুরুলিয়ার বাতাস... মাঠ প্রান্তর। এখানে গান আমদানি করতে হয় না। ঘরে ঘরে এখানে গীতের 'চাষ' হয়। দারিদ্র্য আছে, আছে জীবন সংগ্রাম। তবু খেত-গোঠ-বন-ডুংরি পাহাড়ে কাজ করতে করতে, আদি অনন্তকাল ধরে ঝুমুর গানে মজে আছে পুরুলিয়ার আপামর জনজীবন। অন্ধকারের বুক চিরে, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এক আলোকিত অমৃতমেলায় পৌঁছানোর অভিযাত্রা মানভুইঞা লোকদের। আজীবন 'আঁকড়ে' থাকে ঝুমুরের অনন্ত সুর, লয়, তাল, ছন্দ।

ঝুমুর গানে কী জাদু আছে... কী ভাব আছে... সে তো রসিকই জানে। ঝুমুর সম্রাট সলাবত মাহাত ঝুমুর গানকে এই অভিধাই দিয়েছিলেন। শীত কি বসন্ত, খরা হোক বা তপ্ত গ্রীষ্ম বা ঝর ঝর বরিষণ বর্ষা... মন উচাটন হয়ে উঠলেই পুরুল্যার আবালবৃদ্ধবনিতা গেয়ে উঠেন ঝুমুর গান। গীত গাওয়ার সময় লিপিবদ্ধ কথা অনেকেই গান না। তাৎক্ষণিক রচিত গান উদাত্ত কণ্ঠে ঝুমুর হাঁকান। শিল্পীদের অকল্পনীয় দক্ষতা থাকে, চলাফেরা কথা বলার মধ্যেই 'গান বেঁধে' গেয়ে উঠেন। ঝুমুরের জনপ্রিয়তা একারণেই বেশি। আট থেকে আশি বছর বয়সী প্রায় সকলেই এই গান গায়। এবং সর্বদা। দুঃখ, সুখ, আনন্দ, উল্লাস, সামাজিক সংস্কার, আচার সব বিষয়ের গান রয়েছে ঝুমুরে। মুখে মুখে ফেরে এই গান। আজ ঝুমুর গান জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত মুহূর্তে। এই লোকগান বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সমাদৃত।

ঝুমুর গান শুরুর ইতিবৃত্তটা কেউ বলার সাহস পাননি। কিভাবে ঝুমুর গানের উৎপত্তি, তাও বলতে চাননি কেউ। মুদ্রিত অক্ষরে এর ইতিহাসও মেলে না। ছোটনাগপুর অঞ্চলে মানভূমবাসীদের যখন থেকে বসবাস, ঠিক তখন থেকেই এই গানের উৎপত্তি বলে অনেক লোকসংস্কৃতিবিদের অভিমত। একদা এই গান ছিল অন্ত্যজ আদিবাসী মানুষের সুখ দুঃখের বহিঃপ্রকাশের সংগীত। রাজদরবারে সমাদৃত করেন ভবপ্রীতানন্দ ওঝা। তিনি কাশীপুর রাজার দরবারে ঝুমুর গেয়ে যথেষ্ট সম্মাননা পেয়েছিলেন। তিনি একে একে রচনা করেন উচ্চমার্গের দরবারি ঝুমুর। ভবপ্রীতানন্দকে অনেকেই 'ঝুমুর গুরু' বলেও আখ্যায়িত করেন। তাঁর সময়কালেই অখু কর্মকারের নামটিও উঠে আসে। তিনিও একজন প্রবাদপ্রতিম ঝুমুর রচয়িতা।

বাংলার চৈতন্যদেবের প্রভাব আসে মানভূম অঞ্চলেও। আর তারপরেই লোকজীবন নিয়ে ঝুমুর গানে প্রভাব আসে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের। রাধা কৃষ্ণের প্রেম আর বাউল তত্ত্ব ঢুকে পড়ে লোকায়ত ঝুমুর গানে। প্রায় ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে এই প্রভাব ছিল। স্বাধীনোত্তর কাল পর্যন্ত তার প্রভাব বিরাজ করেছে। তবে রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে রচিত ঝুমুর এক সময় জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও পরবর্তীকালে ম্লান হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ঝুমুরে একঘেয়েমি চলে আসে। ভাটা পড়ে ঝুমুর গানে।

বিপ্লবটা আনেন সুনীল মাহাত, সৃষ্টিধর মাহাত, কৃত্তিবাস কর্মকারেরা। গানে 'কঠিন' শব্দ বর্জন করে কথ্য ভাষায় গান রচনা করলেন তাঁরা। লোকজীবনের টানা পোড়েন, দুঃখ যন্ত্রণা, বিরহ হয়ে উঠে গানের বিষয়বস্তু। নদী, অরণ্যের প্রতি প্রেমও উঠে আসে ঝুমুর গানে। 'পাত তুলি নিতি নিতি ... ঝুড়ি ঝাঁটি দাঁতন কাঠি... আজ কেন্যে বাবুই করে মানা গো ... উয়াদের বন নাই ছিল জানা...।' এই গানকে পুরুলিয়ার জাতীয় সংগীত বলেও অনেকেই ভূষিত করেছেন। পরে সময়ের আবর্তনের সঙ্গে ঝুমুর গানের বিষয় আরও বিস্তৃত হয়েছে। মোবাইলের 'মিসড কল' পঙ্‌ক্তিও এখন গানের লিপিতে ঢুকে পড়েছে।

ঝুমুর সম্রাট সলাবত মাহাত স্বশিক্ষিত একজন ঝুমুর শিল্পী। তিনি গত বছর প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর জীবনে ঝুমুর গান কিভাবে এল তার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমার বাবা অসুস্থ (জ্বর) হলে ঝুমুর গান গাইত। খাটে শুয়ে শুয়ে অবিরত গান গেয়ে চলতেন। ছোটবেলা থেকেই বাবার গান শুনতাম। আট নয় বছর বয়স থেকেই আমি হাঁকাতাম ঝুমুর। বাবার কোলে চেপে গাঁয়ের কুলহিতে ছৌ নাচ দেখতে যেতাম। আমাকে ঝুমুর গান গাইতে বললে, একটাই শর্তে গাইতাম, তা হল বাবার কোলে চেপে গাইব। 'ভুঁয়ে' দাঁড়িয়ে নয়।' ঝুমুরের বিভাজন প্রসঙ্গে প্রবাদপ্রতিম শিল্পী সলাবতবাবু বলেছিলেন, 'ঝুমুর প্রধানত দুই প্রকারের। লৌকিক এবং লোকায়ত। লোকায়তের বিষয় ভাবনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে।' লোকায়তের মধ্যেই দরবারি রাগ রয়েছে। দরবারিতে সাংকেতিক বিরহ রয়েছে। সাংকেতিক পরিভাষায় ওই ঝুমুর উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।

ঝুমুর শিল্পী কৃত্তিবাস কর্মকার একদা জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিলেন। তিনিও প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সহজ সরল মনকে ছুঁয়ে যাওয়ার গান এখনও সমানভাবে জনপ্রিয়। 'টিপিক টিপিক জলে... আমি পৈড়ে গেলি গো... অ তকে ভাইল্যে

ভাইল্যে...।' কৃত্তিবাসবাবু চেষ্টা করেছিলেন গ্রাম্য জীবনের যন্ত্রণা, প্রেম-বিরহের কথা তুলে ধরতে। তিনি সাফল্যও পেয়েছিলেন। এখনও নাচনি নাচের আসরে কৃত্তিবাসের ঝুমুরের অনুরোধ আসে অধিক।

ঝুমুর শিল্পী কিরীটি মাহাতরও খ্যাতি তুঙ্গে রয়েছে। আমজনতা থেকে বুদ্ধিজীবী মহল তাঁর ঝুমুর গানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর মতে, মানভুমের কোনও সংস্কৃতিই ঝুমুর গান ব্যতীত হবে না। ছৌ থেকে নাচনি সব কিছুই ঝুমুর গানকে নিয়েই। ঝুমুরের রসে যিনি মজেন, তিনি আর কোনও সংগীতে মন দিতে পারবেন না। ঝুমুর এতটাই রসমধুর। রুখা সুখা পুরুল্যায় দারিদ্র্যের যন্ত্রণা রয়েছে। কিন্তু তবু রয়েছে রসেভরা ঝুমুরের প্লাবন। যা বঙ্গ বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রাস করতে এলেও বেঁচে থাকবে। 'কুলহির মুড়ায় তাঁতি ঘর... কাপড় বুনে ছরছর... তাঁতির সুতায় জুড়ব হামার মন গো ... পিরিত হবেক আঁচলের কদম...'। এই গান থাকবেই, থাকবে।

'পিঁদাড়ে পলাশের বন' গানটি বঙ্গজীবনে সবচেয়ে জনপ্রিয়। গায়ক শিলাজিৎ গেয়ে বিখ্যাত করেছেন গানটিকে। তবে তাঁর উচ্চারণে ত্রুটি ছিল। বিকৃতও করেছেন। সেই বিকৃত উচ্চারণ আরও বেশি বিকৃত হয়ে পড়ছে দিন দিন, যখন বাংলাভাষী অন্যান্যরা ওই গান গাইছেন। যা ঝুমুর গানের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক। এই গানটির রচয়িতা সুনীল মাহাত। তিনিও বিকৃত উচ্চারণে এই গানটি শুনে লজ্জায় মুখ ঢাকেন।

ঝুমুরেও 'দূষণ' ঢুকে পড়ছে। লঘু অর্থাৎ অশ্লীল কথা গানে ব্যবহার করা হচ্ছে। যা ঝুমুরের কৌলিন্যকে নষ্ট করছে। মহিলা ও তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ এই গানে বিমুখ হচ্ছেন। এক শ্রেণির 'অসাধু' ঝুমুর রচয়িতা গানে দূষণ ঘটাচ্ছেন। যাঁরা অশ্লীল গান রচনা করছেন তাঁরা অসাধু দুষ্ট চক্র। ঝুমুরকে কালিমালিপ্ত করতে এসেছেন। ঝাড়খণ্ডি ও হিন্দি গানের নকল করে ঝুমুর রচনা করছেন। গানের মধ্যে আনছেন অশ্লীল বিষয়। ওই সব অসাধু রচয়িতা ও শিল্পীদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে আমাদের। নইলে ঝুমুরের জনপ্রিয়তায় একদিন 'ভাটা' পড়তে পারে। তবে অনেকে আশাবাদী, ঝুমুরের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। আগে এক শ্রেণির মানুষ অর্থাৎ তথাকথিত 'ভদ্রসমাজ' এই গানকে অচ্ছুৎ করেছেন। ঝুমুরের কাব্যিক গুণে আজ সকলের কাছে সমাদৃত। গানে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঝুমুর গান এখন সরকারি অনুষ্ঠানেও গাওয়া হয়। আগে যেটা অকল্পনীয় ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ ঝুমুর গান শুনে আপ্লুত হচ্ছেন।

ঝুমুর গান কেন্দ্রিক পাঁচটি নাচ রয়েছে মানভূমে। একটি ঝুমুর গান গাওয়ার পর শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। ওই পাঁচটি নাচ হল ডাঁইড়, বুলবুলি, ঘোড়া, কাঠি ও ঘেরা নাচ। এদের মধ্যে ডাঁইড় নাচ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কাঠি ও ঘেরা নাচ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। টিকে রয়েছে বুলবুলি, ঘোড়া ও ডাঁইড়। বুলবুলি নাচের দলও আর বিশেষ একটা দেখা যায় না। ডাঁইড় নাচ বর্তমানে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। একদা ডাঁইড় নাচের প্রতিযোগিতা হত। 'প্রবেশ মূল্য' নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত রাতভর। কোনও কোনও প্রতিযোগিতায় ১৫০টিরও বেশি দল অংশগ্রহণ করত। প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া দলকে দেওয়া হত সাইকেল, ঘড়ি, মোটর বাইক পর্যন্ত। কিম্বা থাকত ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি। ডাঁইড় নাচের ওই প্রতিযোগিতা বিলুপ্তির পথে। এখন ডাঁইড় নাচ পার্টি এক একটি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন গ্রামে। ভোলানাথ মাহাতর ডাঁইড় নাচ পার্টির সবচেয়ে বেশি খ্যাতি। রামকৃষ্ণ মাহাত বা বিহারীলাল মাহাতর ডাঁইড় নাচ পার্টিও সকলের কাছে সমাদৃত। ভোলানাথের নাচ দেখতে পিল পিল করে আখড়ায় ছুটে লোক।

'দাঁড়া নঅ সঙ্গেই যাব হে... এক খিলি পান দুজনে খাব হে...'। লোকজীবনের হাসি কান্না, সমস্যা, সমাজ ও শোষণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছবি দিয়ে লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডারকে আজও সমৃদ্ধ করে চলেছেন মানভূমের মানুষ। মানুষকে সমাজবদ্ধ হতে যেমন জীবিকা, ভাষা তাকে সাহায্য করেছে ঠিক তেমনই তার গলার স্বর, ধ্বনি, নানা ছন্দ, তাল, রস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই সংস্কৃতি সমাজকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে। পুরুলিয়ার ন্যায় রাজ্যের আর কোনও জেলায় লোকসংস্কৃতির এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার নেই। লোকসংস্কৃতির এখানে হাজার শাখা প্রশাখা। সরকারের উচিত পুরুলিয়ার সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া। একাধিক প্রকল্পের পরিকল্পনা করা। তবেই বেঁচে থাকবে পুরুলিয়ার ঝুমুর।

রণবীর দত্ত

কাব্যগ্রন্থ

- স্বাক্ষর
- আলেকজান্ডারের রক্তপাত
- দেবস্মিতা, ঝাউয়ের জানলায়
- গাছেদের ঘরবাড়ি
- বনবাস কথা
- পাহাড়গ্রামের বাড়ি (প্রকাশিতব্য)

অমিত কুমার বিশ্বাস

- রাত্রির হৃদয়ে এখন নীল শুঁয়োপোকা
- আইরিনদের চিলেকোঠায় বুলডোজার ভাঙছে জোছনা রং
- উঠোন ভর্তি চড়ুই খুঁটে খাচ্ছে অন্ধ বুলেট দানা

গৌতম চৌধুরী

পিঁপড়া সংগীত

১লা ঢেউ

দ্বীপান্তর দীর্ঘতম ডানা আঃ কী স্নান
চিকন বালি তানপুরার রোদ রৌশনারা

চোরা কুঠুরি ঘুমের বন্দিশ ঘুড়ি উড়ছে
গ্রন্থ মূক চোরাই বিদ্যুৎ অলবিদা না

লোককাহিনি হে ম্লান খরগোশ তরঙ্গিত
বাহিরানার চারু মুখোশগুলি অশনিপাত

আছে, আছে সে নিদ্রা-অভিভূত করঞ্জলি
পাথরে দাগ জলাশয় চূর্ণ আহির ভোর

ক্ষণজন্ম প্রকৃত জলকণা বিম্বিসার
অনম্বর পুরব বায়ু বহে দিগন্তিকা

২রা ঢেউ

কিমিতিজ্ঞান পঙ্গু ইমারত দিঘল গজ
কান্না নাই অরণ্য সফর করাতকল

ঢের নমুনা বিক্রিয়া বিশেষণ সভাকণিকা
কথোপকথা মর্মরপিণ্ড শুকনো খড়

হা চাঁদমারি পাথার ঝরা দিন শঙ্খচূড়
ধান ভানতে কোলাহলের চুপি তেপান্তর

শিবের গীত ডাগর দুটি ভাই যে-ধ্রুবপদ
পাতা ঝরছে করুণাসম্ভব সন্তানেরা

অফুরন্ত পিঁপড়া সংগীত ধারণাবৃত
মাহ ভাদর বাজে বিসর্জন রক্তস্রাব

৩রা ঢেউ

স্খলিত বিষ ভাষার চোরাটান অগ্নিশিলা
চিড়িয়াখানা দরোজা জানালায় ডাকটিকিট

ধাইছে ব্যাধ প্রকৃত পলাতক নিরঞ্জন
দড়ি, বালতি পুনরাবৃত ছায়া চন্দ্রাতুর

চিরবিলোপ ঘষা কাচের পট রঙের পোঁচ
থরথরায় লম্বা রাজত্ব ডাইনোসর

সম্পর্ক ফিতাবিহীন ফাঁস এক্সরশ্মি
বীতকুসুম মন্ত্রপাঠ একা অসমাপিকা

পূর্বাভাস বাতাসে অপরাধ সোনার ডিম
কাঠুরে মন তন্দ্রা শারীরিক খোয়াব ধ্বজা

৪ঠা ঢেউ

শীতলপাটি চিহ্ন চাকা চাকা ঘুম নরক
চিতপবন মন কি মন খোঁজে ভাষান্তর

লোনালহর জন্মান্ধ ডানা কুয়াশাপথ
ভিক্ষা নামে করুণাময় মা'র ঝরা খোলস

জেলপাঁচিল স্তূপ স্তূপ হৃদয় সাদা নিশান
তুরগযান সেতুর ভেঙে পড়া ছবি ও গান

মেঘভাসান পাকদণ্ডী পথ শ্বাসঝলক
আয়নাচুপ রহস্যের চূড়া পাতালসই

ক্ষমাহীনতা অশ্রু জমে হিম উষ্ণ ঝোরা
আলোজাফরি মাটিতে বাণমুখ অন্ধ ঠোঁট

৫ম ঢেউ

সিন্ধুবেলা দৃশ্যের লহমা রঙিন ফোঁটা
রুদ্ধ দম স্থিরজল স্তম্ভ মাছপুরাণ

চিতলমৃগ সমূহ প্রতারণা আত্মলোপ
সে তস্কর ইন্দুনিভাননী শারদ তৃণ

আঁচল ওড়ে নিছক বিভ্রম নিরুদ্যান
মূর্তি, মন মহা ধুরন্ধর শূন্যে পূজা

শ্লেষে-আশ্লেষে মৃত্যুশিহরন মাংসে? মনে?
কীলক-লতা ছিন্ন দেহভাগ নকশিকাঁথা

অঘোরনট চির-অদর্শন বাতাসে ঘ্রাণ
শূন্যে লাফ অশ্বারোহী স্থির চিত্রবৎ

৬ই ঢেউ

আগুন কাঁপে বনহরিণী নাচে জলভ্রমিতে
মহাশহর আতত কারবালা খুনপিপাসা

তন্দ্রাতুর কাগজকারখানা আরণ্যক
শামুকপ্রাণ স্বপ্নদোষে বাঁচা শুল্কভ্রম

সে কতদূর নগরকীর্তন ধমনীস্রোত
অভিজ্ঞতা অপার মরুভূমি হলুদ হাড়

বধির চোখ গভীর জলরাশি হঠাৎ মাছ
শালমহল ক্লান্ত আলোথাম পথশ্রমিক

বাতাসঘ্রাণ অলস দিকলতা ভিনরাগিণী
মুগ্ধবোধ পাখির ছেঁড়া ডানা প্লুতনিশান

৭ই ঢেউ

পাঁজরে সিঁড়ি শ্রেষ্ঠ অংশে কে ভরা দেওয়াল
হংসগ্রীবা আলোর ডাকনাম আলতো স্মৃতি

অনুদ্ধার পাথুরে শীতঘুম কাজললতা
ঘুরনপথ আত্মমুগ্ধতা ঝরা প্রসূন

মৃদুঝলক দূরের উদ্দেশ ঘুণাক্ষর
সময়দাগ শূন্য তহবিল অবান্তর

বালুকাবাহ হৃদয় তসরুফ পুণ্যবান
প্রেরকহীন একলা পথিকতা কালান্তক

ক্রম-আগত রোমশ মূর্ছনা শ্রমিক জং
এল না সখা স্তম্ভে বধিরতা পাঠোদ্ধার

৮ই ঢেউ

অসম দাঁত তীব্র কাঁটাঝোপ সূর্য ডোবে
হাজার রোজ ঠান্ডা শৈবাল আয়ুকাছিম

ছবি লোপাট ভূগর্ভের ঘর পূর্ণ শ্বাস
রে মঞ্জরি জনমানবহীন শ্রুতিজলদ

অচিন মেঘ খনিজ আহাজারি নিশিনিবাস
ফটিক জল কী হয় কোথা থেকে স্তবক ছেদ

চলার দাগ শূন্যে বালিঘড়ি লোহিত ফোঁটা
প্রাচীন খাঁচা সাগুরে হাওয়াঢেউ মায়াপালক

দরোজাহীন তেপান্তরে গাঁথা ময়দানব
হা প্রতীক্ষা অমোঘ তরবারি ঝরনাজল

সন্মাত্রানন্দ

রচয়িত্রী-কে

আমরা আলোচনা করি তোমার রচনার নানাদিক, কী হতে পারত এবং কী হতে পারে। বিশ্লেষণ করি, কীসব এলিমেন্ট থেকে তুমি এমন লিখেছ কপাল জুড়ে আমাদের। এইসব আলোচনা থেকে তৈরি হয় আমাদের টেক্সট-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহিত্য আর সমাজবিদ্যার ডায়ালগ। সব শেষে একটা হাহাকার অবশিষ্ট থাকে ক্রান্তিবেলার ল্যাম্পপোস্টের আলো ও অন্ধকারের তলায়। হে অগাধযৌবনা! তোমার স্বয়ম্ভর রচনা তোমার মুখ ঢেকে রেখেছে সিল্কের স্কার্ফের মতো, যাকে সরানো যায় না কোনোমতে। শুধু চম্পক অঙ্গুলি দেখি আলোর ছুঁচে হেমসেলাই করে চলেছে ব্রহ্মাণ্ডের আকাশরুমাল; তারার অক্ষরে লিখে রাখছে আমাদের প্রেম, অপ্রেম, বিষাদ ও আপ্তির স্থিরতাবিরহিত মহাকাব্য...

সেই সব আগুনঘোড়াগুলি

সূর্যের বাগান থেকে উজ্জ্বল হলুদ যত কলাবতী ফুল
হিলিয়াম জিহ্বায় নীলাব্জ শূন্যতাকে চেটেপুটে খায়,
এই অপ্রাকৃত সঙ্গমের ফলে জন্ম নেয় অশ্ব হয়গ্রীব
মুখে তাদের উচ্ছ্বলিত ফেনা, খুরে বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ.
নীলাকাশ বেয়ে যেতে যেতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে
কেশর ঘষতে ঘষতে তারা নেমে আসে নদীপুকুর বনঝোপভরা
এই হেমন্তের অপরাহ্ণে সোনালী গমখেতের ভিতর,
ঘাটে পা ডুবিয়ে বসে আছে যেসব ভূমিজ যুবক যুবতী
তাদের নগ্ন মেরুদণ্ড বেয়ে তেজস্বান এই সব অশ্বস্ফুরৎ
মিশে যায় মজ্জায়—কামে, প্রেমে আরক্তসুন্দর।

সপ্তমী

তখন সবই কৃষ্ণ ছিল, প্রৌঢ় এখন পলিত চুল
ভাবছ নেশায় পারঙ্গমা? মুক্তলতা ধরছে আঙুল।

অনেক দেশের সীমান্তনীল দীর্ঘশ্বাসে শিহর জাগে
বলেছিলাম, 'আবার এসো', প্রতিবারই যাবার আগে।
প্রতিমা কই? প্রতিমা নেই। ঘটে ঘটেই সেই প্রমিতি।
অভিধাতেই আড়াল তোলা অভিধেয়ের শিল্পরীতি।
তীর্থবারি অনেক নদীর অনেক নারীর চোখের জলে
স্নান সেরে নাও, গা মুছে নাও জীর্ণ জীবন এ বল্কলে।
হয়ত কিছু বুকের ভিতর রেখে গেলাম খুব গোপনে,
হয়ত কিছু রয়েছে খাদ তোমার আমার রসায়নে।
আয়ুধ তোমার অমোঘ তবু ঝাপসাকুহক এ আয়নাটি
ঘুমের ঘোরে তন্দ্রাজাগর সোনার কাঠি রূপার কাঠি।

কবন্ধকথা

পুকুরের ঢেউ ভেঙে ঘাট দিয়ে একা উঠে এসে
চম্পকবীথিকা বেয়ে মধ্যরাত্রে একটি মানুষ
বন্ধ দরোজার সামনে দাঁড়ায়। কিছু বলতে চায়। তার মাথা
সে ফেলে এসেছে রাবার জঙ্গলের মধ্যে, মুণ্ডহীন ধড়
পুকুরের ভেজা জলে শীতে সামান্য কাঁপে।
পঁয়ত্রিশ বছর হল, শির স্কন্ধচ্যুত। ত্রিপুরার বিগত আশির দাঙ্গায়
ঘাড় থেকে মাথা নামিয়েছিল হ্যাঁৎ করে কে বা কাহারা।
হয়ত তাদের চিনি, হয়ত তাদের চেনাতে এখন আর আগ্রহী
নয়
সেই কবন্ধপুরুষ। আমার দরোজার সামনে, আমার জানালার
নীচে
শুধু মানুষের সঙ্গ পাবে বলে সে এসে দাঁড়ায় মাঝরাতে।
চাঁদের তেরছা আলো ঘোলাটে নির্বোধের মতো চেয়ে থাকে;
কেননা সে মানুষের ছায়াটি পড়ে না। গলায় একটা চেন,
এতদিনে
জং ধরে গেছে। হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে ঝুমঝুম শব্দ হয়।
আমি টের পাই, এসে দাঁড়িয়েছে। দুই হাত অন্ধের মতো বাড়িয়ে
দরোজার কড়া ছুঁতে চায়। কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করে
হতাশায় ন্যুব্জ হয়ে একদিকে ঘাড় ঝুঁকে পড়ে। ফিরে যায়
টলতে টলতে। একটু দাঁড়ায়। চাঁপাঘ্রাণ নিতে চায়। পারে না সে,
নাসা নেই তার। পুকুরের নীলজল তাকে ডাকে, তবু সেই ডাক
উপেক্ষা করে
রাবারজঙ্গলে ঢোকে, মাথা খুঁজে ফেরে। যদি কোনোমতে
পেয়ে যায়, তবে সে আবার কর্তিত মুণ্ডকে স্কন্ধদেশে
জোড়া লাগাতে চাইবে। ফিরে আসতে চাইবে হেঁটে
চম্পকসরণীতে, জীবনের ঘ্রাণ নেবে আগের মতন।
পায় না সে। কত বৃষ্টি জলে ঝড়ে কত কাকপাখিদের খাদ্য হয়ে
চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে সাদা সে করোটি। এখন পানক সাপ শিস
দিয়ে তাকে
জলে চলে যেতে বলে। হতাশ কবন্ধ মনে ঘাট দিয়ে জলে
নেমে যায়।

প্রত্নগরীকে

ধরো, সমস্ত কিছু এখন থমকে গেল,
ট্রাফিক সিগন্যালের আলো লাল থেকে আর সবুজ হল না
যে মানুষগুলি রাস্তা পেরোচ্ছে, তাদের পা আটকে রইল রাস্তায়
বাসের পেটে ট্যাক্সি, ট্যাক্সির পেটে অটো, অটোর পেটে বাইক
বাইক বাইক বাইক বাইকের পেটে জেসিপি
জেসিপির পেটে অবরুদ্ধ ট্রাক ... যে যেখানে সেখানেই স্থির
(অহো, কালিদাস হলে বলতেন 'চিত্রার্পিত')
যে বাইকটি ছুটে আসছিল দুরন্ত গতিতে
সে ছুটতেই থাকল অথচ এগোল না আর এক ইঞ্চিও
আরোহী যুবকের মাথার লম্বা লাল চুল বাতাসে উড়তে উড়তে
উড়ন্ত অবস্থায় থমকে গেল এবং তার সঙ্গিনী যুবকের কাঁধের
উপর দিয়ে
যে ইন্দ্রহত্যাকারী গ্রীবাভঙ্গিটি করছিল, সেভাবেই তির্যক হয়ে
. রইল
যে যা কথা কথা বলছিল, যে যে শব্দ শব্দ হচ্ছিল সব তালগোল
পাকিয়ে
একবার উচ্চারিত হয়ে কয়েক মিনিট গর্জন থেকে গুঞ্জন, গুঞ্জন
থেকে ফিসফাস
শেষে নিশ্চুপ হয়ে গেল
এখন এ পুতুলের শহর অথবা মমির
যারা পিরামিডের ভিতর মৃত চোখে এ উহার দিকে চেয়ে থাকে
শুধু আকাশঝাড়ুর মতো বিশাল হোর্ডিং জড়ে হাসিমুখে তাকিয়ে
রইল নিষ্ঠুরা রক্ষোকন্যাগণ
তাহলে কোলকাতা, হ্যাঁ কোলকাতা,
একমাত্র তখনই তোমাকে নিয়ে আমি কবিতা লিখতে পারতাম।

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

তুচ্ছতম, জীবনের

কন্যাকুমারী

সমুদ্রে উৎপল নেই। শুধু ঢেউ ... যার প্রথা নেই।
প্রথা ... উৎপল আছে মন্দির গর্ভে... সরোবরে...
পঙ্কজ সংকটকোণে; প্রতিসরণের পথে, শঙ্খ-
ধ্বনি প্রদীপের আলো হিরে খচিত তার নাসাপুট থেকে
জ্বলতে থাকে শান্ত ওষ্ঠে, প্রশান্ত বাম
গালে...

ব্যাক ওয়াটার

নেইয়ার নদী দূষণযুক্ত... পরাধীন নারীর মতো এই নদীর
সমুদ্রের সঙ্গে সরাসরি মিলন দেখে শরীরে রক্ত শিরশির
করে ওঠে এই বয়সেও; যে কথা বলিনি।...

সিংহল

এখন দ্বীপ ছেড়ে চলেছি। পোশাকের কারিগর পেয়েছি ফিরে।
তবু যেতে হয়। অবগুণ্ঠিত সন্ধ্যা রাত হয়। খোঁজা কি শেষ
হল। দূরভাষ কবেই স্তব্ধ আজ। ...শঙ্খ ঘোষণাহীন এই সে
লেখনী। অস্পষ্ট তীরভূমি, তোমার ব্যস্ততা যেন, দূরে সরে
যায়। শিল্পের ধ্বংসাবশেষ ... শাখাপ্রশাখায় পুষ্পের আয়োজন।

দিদি

অন্ত্যমিলের সহজ ছন্দে গভীর সে ভাব উঠুক ফুটে —
ধরো ভাবছ; যখন শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর, এ বাক্যটিকে
আসবে কি দোল... তেঁতুলতলায় ছায়ার পর পথের ঠিক
লক্ষ্যটিকে—
ঝাঁঝাঁ রোদের রাস্তা পড়ে—সরকারদের পুকুর সবুজ শান্ত
দিঘির—
কে ও ছুটে
আনছে ছিপ। বড়শি দিল জলে ছুঁড়ে। —বাতাবি তলায়
লুকিয়ে ব'সে ছোট্ট খুকি রূপসী নাম —শুভ্রা বলায়
স্কুলের খাতায়। দুপুর ভারী। সবাই ঘুমে। আমার দিদির—
অষ্টপ্রকার—ভগ্নপ্রাচীর
—সময় এটা একটা কোনও দুষ্টুমির।
—গপ করে খায় কাতলা
বুড়ো। গভীর জলের মধ্যে ছিল। ভীষণ সেই খেলা শেষে
মাতল শলা
—বড়শি মুখে হাঁপায়
মীন। তীরের কাছে, লাফিয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে, জল কি
ছাপায়,
ডাঙায় তোলে। বাড়ির লোক অবাক-খুশি। বকল না কো কেউ
তো উঠে!

ডাকঘর

এরপর আমায় আরও কিছু যথাযথ কথা লিখে যেতে হবে,
বিষ্ণুদা।
তারপর দেখতে হবে সুতোয় গাঁথা পাতিলেবুটি হাওয়ায় হাওয়ায়
দুলছে। অথবা
—হাওয়াসহ দুলছে কিনা। দাড়ির ভেতরে মুখ দুলছে, না
দাড়িসহ। পৃথিবীটা
দুলছে কি না।
শীত শেষ। বাতাসের সঙ্গে মিশে আছেন; কাল চৈত্রের বৃষ্টির
মধ্যে রবীন্দ্রতীর্থে
আপনার সঙ্গে দেখা, আপনার কবিতা বিষয়ে সুমন্তবাবু ঝকঝকে
প্রমাদহীন
ব্যবস্থা নিয়েছেন, এ কথা আপনার জানা। বললেন তাঁর সঙ্গে
আপনার
নিয়ম মতো দেখা হয়। কথা হয়। চটির সমস্যায় আর
থাকা যায়নি, বয়স,
পরিধান সিক্ত হল।

ভাস্করদা

বড় ডাক্তারবাবু দেখলেই আপনি ভালো হয়ে যাবেন, মানে
আগের মতো
—এ কথা কী করে অবিশ্বাস করি। নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকা
মানে কী?
গোপন কথা বলব আপনাকে। সিগারেট খাওয়াটা আজ বাচ্চা
মেয়েদের
ফ্যাশন। সমস্যাহীন রাখো ঘরের আনাচ কানাচ। এই আনাচ
কানাচ
শব্দটাকে আটকে আছি। একই অঞ্চল থেকে দুটি লাউডস্পিকার
বাজে,
একটাতে বিবাহের শানাই; অন্যটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গান।
বার্নিং-
ঘাটে বন্ধুরা বিড়ি খায়, মনে পড়ে সিদ্ধি খেয়ে এরা সব কী
কাণ্ড টাই না...

পত্রমর্মর

রাস্তার কথা বলব বলেই বসে আছি। না না সোজা গিয়েই
আর বাঁ
দিকে নয়...অনেকটা পথ; রিক্সাই পৌঁছে দেবে ভন্টাদের বাড়ি;
ভন্টাকে
না পেলে দিসারপুরেই যেতে হবে; ওখানে রিক্সা যাবে না;
এক মাইল, না,
কিলোমিটার গেলেই দেখবেন তৃতীয় খাটাল। বেশ বড়। কিছু
বীজ পাথরে
পড়ল। চিন্তা দৃশ্যের ন্যায় পড়ে আছে। শস্যভারী উঠছে তার বুক।
পদ্মপুষ্পের আয়োজন? সফল বেদনা? সকল ধ্বংসাবশেষ থেকে
জাগো, পথ,
পত্রমর্মর...

যখন তোমার চারপাশ

শুধু চারপাশে যখন কলম থাকে না। জীবনটাই হাতিয়ার যেন
দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।
ভাষা-ভঙ্গিমা জন্ম দেয় এই বাক্য-স্রোত। অনর্গল কথা বলে
চলে আমাদের সন্তান।
ঘিরে আছো মানুষজন। আর সবাই চলে গেছে খাদ্য, আমি কী
খুঁজছি? অন্তরবাসসহ
শুয়ে আছো কথা। এই রাত, এখনো খুঁজে পায়নি তাকে। তবে
কৌশল...ফাঁদ পেত
না। একা একা রক্ত চলাফেরা করে। ঘুমুতে যাবার আগে এই
কথা লিখে রাখি, মাথার ভেতরে, কলম।

বিশ্বরূপ দে সরকার

মল্লিকা. com

যখন মল্লিকার সমস্ত চৌষট্টি আমি আলতো করেছি
যখন ক্যামেরার অনুরোধ ডালিম ফোটায়
আর অনুরণন মানে চূড়ান্ত দেবদারু
যখন ফর্সা হাসি একটা কোমর ছাড়া কিছু নয়
কিছু একটা নয় ১৪৪ সিলিকনের ওপর মাধুরী ছোট্ট একটা ড্রপ
নতুন শতাব্দীর কুঁচকে যাওয়া দশ ইঞ্চি
আমাদের পশম অবধি নিয়ে যায়
যেন খুঁজে থাকে মনোবীণা, মনোভাব, মন মেঘের ওপর

জার্নি

আর আমি আদরের জামফল একবার বোধ করি।
বুঝতে পারি না কাকলির জলবায়ু।
যেখানে নিখুঁত পাজামা ব্যথার ঠুংরিগুলি
মাংসের গান হয়।
আমার মনে পড়ে কুসুম উরুর ছাদ।
শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্নিশে আত্মীয়তা শিখি।
আমি কেউ নই, কম্পনরত চাপ তখন ভিতু ও গরম।
চিরুনি কামনাদেবী আর লাল টিপ বালির ওপর
তুখোড় প্রেমিক তবু ঈষৎ আলসেমি।

নামকাটা

পাতারা রোদে থাকে তার তাকানোরা হাওয়ায়
আকাশ জানে নিরুপায় সে
উদাসীন মাঝে মধ্যে নৈর্ঋতে বের হয়।
তাদের আষাঢ় ফিরে তাকানোর পর্যটন থাকে না তাই
তারা চিবুক খুঁজতে বেরোয়।
মাঠ চেয়ে চেয়ে নেমে যাওয়া চোখ
অপলক সন্ধ্যা, ঝুঁকি ও পা ফস্কে চুড়িদার
ফেরত এইসব রং, পায়ের ছায়া, তাদের কোনও অফিস নেই
ছোট ছোট মুগ্ধ দোকানপাট, তুলনামূলক আঙুল
যারা সস্তার দিক নির্দেশ করে, নিচু, নিঃশব্দে
অক্সিজেন ভর্তি টিফিন, বাড়ি ফিরতে অনেক নাম হয়ে যায়।

এক, একটা

তোমার চোখের আমলকী আমাকে দাও
রোদের প্রকৃত এসে লাগুক কপালে
সেই কবেকার অভাবে তুমি চিচিঙে রেঁধেছিলে
লালকমল নীলকমল সাইকেলে সন্ধের মুখেই
লণ্ঠনের পাশে নিশ্চিত হারমনিয়াম
আয়ত্তের মধ্যে ছিল না সেইসব জানালার কাচ
কেবল ভেজা, শান্ত পাশের বাড়ির
শুভাকাঙ্ক্ষী সেফটিপিন
পাজামায় দড়ি ভরে দিত আঙুলের পরিষেবা

বিপ্লব চৌধুরী

কাগজফুল

আমি কাগজের।
আমি কাগজের।
ভিনদেশে জন্ম
সে-ই কবে!
তারপর কত পথ
কত পরিক্রমা...
তবু এখনও অচেনা
তারাদের কাছে।

২

এটা কাগজের ফুল।
তুমি চুলে নাও।
পাঁপড়ির পেলব ছোঁয়া
হল না তোমার পাওয়া।

৩

কাগজের ফুল নিয়ে কী করবে তুমি?
আমি প্রকৃত বাগান থেকে এনে দেব
আসল রক্তের ফুল।

টপটপ ঝরে-পড়া বিক্ষোভ দিয়ে
একখানি মালা গেঁথো সখী।

৪

কাগজে কাগজে আমার যন্ত্রণা
তুমি পড়ে দেখো ছোট পত্রিকায়।

কৃষ্ণ-ব্যথায় আমার দিনরাত যায়...

কবে, আর জেগে উঠব না ঘুম থেকে।
কবে, সেই সকাল তুই আসিবি সখী কবে?

ঢেউয়ে ঢেউয়ে দাউ দাউ হবে উন্মাদনা...

দ্যাখো দ্যাখো পাগলা-গারদের দিকে
ফুলের নৌকা যায়। ধীরে ধীরে যায়...

৫

তুমি আমার গন্ধ পেলে না।

ঝড়ের মুখে আমার নাচ
দেখলে তুমি ভুলতে না।

অপরিচয়ের ফলে তৈরি
তোমার মনের বেদনা—
আমার মর্মে এসে টুকি দেয় যদি

তোমাকে দেখাব, দেখাবই

কুসুমের নদী...

৬

'কৃষ্ণকলি নৌকা চাই'
অর্ডার পেয়ে আমি রং করেছি আলকাতরায়।

তাই আমাকে কালো দেখায় অমন আলোয়।
শুধু চাই, আমার গ্রাহক যেন সুখে নৌকা বায়।

আলকাতরায়, অমাবস্যায় লীন হয়ে যাব।
পাঠক, পাল উড়িয়ে হাওয়ায় ভাসো তুমি

এবং তোমরা সবাই...

৭

পত্রলেখার কাজে এ জীবন
সার্থক হয়ে উঠুক

একটি প্রেমের পত্র লেখো তুমি

তোমার শ্যামলী-আঙুলে ধরা ওই কলম;
আমার বুকের উপর দিয়ে সাঁতার কাটুক
রুপোলি মাছ আর রাজহাঁসের দল...

সেখানে একটা বাগান তৈরি হয়ে
ফুটে উঠুক সত্যিকারের ফুল...

৮

আমাকে ছিঁড়ে ফেলা খুব সহজ
তারপর পুড়িয়েও ফেলতে পারো

আমার নশ্বর তুলোট শরীরের ছাই
যদি না-মেটাতে পারে নদীর কামনা

পর্বতচূড়ায় যদি দর্শন না-হয় তুষার
অভয়ারণ্যে যদি না-পাও বাঘের দেখা

আমাকে ছিঁড়ে ফেলো, ছিঁড়ে ফেলা খুব সহজ।

৯

প্রচ্ছদের আড়ালে আমি
প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি।
বোতাম গড়িয়ে যাক কাঠের নীচের
কালো অন্ধকারে।

পাতালে প্রবেশ করি আমি।
তোমার পাতাল।
বোতাম গড়িয়ে গেলে, যাক...

১০

গাছের অংশ আছে আমার ভিতর।
রৌদ্রের প্রখর। আছে শরীরে আমার।
বর্ষার জলকণা। রক্তের অববাহিকায়।

১১

আমি তো জানি না কিছু। মহাপৃথিবীর।
কোকিলের কালো ডাক। বসন্তের কুহু।
জানি না তো জলছবি। মাছেদের গভীর সাঁতার।
অরণ্য-অর্জন নেই। দেখা হয়নি বিশ্বরূপ।
আমার নির্বোধ প্রাণ। এতই আদিম।
এখনও আদিম যুগে। কাঁচামাংস খায়।
সবকিছু রয়ে যায়। আমার অচেনা।
নিজেকে। তোমাকে। মাছ ও কোকিল।
প্রাণ ও প্রকৃতি। এবং আরও আরও বহু।

১২

জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে দাগ কেটেছ আমার বুকে
এই দাগ ট্যাটুর মতন, সহজে যাবে না।

আর কখনো কারও সহস্রদল বাহুর নিবিড়ে
কেঁপে কেঁপে উঠবে না এই কাগজের দেহ!

এখন সে আলকাতরায় একা একা থাকে।

১৩

কাগজের বাগানে অক্ষরের সাপগুলি ঘোরাফেরা করে।

১৪

তবু আমি ফুল। তবু আমি ফুল।
রাতের আলকাতরায় ঢেকে রেখেছি নিজেকে।
যেহেতু সৌরভ সুবাস কিছু ছড়াতে পারি না।
আকর্ষণের কোনো প্রভাই আমাকে দেননি ভগবান।

তবু আমি ফুল—এটাই সান্ত্বনা।
পরজন্মে সত্যি কোরো—জানাই প্রার্থনা।

অর্ঘ্য মণ্ডল

স্থগিতাদেশ

কে দূরবর্তী আড়ালে আড়ালে
প্লাবন সম্ভাবনায়
স্থগিতাদেশের মতন দাঁড়ালে
সচল ভাতের থালায়

সেই থালাটির শূন্যে এবং
শূন্যের কিছু ঊর্ধ্বে
পাহাড় সাগর অবলীলাক্রমে
এসেছ ঘুরতে ঘুরতে
এমন ঘূর্ণি, ঘোরাতে ছুটেছি
স্থগিতাদেশের মাঝে
ক'ফোঁটা চোখের জল পড়েছিল
আজ যোদ্ধার সাজে
চলেছে ভাতের থালায় এগিয়ে
ক্ষুধার্ত মুখগুলো
আগুনের থেকে চোখের পাতায়
উড়ে আসছিল ধুলো।
তবু আমি বেশ তাকিয়ে দেখছি
প্লাবন সম্ভাবনায়
স্থগিতাদেশের মতন দাঁড়ালে
ভাতের থালায় থালায়

দোলনা

কোনটি আমার ছিটমহলের দাবি
কোনটি আমার ম্যাপের ক্ষতদেহ
ভাই বাড়ি নেই আপনি কোথায় ভাবী
জলোচ্ছ্বাসের শীর্ষ থেকে বুকের
মধ্যিখানে ঝাঁপ মেরেছে কে ও!

ঝাঁপ মেরেছে নগণ্য ঈর্ষায়
নির্বাচনিক অজস্র চিৎকার
আইন কানুন ভোজালি পিস্তল
আছে তুমি খোঁজ পাওনি, ফাঁসে
ঝুলিয়ে দিলে নিরন্ন সংসার

কোথায় মানবসুলভ উঠে ঘুরে
তাকাতে পারার সীমানা নির্দেশ
ভাই বাড়ি নেই? কোথায় গেলি ভাবী!
বাঁশবাগানে জোছনার দোলনায়
ঝুলতে ঝুলতে সংসার দোল খায়

জলোচ্ছ্বাসের শীর্ষ থেকে বুকের
মধ্যিখানে ঝাঁপ মেরেছে কে ও!
দোল খাচ্ছে আমার ছিটমহলের দাবি
দোল খাচ্ছে আমার ম্যাপের ক্ষতদেহ

ঘোড়া

বাঁধি, তোমায় বেঁধে বেড়াই। সকাল সন্ধ্যা
কেঁদে বেড়াই, বোঁচকা খুলি
অশ্রুহাসির মধ্যে তুলি মাথা
বাঁধি, তোমায় তন্ত্রে বাঁধি। মন্ত্রে বাঁধি।
মানুষ কাটার যন্ত্রে বাঁধি।
টিপ পরিয়ে ঘুঙুর বেঁধে
মুণ্ডমালা গলায় দিয়ে...
তোমায় ঘুড়ির মতো ওড়াই
এই সুসময় ভালুক নাচার
মধ্যে গিয়ে আঙুল তুলি
শবসাধনার মধ্যে শুয়ে, অনেক বছর
আগের থেকেই হঠাৎ হঠাৎ তোমায় কাঁদি
এবং ঘুড়ির মতো ওড়াই
আমার উন্নয়নের ঘোড়া

অর্ণব সাহা

২০ জুনের ডায়েরি

১

স্বপনকুমার আমাদের বন্ধুলোক
স্বপনকুমার বাবার ছোটবেলার সহপাঠী

বাজপাখি আমার কেউ নয়
ড্রাগন আমার কেউ নয়

চড়াদাগের মলাট রাতের ঘুম কাড়ে
ফোর-কালার স্বপ্নের জাল

ভিতরে ছটফট করছে মাকড়সা
কুয়োর নীচে আর্তনাদ

আমরা গভীর প্রতারক
আমরা অস্ত্রসমর্পণকারী

যখন চার্চের ঘণ্টা শোনা যায়
রক্ত ঝরে বাগানবাড়িতে

কারা যেন ছোটাছুটি করে
কাটামুন্ডু গড়ায় রাস্তায়

দুহাতে পিস্তল আর টর্চ
অতিরিক্ত তৃতীয় হাত

একটা তিন নম্বর হাত

২

ঘুমের ভিতরে হাঁটি, ঘুমের ভিতরে মুখ লুকোই
পকেটে খোলামকুচি, মুঠোয় ভরপুর খুচরো তারা
রোজগারের চেয়ে বেশি খরচের দাবি মেনে নিয়ে
আমি তার তিন সত্যি, যুক্তিহীনতার সিলমোহরে
নিজেকে লেফাফা-বন্দী ডাকবিভাগের ইচ্ছাধীন
করেছি... শিরার নীচে যথেচ্ছ ইন্ধন জুগিয়েছে
ঠুনকো নিরাপত্তা থেকে খুলে নেওয়া সেফ্‌টি ভাল্‌ব
লাইফ সাপোর্টের চেয়ে দামি শরীরের গন্ধ ... বুনো
আঁশটে মাটির স্বাদ, অনেক মাহেন্দ্রক্ষণ, ভুল
গ্রহ-নক্ষত্রের যোগে দুঃসময়ে হাতে হাত রেখে
অজ্ঞাতবাসের গল্প তার শিয়রে ছুঁয়ে দেবে বলে
দেখেছি সে আবরণ খুলে দিচ্ছে রত্নপেটিকার
মোহরে রক্তের ফোঁটা, চুনি-পান্না অশ্রুজলে ভেজা!

৩

নৃশংস তঞ্চক
এবার হিসেব চাইবে ... জল
        বিপদসীমা ছোঁবে
উইন্ডশাইম
ভাঙা কাচের গেলাস
সবুজ রং, আর আমায় শাস্তি দিও না
        আমি ঋণী

৪

চোখের দৃষ্টি কেঁপে ওঠে, মসৃণ এসক্যালেটর
একের পর এক সওয়ারি তুলে আনে মখমলের দক্ষতায়
হয়তো বৃষ্টি পড়ছে মারাত্মক, দুঃসময়ে নিম্নচাপ
অপেক্ষার পারদ চড়িয়ে দেবে ক্রমাগত...

গতজন্মের স্বপ্নে একটা অবাস্তব দৃশ্য ছিল, কেউ
উলটো বাতাস কেটে সামনে আসবে কুয়াশায়
তবু অধরাই থাকে পাঁচটা আঙুল, আর এই ছবিটা
নিমেষেই ফেড আউট হয়ে যায়, লং শটে
শপিংমলের জানলা থেকে ধূসর শ্রাবণ ধুইয়ে
        দিচ্ছে দোকানপাট...

মিথ্যা পশরা সাজিয়ে বসে থাকে অলস দোকানি
বেসাতি নেই, মাছি বসছে ডালায়, ফেরারি মুহূর্তগুলো
ধাক্কা মারে অবিরাম, শার্শির কপাট খোলে আর বন্ধ হয়
শব্দের ওঠানামায় মনে পড়ে কারও আলগা ছোঁয়া, দীর্ঘশ্বাস,
        যে ছিল আরেক জয়ের সহচর!

৫

নিশাকে খুঁজেছি আমি
অনেক আলোকবর্ষ পার হয়ে গেছে।
ফ্যান্সি পার্লার থেকে সনাতন বস্তিবাড়ি,
        দালান পেরিয়ে
চিনেছি স্মৃতির দরজা, এবড়োখেবড়ো স্তন
আমার বায়ুশরীর জঙ্ঘার সুড়ঙ্গে মুখ লুকোবে
শরীর আসলে মল-মূত্রে চৌকাঠ, যার
মুখ ও পায়ুর দরজা একসাথে বন্ধ হয়, খোলে!
গতকাম, যে শরীর নিংড়ে মূর্তি গড়ব, তাকে
যার নাভি এঁকে দেব শব্দে-ছন্দে, বিবর্ণ তুলিতে
যে নিষ্ঠুর, তাকে আমি নিশার শরীরে খুঁজি
সুগন্ধ কাচের দরজা পেরোলেই ঝাপসা হয়ে যায়

রাজীব সিংহ

উৎসব

খোলসজন্ম এই — নিজেকে কী জানি!
এই প্রশ্নে শ্বাপদেরা চিৎকৃত রাতে—
সহসা থামে না কেউ, উৎসবে মাতে।
পথে হাঁটে সহযাত্রী, রাত কলঙ্কিনী —
যেভাবে জাহাজ ফেরে করে আমদানি
রসালো নতুন আলো নক্ষত্রের সাথে,
মনে রেখো প্রকৃতি তুমিও চাঁদহীন পথে
পৃথিবী বুড়ো তো হল তবু মায়াবিনী...

জেগেছি অনেক রাত শহরে ও গ্রামে,
রানওয়ে ধ্বংসময়, ওড়ে প্রজাপতি—
এইখানে আলোহীন অন্ধকার নামে,
ক্লান্তিহীন রাত্রিটুকু নির্বাক নিয়তি
শ্যামবাটি সোনাঝুরি এই মধ্যযামে
মোবাইলে রাত্রি জাগে খ্যাপার করোটি...

পর্যটনে

হাত ধরেছিলে হাতে নতুন স্টেশন;
রয়ে গেল ঘরদোর তবু অকস্মাতে
পাগলিনী চলে এলে হাত রেখে হাতে
এই যে অনন্যময়, কেন অন্যমন?
আবহাওয়া ভালো। শুরু, এই পর্যটন,
সন্দীপনের রুবি আর অ্যালেনের সাথে
হীরাবন্দরে; চলো তোমাতে আমাতে—
আদিগন্ত সাগরে ইচ্ছেমতন...

এমনই কাঙাল আমি অগভীর রাতে
স্পর্শবোধে শিউড়ে যাই কূপমণ্ডুক—
লোকালয়ে অনুপম ও-দুটি বাহুতে
উজ্জ্বল আলেয়ারাশি প্রগল্‌ভ মুখ।
কে ডাকে খ্যাপাকে বলো চেনা ইশারাতে
ক্লীবের দেহেতে রাত্রি হৃদি উন্মুখ...

বিগশপার

এই পথে আলো ছিল, ইচ্ছের আকাশ
কী ভাবে হারিয়ে তুমি শূন্য চরাচর,
অসংরক্ষিত দিন প্রিয় অবসর
কাটাও সমস্তদিন পূর্ণ অবকাশ।

আয়োজনে নিবেদনে সারা চৈত্রমাস...
লোকাচারে সর্বনাশী পত্রের মর্মর
সমতট ভূমি জুড়ে নদীয়ানাগর
করুণাময় প্রেম খোঁজে বসন্তবিলাস।

উদ্বাস্তুদিন যায়—কৈশোরদিন!
তারুণ্যের সিগারেটে আনন্দ-বাজার—
পাহাড়ি জঙ্গলে ঘোরে রুকস্যাকহীন
রাত্রি, কী বলব বলো, এ বিগশপার
আলো জ্বলে বাংলাদেশে অথচ রঙিন
পুরে নাও চিত্রকল্প অলীক খ্যাপার...

গ্রহণ

নদীতে তরঙ্গ আরও সুন্দর হে—
সেতুগামী আন্দোলন ঘোলাজল মাটি,
বাউলে ফকিরে খোঁজে লুকোনো নেশাটি
উদ্বাস্তু এই মাঠ অকস্মাৎ মোহে
দিকনির্ণয় ভোলে প্রকট সন্দেহে—
বেসামাল এলোচুল অচেনা ভ্রূকুটি
খোল-করতাল বাজে হিরের আংটি
আকাশে প্রকট সবই গ্রহে-উপগ্রহে।

নোনাজল ভিজেমাটি নুয়ে-পড়া ডাল,
সন্ন্যাসী কাঁকড়া খোঁড়ে কথার প্রলাপ—
গ্রহণে গ্রহণে জাগে খ্যাপা ও মাতাল,
হস্টেলের ঘরে মৃত নগরীর সাপ
দুখজাগানিয়া, রাত্রি, সোনালি সকাল
নয়ের দশক জুড়ে কেরিয়ারগ্রাফ।

শ্রীজাতা কংসবণিক

বিলুপ্তি

দলিল দস্তাবেজ যত আছে, পুড়িয়ে ফেলার আগে
একবার জেনে নিতে হয়
আততায়ীর ঠিকানা...

তবু এতদিন পরে, মাটির তলার জলে...
তারও নীচের সাম্রাজ্যে যে উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল,
সেখানে অক্ষত রক্ত, দাগ নিয়ে পড়ে আছে
মৃত এক পাখির ডানা।

সেইসব ক্ষত মুছে দিয়ে, মাটিকে বানাব সিংহাসন
জলকে বানাব ওগো তারই ধানক্ষেত

আমার কেবল আছে একটি সোনার চাবি...

পুরোনো দলিল যত আছে, পুড়িয়ে ফেলার আগে
একবার জেনে নিতে হবে
সভ্যতায় ক্ষমতার দাবি...

গণ্ডী

বৃত্তের বাইরে আরো এক বৃত্ত আঁকা...
তার বাইরেও...

অনেক পরিধি পার হয়ে,
ফের কেন্দ্রে ফিরে গেলে
সুস্থির বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায় ছবিটা
সেখানেও একবার ফিরে যেতে হয়...
যেখানে ঘুমিয়ে থাকে বিভাব কবিতা,

তারপর আবার জীবন।

একাদশী ভোরে

সাপের দেহের মতো
যেসব কবিতাগন্ধ মিশে থাকে মাটির গভীরে
অবজ্ঞার কাছে রাখি সেইসব বিষাক্ত কুণ্ডল

কাছে যেতে ভয় করে,
যদি তারা খেয়ে নেয়
আমার পুরোনো খাতাগুলি
আর বিষ ঢালে
কবিতার নতুন শরীরে...

তাই দূর থেকে দেখি,
কীভাবে বিজয়া রাতে
নৌকা দুটি সরে যায় উলটো অভিমুখে

আমিও তলাই যদি বিশবাঁও ইছামতী জলে
যদি জ্বর আসে মাঝরাতে
এই ভয়ে দূরে সরে থাকি

তবুও সাপের মতো কবিতারা ঘোরাঘুরি করে
একাদশী ভোরে
আমি আরও ডুবে যাই
আমি আরও বেঁচে উঠি
কবিতার নতুন শরীরে।

প্রতিবিম্ব

মনে হল সামনেই খাদ
অনন্ত আকাশ আর বিপরীত গাছেদের
অচেনা বসত
পরিচিত কাচের টেবিলে।

এ এক কল্পনা বিম্ব
মধ্যপন্থা হাতে নিয়ে
দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই বিস্ময় গোলকে।
শিরদাঁড়া সুষুম্না নিয়ে, রক্ষা করছি নিজেদের

আমাদের ব্যর্থ দিনগুলি ছুড়ে ফেলে দেব
ওই মায়া গহ্বরের দিকে?
তারপর ফিরে যাব
চিরপরিচিত সেই মাটির ভিতর...

এসব ভাবার পরে তিরবেগে উঠে যাই
ছুটে চলি রাস্তায় রাস্তায়
পরিচিত পথগুলি সরু হয় ক্রমে
অনন্ত বিচ্যুতি এসে আমাকে ভাসায়...

শুভম চক্রবর্তী

অসিধারব্রত

নক্ষত্র বিষয়ে আমি কচু জানি,
আমার উঠোনে ওড়ে, মধ্যবিত্ত পেঁয়াজের খোসা
উদ্দাম রাতের স্রোতে হেঁটে আসে অচিন কুটুম
তার থেকে দু'কদম, হাঁটুজল; ডুবোজল শিখি
বাকিটা কুয়াশা ডানা, অনন্তের দিকে ল্যাং মেরে
ফিরে আসা, উদয়াস্ত মধ্যবর্তী ব্যথার স্যাঙাৎ
নক্ষত্রবিষয়ে আমি কচু জানি
কুচুটে আত্মীয় সব জানে
হাঁটুজল-ডুবোজল-রসাতল, জীবনের মানে...

২

বুকের ভিতর বিষাদবাড়ি
মাঝে মাঝেই শুকনো পাতা
রাতসতীনের নামতা পড়ে
ধুলোয় গড়ায় অশ্রুদাতা...
ধুত্তেরি ভোর ধবল আমার
জড়িয়ে ধরে মস্করাতে

আটপৌরে শরীরখোসা
সরিয়ে বালি, মাদুর পাতে
স্বপ্নে সবই সোনার হরিণ
গভীর বনের ভুল মেশানো
উপচে ওঠে বল্গাহীনা
উপচে ওঠে রোঁয়ার টানও
অনিচ্ছাতেই ঝলমলাল
উঠল জ্বলে বিষাদবাড়ি
মাঝি জিগায় সাঁতার জানো
যাত্রী দ্যাখায় দাঁতের মাড়ি
আর দেরি নয়, এবার শুরু
মধ্যজলের পদ্যলেখা
মুহূর্তময় ছড়িয়ে থাকি
শরীর বড় একলা, একা!

শরীর

আমি কি এতই মাছ...
টুক করে গিলে নেব, মোহভরা টোপ
আমি কি নিপুণ এত
আঁচড়ে কামড়ে বেঁধে
তোমাকে তোমার থেকে জাগিয়ে, নাচাব
লতাঘেরা সম্পর্কের গোপন উঠোনে!
এ দেহ সমীহ করে
জাদু আর জাদুবাস্তবতা...
শরীরে শরীরে কত অনাবৃষ্টি
আমি কি বুদ্ধু চাষি
জলে জলে কেটে নেব ধান
আমি কি শীতল সাপ
জ্বালাব, পোড়াব তোকে, দ্রোহের আগুনে
শরীরে জমেছে উল, চলে যাব, পোশাক না বুনে...

খাজুরাহো

আমার শরীর বেয়ে...
রতিপাথরের ওঠানামা!
সমুদ্রস্নান সেরে পাথরও কি নারী হয়ে যায়?
অথবা অহল্যা জাগে প্রতি পাথরের বুক চিরে
আমাকে ভাসিয়ে নিজে নেমে যায় স্রোতের গভীরে
বিষকুম্ভ কাদাজলে একটি কুমির শুধু সাঁতরিয়ে ওঠে
শরীরে শরীর যেই ঘষা লাগে আগুন ঝরিয়ে আলো,
নিশিপদ্ম ফোটে...
(আমার কাঙাল ভাগ্যে, এই সব পাথরেরা জোটে!!!)
শরীরী ক্যানভাস জুড়ে হতোদ্যম ম্লানসূর্য, বলে যায় তার
পূর্বরাগে
দুষ্টু জেগো না বেশি, লুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো পাথরপরাগে!

কল্পর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ডিসেম্বরে যা লিখেছে সে

মালবিকার সাথে কলহপ্রবণ সন্ধ্যা মনে পড়ে
টি-শার্টের ফাঁকে বর্তুল স্তনের আভা
ভালো লাগে বলে
সাদা-কালো ভোরবেলাকার স্বপ্নে
উত্থিত বাহু মালবিকার শার্ট
পিঁয়াজের খোসার মতো খুলে যায়
অসম্ভব চোখের কাজল রেখা
এইভাবে খোলা
প্রতিষ্ঠান বিরোধী স্বপ্নে
কত শত প্রপাত ঘটে যায়

২

একটি ছুরিকা আর পুরুষাঙ্গে
তফাৎ সম্ভব নয়
যা কিছু হত্যার পরে চালনা নিষ্ফল হয়
হায়, মালবিকা, ঘৃণা করে তাকে
জানিয়েছে, বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে
চা-পান করানোর অছিলায়

৩

যে-কোনও শ্রমের কাছে
তোমার নখের রঞ্জন
অশ্লীলতা মনে হয়
মনে হয়, গলা টিপে ধরি

৪

যে গান শোনে না কেউ
জেনো তাও নিষ্ফলা নয়
পাখিরা গানের শেষে
কবে করে শ্রোতার প্রত্যাশা
সহসা আলোকপ্রাপ্ত কবিদের নিয়ে
কোনো আলোচনা নয়
ওইদিকে পানশালা
ওই দেখো অন্ধকারে
গন্ধহীন পুষ্প ফুটে আছে

৫

যেরূপ স্বর্গীয় হর্ষ অনূদিত হয়
প্রকৃত কবিতা পাঠে এবং সঙ্গমে
তদ্রূপ বিষাদের ছায়া
যদি করে গ্রাস, জীব-মহীরুহ
জীবন সংগীতময়, অনুরণনের মতো
তোমার সমস্ত লেখা আমার রচনা

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

১

শীর্ষেন্দুর কাহিনির মতো আমি জলের গহিন
চোরাপথে এসে নামি
পিছনে ডাকাত! গুপ্তধনের খোঁজে...
তারা বুঝবেই, গল্পটা যারা বোঝে

২

গোবরডাঙায় গেলে দেখতে পাবেন
যমুনায় স্নান করে বনলতা সেন
স্নান সেরে যথারীতি পোশাক ছাড়েন
টি আর পি বেড়ে যাবে! লাইভ আনবেন?

৩

আমাদের মাথা পদানত
আমাদের পদযুগ নেই
আমাদের প্রেমে থতমত
হলে মরে যাবে অল্পেই

আমাদের ত্যাগ করো, স্নায়ু
ছেড়ে চলে যাও আমাদের
দু'দণ্ড আমাদের আয়ু
চিঠি পড়ে নিয়ো আজকের
একে ডাকি, ওকে ডাকি, তাকে
বিচ্ছেদ জমে থাকে-থাকে

৪

পুরনো নগরে গেছে মধ্যমেধা রাজা
হাতিরা চঞ্চল আর ঘোড়ারা সুলতান
রানিগণ ক্রীতদাসী, যুবরাজ খাজা
রাজন-রক্ষার দায়ে রয়েছে কামান

রাজা গেলেন উদ্যানে, সে উদ্যানও বিশালই
বসন্তসেনার সাথে ভিতু আম্রপালী
বিধবা হয়েছে তারা, রাজাও বিধবা
কারণ রাজার নেই কোনও সুপারনোভা

নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এলোমেলো কবিতা

১

জুড়িয়ে গেলে
সহজ হয় বিষও,
শুধু একটু সময় নিয়ে মিশো।

২

ফিরে আসার নিয়ম মেনে
সবাই বাড়ির রাস্তা চেনে

৩

স্বাধীনতা মানে বন্ধন থেকে দূরে যাওয়া,
ভাসতে ভাসতে আবার কোথাও জুড়ে যাওয়া!

৪

কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি
ভিড়ের মধ্যে অসাড় পা
দেখতে দেখতে ভুলেই গেছি
কীসের জন্য অপেক্ষা!

৫

আলোর মতো ছায়ার মতো
কিছু কথা রাখাই থাকে,
বৃষ্টি এসে ধুইয়ে দিলেও
একটা কোনও বারান্দাকে।

৬

যে তাকে ছোঁয়নি সে বুঝেছে
বাকি রেখেছে আদর,
যে তাকে ছুঁয়েছে
সে বুঝেছে সে পাথর!

৭

জীবন একটা সেতুর মতো
দুই দিকে দুই বিন্দু
সোজা দেখলে সরলরেখা
বাঁকা দেখলে নিন্দুক!

৮

একটা বাড়ির থেকে
অন্য একটা বাড়ির ভিতর
থাকে রাস্তা, না হয় মাঠ, নয়তো ধানের ক্ষেত
একটা লোকের থেকে
অন্য একটা লোকের ভিতর
বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের প্রেত!

রণবীর দত্ত

গন্তব্যের দিকে

স্টেশনের দু'দিকেই পাহাড়, লালমাটি উড়ছে ফালা ফালা
ডানায় ভর দিয়ে একটি উড়াল পাখি তারার দেশে চলে গেল
এবার আমাকে নিয়ে চলো জঙ্গলের মাটির ঘরে দুঃখের তালুকে
দুপুরের দগ্ধ বাতাস এলোমলো করে দিচ্ছে যাবতীয় মনোযোগ ও দীক্ষা
আলোর প্রহরী পুনর্জন্ম পেয়েছি এই মহুল তমালের দেশে
দানপাত্র বয়ে নিয়ে চাঁদের কয়েক টুকরো আর আমার মায়ার সামিয়ানা
এই নিসর্গগন্ধ এবং পৃথিবী আমাকে একেবারেই খেয়ে ফেলেছে—
ভাবছি এত ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য স্রোত আর অমোঘ টান, অতীত
এ তো আমার জন্যই আকাশ ভেঙে মাটিতে নেমেছে স্তব আর মন্ত্রের উৎসব
আর কোনও কথা হবে না। অবশিষ্ট সব ছদ্মবেশ ছেড়ে শক্তির বাইরে
ডানায় ভর দিয়ে একটি উড়াল পাখি তারার দেশে চলে গেল—
এবার আমাকে নিয়ে চলো জঙ্গলের মাটির ঘরে দুঃখের তালুকে

চুম্বক

এক-একটা দিন কবিতার কাছে বসে কাঁদি, কী চুম্বক আছে
অভিযোগ এই আমার আঁকবার তুলিগুলি
কে যেন নিয়ে চলে গেল কবরখানার দিকে
বলো একটা আলোর বলয় নতমস্তকে আছে
ভাবি দুমকার দেশে টিলা পাহাড়ের ওপাশে
ঘন অরণ্য আর বড় বড় খাদ ব্যাপ্ত হয়ে আছে
সেখানে তো কোনও সভ্যতা আসে না—
হায়েনা, বাদুড় নানা বন্য জন্তুর ভয়ে
নীরব স্তব্ধতা জমে থাকা আরও ভয়ের ভেতর
আমার হৃদয় খুঁড়ে জল ও পাথরের একটি কবিতা
সাদা পৃষ্ঠা থেকে ক্রমেই উধাও হয়ে যাচ্ছে
খুবই আফসোস এত খিদের মধ্যে আমার অরণ্যবসত
আস্তে আস্তে গোপনে জড়ায় কী এক চুম্বক আছে
একটা স্বপ্নের ভেতর আর একটা স্বপ্ন আসে আর
ভালোবাসা জড়ায় ভোরবেলার সাদাফুলগুলির বিদ্যুৎ
বিগত যৌবন যেন ভিজে গামছার মতো কোনও উষ্ণতা পাবে না
হাসপাতালের গন্ধ কী যেন এক রাস্তা তৈরি করে
মানুষের মুখ আর অজস্র নির্মাণ অনন্ত ঘর্ষণের চাকা
এক-একটা দিন কবিতার কাছে বসে কাঁদি, কী চুম্বক আছে

সম্পর্ক

ঘাটশিলার রঙিনফুল অম্‌রিলতার প্রান্তর দেখে গালুডির দিকে
আমরা অটো নিয়ে চলে গেলাম। ওখানে মনপাখি আছে—
আমার সাদা পাতায় ভরে যাচ্ছে অজস্র কবিতা আর কুহক
সকালে ছোটদের ঘরে পুরনো ভ্যাপসা গন্ধ মনে হল বর্ষাকাল
বন্য পশুর লোম থেকে আসে। জামশেদপুর রেললাইনের ওপাড়ে
জাতীয় সড়ক চলে গেছে শহরতলির দিকে অনন্য নীলিমায়
দুপুরে গরম মহুয়া খেয়ে মাছভাজা আর ভাত নরম মোহজল
ড্যামের ওপারে উত্তর না মেলানোর দিন কী নিপুণ খেলা
কোনও প্রশ্ন আর না কামানো দাড়ির সৌরভ ঘোড়া
মনে হল আমার মৃত মানুষেরা সরে সরে যাচ্ছে
আমরা গরম মহুয়ার সাথে চান করে নিলাম
যুবক পথের পাশে আমাদের তরলপথ কত যে প্রেম
বৃষ্টি ছুড়ে গেল, হাত খুলে রাখছি, পা খুলে রাখছি
যোগ বিয়োগ অঙ্ক করতে করতে বিশ্বজিতের বড় মোবাইল
চলচ্চিত্রের হেঁটে যাওয়া আমাদের কোনও পথ নেই
হারানো নৌকার মতো দিন যাচ্ছে কী যেন এক নতুন সন্ন্যাস
তরুণ কবি আর কবিপত্নীর নতুন নতুন কলহ আর কুহক
বলছি এই ভিজে দিনে বেশি তো কথা হবে না—
পোড়া মাংসের গন্ধ সুবর্ণরেখার তটে কৃষ্ণগহ্বর
পোকার উৎসবে আমাদের ভাঙচুর শরীর নেচেছে
বাড়ন্ত বিকেলের রোদে শীত শীত তারপর তরল বিনিময়
বিদায় সুবর্ণরেখা, গালুডি মনখারাপ আমার ঈশ্বর সম্পর্ক

নিজের সঙ্গে

কার সঙ্গে উড়ে যাচ্ছি? কার সঙ্গে দিন
রাঙতায় মোড়া হজমিগুলি, অসহ্য সব ঋণ
লুকোনো ঘরের খেলা লুকোনো সব চাবি
রেলপথেই একজীবন শুধু শুধুই ভাবি

কার সঙ্গে উড়ে যাচ্ছি কার সঙ্গে দিন
ঈশ্বর দেখা দেবেই, আমি যে রঙিন
হাঁফাচ্ছে রোদগুলি চেনা যে আগুন
শিরদাঁড়া বেয়ে নামে আমারই খুন
কার সঙ্গে উড়ে যাচ্ছি কার সঙ্গে দিন
রক্ত জলে ভিজে আছে আমারই আস্তিন।

প্র ব ন্ধ

শেষের ক'দিন

সমর চক্রবর্তী

প্রথমেই মনে পড়ছে কয়েক মাস আগের একটি সন্ধ্যেবেলার কথা। ভূমেন, আমি ও স্নেহাকর তাঁর বাড়িতে শরৎ-সংখ্যা 'ময়ূখে'র জন্য কবিতা আনতে গিয়েছিলাম। কড়া নাড়াবার প্রয়োজন অবশ্য অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছে। তিনজন তাঁর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তিনি তখন শুয়ে শুয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন। আমাদের শব্দ পেয়ে বিছানায় উঠে বসে ভেতরে আসতে বল্লেন ইশারায়। কোমল স্পর্শের মতো শরীরে অনুভব করলাম জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি। ঘরটা ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, একটু বেশিরকম ভাবেই গোছালো। যতদূর মনে পড়ে বইয়ের কোনও শেল্‌ফ্‌ ছিল না। মেঝের উপর খবরের কাগজ পেতে তার উপর বইগুলো ছিল, অসংখ্য বই, কিন্তু এলোমেলো ভাবে নয়। ফ্যাকাসে লাল রঙের দেয়াল, তাতে কোনও ছবি ছিল বলে মনে পড়ে না। পায়ের দিকে একটা ক্যালেন্ডার, কচি ডালে কয়েকটি পাটল পাতা, দুটি পাখি মুখোমুখি বসে আছে। খাট থেকে মেঝেয় নেমে এলেন, চোখদুটো ঈষৎ রক্তাভ, একটু বে-টাল, মৃদু কৌতুক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে মাঝে মাঝে। অনেককথার পর আসল কথা, আর আসল কথা মানেই তো কবিতা। সবকথা মনে করতে পারছি নে, কী একটা কথায় তিনি বলেছিলেন, 'গালাগালি করলে ভয় পাওয়ার কী আছে, আমি কি কম গালাগালি খেয়েছি। ও-সবে ঘাবড়ে যেয়ো না। আর আমার জন্যে কিন্তু একটা বাড়ি দেখবে।' কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার ললিত আলাপ। জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ কবিতাটি সেদিনই তিনি দিয়েছিলেন।

এমন একটি দুর্ঘটনার জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। দুর্ঘটনার দিনই খবর পেয়েছিলাম একজন বন্ধুর কাছ থেকে। কিন্তু ততটা গুরুত্ব দেইনি। তবুও ভূমেন যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, আগে তার কাছেই গেলাম, কারণ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে থাকলে, দেখাশোনার সুবিধে হবে। ইমারজেন্সিতে খোঁজ নিয়ে জানলাম সেখানে তাঁকে আনা হয়নি। সেদিন কি তার পরের দিন রাত্রিতে এসে ভূমেন জানাল যে, 'পূর্বাশা'-অফিস থেকে খবর এসেছে—কবি জীবনানন্দ গুরুতরভাবে আহত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে আছেন, আমরা যেন তাঁর সেবা শুশ্রূষার ব্যাপারে সাহায্য করি।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল থেকে 'ময়ূখে'র অফিস বেশ কাছেই। আমরা ঠিক করে নিলাম এখান থেকেই কে কখন সেবা করতে যাবে তা ঠিক করব। ভূমেনের ওপর ভার পড়ল ডাক্তারি-পড়া ছাত্রের জোগাড় করা। এ প্রসঙ্গে দিলীপ মজুমদারের নাম আগে উল্লেখ করতে হয়। এর আগে তাঁর কথায় কবি ও কবিতার ওপর কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ব্যঙ্গের আভাস পাওয়া যেত। কিন্তু আশ্চর্য, ভূমেন যখন তাঁকে রাত্রি জেগে সেবা করার জন্যে অনুরোধ করল, তখন তিনি সুহৃদের মতো এগিয়ে এসে রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র থেকে সেবা করেছেন। শেষের দিনে সুজিত ধর-ও সেবায় কম আন্তরিকতার পরিচয় দেননি। মনে করেছিলাম কবিকে নিশ্চয়ই অন্তত কেবিনে রাখা হয়েছে, কিন্তু তা হয়নি। অবশ্য তার জন্যে কোনও অনুশোচনা করা মূর্খতা। জীবিত অবস্থায় না খেয়ে মরে গেলেও, বাংলাদেশের কবিদের একমাত্র সান্ত্বনা, বোধ হয়, মরলে তাঁর চিতায় মঠ দেওয়া হবে, এই আশাটুকু। সৌভাগ্য এই, মৃত্যুর পর কবিকে তা আর দেখতে হয় না, তাঁর অনেক আশার মতো শেষ আশাটিও কী নিদারুণভাবে ব্যর্থ! শুনেছিলাম বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে একবার দেখতে এসেছিলেন। তার পরেই সাদা কাপড়ের আবরণ দিয়ে যত্ন নেওয়ার একটি মিথ্যে কুয়াশার সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদিও এর আগেই, বোধ হয়, অধিক যত্ন নেওয়ার ফলে তাঁর বুকে ঠান্ডা বসে গিয়েছিল, যার জন্যে মৃত্যু আরেকটি প্রাণ উপহার পেল। একই ঘরে পুলিশ কেসের রুগি আর কবি জীবনানন্দ। তারপর আবার প্রহরারত বেহারী শাস্ত্রীর খৈনি টিপতে টিপতে মৃদু স্বরে সম্মিলিত ঐকতান সংগীত! বেদনায় আমরা এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম যে, এই সমস্ত ছোটখাট বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার মতো মানসিক অবস্থা আমাদের ছিল না। সেই গাঢ় বেদনার উপশমের জন্যে আমরা মৃত্যুর আগেই শোকোচ্ছ্বাস লিখতে বসে গেছি। কিম্বা এমন একটি বক্তৃতার খসড়া করতে বসে গেছি যার জন্যে স্মৃতি-বাসর থেকে নিমন্ত্রিত অতিথিকে মুখ কালো করে চলে যেতে হয়। সিস্টার শান্তি দেবী ব্যর্থ হলেন তাঁকে আন্তরিকভাবে সেবা করে। তাঁর সেবা, তাঁর অশ্রু, তাঁর বিনিদ্র রাত্রির প্রতীক্ষা, কিছুই রক্ষা করতে পারল না কবি জীবনানন্দের প্রাণ। পরে, না হয় শোকসভার শেষে আমরা দীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহার টানতে পারব এই কথা বলে—'tis Death is dead, not he।

ভোর হয়ে এসেছে। আকাশের রঙ জীবনানন্দের পায়ের ব্যান্ডেজের মতো কালচে লাল। নষ্ট, মৃত চাঁদকে কে যেন দিনের সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছে। শুকতারার প্রদীপ জ্বলছে কার হাতে?

সারারাত অসহ্য আর্ত চিৎকারের পর অসীম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল এগারো নম্বর বেডের আগুনে-পোড়া লোকটি। বিছানার একপাশে দাঁড়িয়ে কবির দিকে তাকিয়ে ছিলেন দিলীপবাবু। হঠাৎ চোখের পাতা দুটো একটু কেঁপে কেঁপে উঠে খুলে গেল, এক আর্ত অসহায় দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করলেন : 'এখন ক'টা বাজে?'

'ভোর পাঁচটা।'

চোখের পাতা দুটোকে বন্ধ করে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন : 'লিখে রাখো আজকের তারিখটিকে,আজ থেকে গত এক বৎসর খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এখন ভোর না সন্ধে? আমি কী দেখতে পাচ্ছি জানো? 'বনলতা সেন'-এর পাণ্ডুলিপির রঙ।'

আরো একদিন; সেদিন কিছুটা ভাল ছিলেন। ডাক্তারেরা আশা করেছিলেন, আর কিছুদিন যদি এ-রকম অবস্থা থাকে তবে বেঁচে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা। সেই দিন রাত বারোটা-একটার মতো হবে, কবি মাঝে মাঝে চোখ মেলছিলেন, ক্লান্ত, উদাস। মাঝে মাঝে হাত টেনে নিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন, কখনো হাতটাকে টেনে নিচ্ছেন গালের ওপর। আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন : 'আচ্ছা, আমাকে তে'তলায় নিয়ে যেতে পারো? আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কবিতা বলব, আমার যে রেডিয়ো প্রোগ্রাম আছে।'

এর আগে দু'দিন পর পর নিদ্রাহীন রাত জেগেছে ভূমেন। সেই রাত সুজিতবাবুর। দিলীপবাবুর থাকার কথা নয়;অথচ কখন যে আশ্চর্য এমনও হয়—দিলীপবাবু ছুটে চলে এসেছেন। মৃত্যু তার সব আয়োজন পূর্ণ করে এনেছে, এবং প্রগাঢ় শূন্যতা, এক অন্তহীন মুখর মৌনতা। আমাদের দিদি সুচরিতা দাশ —জীবনানন্দের ছোট বোন—অসহ্য বেদনার ভারে অবসন্ন, ক্লান্ত; তাকিয়ে আছেন অনিমেষ দৃষ্টিতে যেন সব শেষের যে কথাটি থরো-থরো করে কেঁপে উঠবে কবির চোখে তাকে ধরে রাখবেন হৃদয়ের অন্তর্লোকে। 'এই সময় ভূমেন যদি থাকত!', বলল স্নেহাকর। কিন্তু খবর দেবে কে? এই চরম মুহূর্তের পর বেদনাটুকু বুক ভরে নিতে হবে বলে সবাই উৎকণ্ঠিত! যে যাবে তার তো এই বেদনার সান্ত্বনা না-ও থাকতে পারে। তবুও দেখা মেলে একটি বন্ধুর। সে প্রতাপ গোস্বামী— 'ময়ূখে'র সুখদুঃখের সহচর। 'ময়ূখে'র যারা কাছে তারা কেউই দূর নয় তার হৃদয় থেকে। তাই ডেকে নিতে হয়নি, সে নিজেই প্রতিটি রাতে এসেছে সময় মতো। কেউ যাবে না তাই প্রতাপ ছুটে গেল কলেজ স্ট্রিটে, ভূমেনের কাছে।

সন্ধ্যেবেলায় যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে এখন নেই অনেকেই। শুধু একটি নিবিড় ছোট ভিড় রয়ে গেছে দরজায়; সবাই মিলে যেন একটি উৎকণ্ঠার শিখা। এখন শুধু অন্তহীন অন্ধকার লগ্নের প্রতীক্ষায় থাকা। মনে মনে বলি, শেষহীন হোক এই অতন্দ্র জাগার ব্যথার কান্নার রাত্রি। ক'টা বেজেছে বুঝতে পারি না—জানি না কখন যে অন্তহীন প্রেমে কবি নেমে পড়েছেন নীরবতার প্রগাঢ়তায়। শুধু দেখলাম শুধু শুনলাম সিস্টার শান্তি দেবীর চোখে অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি পবিত্র ঘণ্টার মতো কেঁপে কেঁপে উঠছে। এগারোটা পঁয়ত্রিশ। সবাই স্তব্ধ। কান্না চাপবার একটি ব্যর্থ প্রয়াস। দিদি কাঁদছেন। চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কবিতা বলার সাধ। পাণ্ডুলিপির রঙ মুছে গেল জীবনানন্দের চোখ থেকে। কথা বলে না কেউ। এক মহাসমুদ্রের সঙ্গমে তীর্থযাত্রীর মতো সবাই প্রার্থনায় অবনত। সিঁড়িতে দ্রুত পদক্ষেপ। হাওয়ায় আকুলতার আর্তনাদের স্পন্দন। স্তব্ধতা দুলে দুলে ওঠে। আমরা তাকালাম। ভূমেন আর প্রতাপ।

সমস্ত ব্যবস্থা করে কবিকে নিয়ে যেতে অনেক রাত হয়ে গেল। মোটরের মধ্যে কবিকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। 'পূর্বাশা'র সত্যপ্রসন্ন দত্ত ও 'চতুরঙ্গে'র মানিক মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। এলগিন রোড ধরে ল্যান্সডাউনে গিয়ে গাড়ি পড়েছে। গভীর রাত্রি। মহানগরী ঘুমে অচেতন। সারিসারি দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়া গাছ চোখ মেলে দেখছে এই মহাযাত্রা। আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই রাত। মেঘের স্তূপ আকাশের বুক চেপে ধরেছে। গ্যাসের আলো মিটমিট করে জ্বলে সৃষ্টি করেছে এক স্বপ্নময় কুহক। বিশাল রাস্তা মৃত অজগরের মতো শুয়ে আছে। গাড়ি চলেছে এর ওপর দিয়ে। নিবিড় নির্জন রাস্তা। কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ। সর্বাঙ্গে বৈধব্যের শ্বেত আভরণ। অপরিসীম ব্যথায় গাছের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। আকাশে অসংখ্য মৃত তারাদের মিছিল। যে নক্ষত্রেরা হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে। মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে যেতে যেতে স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের মুখর ভাষা মূক সংগীতের রাগিণীর মতো নিবিড় নীরবতায় প্রবহমান। সময়ের ক্লেদাক্ত নরককুণ্ডে ফেলে আমরা তোমাকে হনন করেছি—বরণ করব তোমাকে—হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, কিম্বা ভিজে মেঘের দুপুরে ধানসিড়ি নদীটির পাশে। শান্ততা ও নীরবতার ওড়না ঢাকা রাস্তা শেষ হয়েছে। গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। দোতলার একটা ঘরে কবিকে শুইয়ে রেখে আমরা চলে এলাম।

পরদিন সকালবেলায় গিয়েছি। কবির কবি-বন্ধুরা সবাই এসেছেন। 'কল্লোল'-যুগে দুর্বার প্রাণ-প্রাচুর্যে যিনি ছিলেন উচ্ছল, সুখদুঃখের দোলায় যিনি দীর্ঘদিন জীবনানন্দের সঙ্গে এক পথে হেঁটেছেন, আজকের এই শোকশুভ্র শেষের দিনেও সেই বান্ধব উপস্থিত। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি গভীর নিদ্রার কোলে সমাহিত। 'অমাবস্যা'র কবি অচিন্ত্যকুমারের অন্তরও বুঝি অন্তহীন অমাবস্যায় আচ্ছন্ন। বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আরো অনেকে এসেছেন, আর এসেছেন সজনীকান্ত, মৃত্যুতে প্রেমের সেতুবন্ধন হয়ে গেল। জীবনানন্দের সঙ্গে সজনীকান্ত। তরুণ-কবিরা জমে আছেন সিঁড়িতে। বেদনায় এলোমেলো। সবার মুখ বেদনায় পাণ্ডুর। পরিচিত-অপরিচিত অনেকে চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। একটি শোকশ্রীময়ী মেয়ে অস্থির পায়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীর কান্না তার দুই চোখে জমা, কিন্তু গলে পড়ল না এক ফোঁটা।

উত্তরসূরীরা খাট তোলার সঙ্গে সঙ্গেই যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চললেন আমাদের সঙ্গে শ্মশানে। চিতার ওপর অনেকে ছড়িয়ে দিল ফুলের মালা, কেউ জ্বালালে ধূপকাঠি। সুদূর বজবজ থেকে ছুটে এসেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জনগণের কবি শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করতে এসেছেন হেমন্তের কবির শেষের দিনে।

(পুনর্মুদ্রিত)

লেখাটির সময়কাল ১৯৫৪-৫৫

ভাঙা মনের গান ‘ফিরে এসো, চাকা’

তাপস বিশ্বাস

‘ব্রেক আপ। ভাঙন। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। সব ভাঙনের শব্দ হয় না। মন ভাঙার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। মন ভাঙলে, সম্পর্ক ভাঙলে তার রেশ অনেকদিন চলে, থেকে যায়...’

আকাশবাণী কোলকাতার এফ এম প্রচার তরঙ্গের ‘আজ রাতে’ অনুষ্ঠান শুরু করেছিলাম এই কথাগুলো বলে, আর আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করছিলাম সম্পর্কের ওই শূন্যতায় কবি বিনয় মজুমদার ঢুকে পড়ছিলেন, ঢুকে পড়ছিলেন তাঁর সম্পূর্ণ জীবন নিয়ে, কবিতা নিয়ে। ভাঙন যেভাবেই আসুক না কেন—একটা শূন্যতা তো তৈরি হয় মনের মধ্যে! সব শূন্য শূন্য লাগে! মনে হয় পায়ের তলার মাটি সরে গেল। ওলোট-পালোট হয়ে গেল সব। তখন এই ভাঙা মনে ঢুকে পড়েন কবি, তাঁর স্বর শোনা যায়, উচ্চকিত নয় এই স্বর, আত্মগত, অন্তরঙ্গ স্বর, নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা, নিজের মনে হিসেব মেলাতে থাকা, নিজেকে বোঝানো।

‘অনেক ভেবেছি আমি, অনেক ছোবল নিয়ে প্রাণে
জেনেছি বিদীর্ণ হওয়া কাকে বলে, কাকে বলে নীল—
আকাশের, হৃদয়ের; কাকে বলে নির্বিকার পাখি।
অথবা ফড়িং তার স্বচ্ছ ডানা মেলে উড়ে যায়।
উড়ে যায়, শ্বাস ফেলে যুবকের প্রাণের উপরে।
আমি রোগে মুগ্ধ হয়ে দৃশ্য দেখি, দেখি জানালায়
আকাশের লালা ঝরে বাতাসের আশ্রয়ে আশ্রয়ে।’

(ফিরে এসো, চাকা-র ৭০ নম্বর কবিতার অংশ। লেখা হয় ৭ জুন ১৯৬২)

নিসর্গ, প্রকৃতির কোমল আশ্রয়ে, বোধে, ছোবলের উপশম চায় যে মন, বিদীর্ণ হৃদয়ের নীল আকাশে মিল খুঁজে পায় যে মন, শিল্পী দালির ঘড়ি যেমন গলে গলে পড়ে, যেন সময় গলে পড়ে। রোগে মুগ্ধ যুবক জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে আকাশের লালা ঝরে বাতাসের আশ্রয়ে আশ্রয়ে। ছেঁড়া খোঁড়া মন নিয়ে যুবক নিজের ভিতর পর্যন্ত দেখতে পায়, মনের ক্ষত দেখতে পায়—

‘যাক, তবে জ্ব’লে যাক, জলস্তম্ভ, ছেঁড়া ঘা হৃদয়।
সব শান্তি দূরে থাক, সব তৃপ্তি, সব ভুলে যাই।
শুধু তার যন্ত্রণায় ভরে থাক হৃদয় শরীর।
তার তরণীর মতো দীর্ঘ চোখে ছিল সাগরের
গভীর আহ্বান, ছায়া, মেঘ, ঝঞ্ঝা, আকাশ, বাতাস।’

(ফিরে এসো, চাকা-র ৭৩ নম্বর কবিতার অংশ। লেখা হয় ২২ জুন ১৯৬২)

‘কবিকে খুঁজো না তাঁর জীবন চরিতে’ এই আপ্তবাক্যটিকে কাব্য পাঠকেরা বিশ্বাস করি না, মানি না। কবিতার প্রতিটি লাইন, শব্দে খুঁজে দেখি কবিকে, দুটো শব্দের মাঝের ফাঁকে, শূন্যতায়ও কবিকে খুঁজি। ১৯৬২ সালে ‘ফিরে এসো, চাকা’ যখন প্রকাশিত হয় কবির বয়স তখন ২৮ বছর, প্রকাশের পরে কবির চারপাশ, মনোভাব এবং চিন্তার পরিসরে ঢুকে পড়তে ইচ্ছে হয়। কবিতার সেই ‘যুবক’ বিনয় মজুমদার বলে বিশ্বাস করি। তাঁর যন্ত্রণায় ভরে থাকা হৃদয়ে কে রয়েছেন? কে ছিলেন তখন?

‘বাতাস আমার কাছে আবেগের মথিত প্রতীক,
জ্যোৎস্না মানে হৃদয়ের দ্যুতি, প্রেম; মেঘ-শরীরের
কামনার বাষ্পপুঞ্জ, মুকুর, আকাশ, সরোবর,
সাগর, কুসুম, তারা, অঙ্গুরীয়—এ সকল তুমি।
তোমাকে সর্বত্র দেখি;...’

(ফিরে এসো, চাকা-র ৫৮ নম্বর কবিতার অংশ। লেখা হয় ১৭ এপ্রিল ১৯৬২)

প্রেম প্রেম চূড়ান্ত প্রেম? কার প্রতি? নায়িকা কে? প্রেম কি একতরফা? একমুখী? পাঠক, এইখানে দীর্ঘ দীর্ঘ নীরবতা! তারপর একটি তথ্য যোগ করতে চাই।

লিপি চক্রবর্তী ও চন্দন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘গ্রন্থি’ বৈশাখ ১৪১২ (মে ২০০৫) শিল্প আলোচনা সংখ্যায় বিনয় মজুমদারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—“...আপনি বলেছিলেন ‘ফিরে এসো, চাকা’-তে একটি কেন্দ্রীয় ভাবনা গেছে। সে কি প্রেম, যার অপর নাম গায়ত্রী চক্রবর্তী? কীভাবে তার প্রতি মনোযোগী হলেন?”

উত্তরে বিনয় মজুমদার বলেছেন—“আরে, আমি তো ছিলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। তা সেখান থেকে হলাম মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। আর গায়ত্রী প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরাজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। এই কথা যেই জানলাম, ওমনি মনে হল, এ মেয়েও তো আমার মতো ডুবে যাবে, কেননা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার পর আমার পতন হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে কবিতার বইটি লিখে ফেললাম : ‘একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে’ মানে একবার ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েই ‘দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে পুনরায় ডুবে গেল...”।

কবির এই কথাগুলোর পাশে আরও একটি প্রকাশিত প্রসঙ্গ রাখতে চাই। বিনয় মজুমদারের সান্নিধ্যধন্য বিপ্লব চন্দ কবি শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে। অনেক কথার মধ্যে বিনয় মজুমদার ও গায়ত্রী চক্রবর্তীকে নিয়ে কথা হচ্ছে। শঙ্খ ঘোষ বিপ্লব চন্দকে বললেন—''আমি যেবার আমেরিকায় গিয়েছিলাম সেখানে বিশ্বের সেরা দার্শনিক দেরিদার (নোবেলজয়ী) সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্তা উচ্চশিক্ষিতা গায়ত্রী চক্রবর্তীর সাথে দেখা। কলকাতা থেকে বিনয়ের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দেবকুমার বসুর 'বিশ্বজ্ঞান' প্রকাশনা থেকে 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থটি বেরিয়েছে। উৎসর্গ করেছে গায়ত্রীকে। গায়ত্রীকে আমি চিনতাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজি বিভাগের ছাত্রী। সেই গায়ত্রীকে নিয়ে বিনয়ের বন্ধুরা নানারকম গল্পকথা শোনাতেন, এতে বিনয়ের গায়ত্রীর উপর দুর্বলতা বেড়ে গিয়েছিল অথচ গায়ত্রী বিনয়কে চিনতই না। এটা জানলাম আমি আমেরিকায় গিয়ে। বিনয় গায়ত্রীকে উৎসর্গ করেছে তাঁর বই। আমেরিকায় গায়ত্রীর সাথে দেখা হবে ভেবে কলকাতা থেকে আমি বিনয়ের 'ফিরে এসো, চাকা' নিয়ে গিয়েছিলাম। গায়ত্রীকে চমকে দেব বলে। 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থটি গায়ত্রীর হাতে দিয়ে বললাম—এই বইটি কবি বিনয় মজুমদার তোমাকে উৎসর্গ করেছে। বইটি হাতে পেয়ে গায়ত্রী'র যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছিল—ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে কষ্টসাধ্য।''

বিপ্লব চন্দ লিখেছেন, ''গায়ত্রী নাকি বলেছিল—আমাকে ভালোবেসে একজন কবি তাঁর জীবন ও মন সমর্পিত করল —অথচ আমি জানতে পারলাম না। এসব বেদনা ও মর্মাঘাতের ব্যথা আমাকে নতুন করে অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দিল। 'কেন আপনারা সে সময় আমাকে জানালেন না—একজন কবি আমাকে ভালোবেসে তার সমস্ত হৃদয়ের অর্ঘ্য সঁপে দিয়েছিল।' যাই হোক কবিতার মধ্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখল যে কবি—তাঁর জন্য যদি কোনওদিন সামান্য সেবা করার সুযোগ পাই—দূর থেকে হোক আর কাছাকাছি পৌঁছে হোক, সেইদিনের অপেক্ষায় থাকব।''

বিনয়ের প্রিয় পয়ার ছন্দ, ১৯৬০ থেকে '৯৫ পর্যন্ত একটানা পয়ারেই লিখে গেছেন, তবে তাঁর পয়ার একদমই নিজস্ব। সংস্কৃত পয়ার থেকে আলাদা, এমনকী মেঘদূতের মন্দাক্রান্তাও নয়, ছন্দটাকে ভেঙে এমন বানালেন তিনি যে, পয়ার ছন্দটা তাঁর হাতে মিঠে হয়ে উঠল। বিনয় মজুমদার নিজেই বলেছেন, ''ফিরে এসো, চাকা'র সব কবিতা একরকম পদ্ধতিতে লেখা। একই ফর্মে, একই আঙ্গিকে, এক ভঙ্গিতে।'' বলতেন, ''আমার বই মোটে একখানা। ঐ ফিরে এসো, চাকা। ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াৎ' যেমন, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'।'' নির্মোহ দৃষ্টিতে অন্যসব লেখাকে প্রায় নাকচ করে দিয়েছেন তিনি। ''ঐ ফিরে এসো, চাকাটা হয়েছে। এরপরে যে ক'খানা বই লেখা হয়েছে সেগুলো আমার নিজেরই পছন্দ হয়নি।'' এরপর থেকে তাঁর জীবনটা এলোমেলো, উদ্ভট হয়ে গেল।

আমরা যারা অনেক ছোট, অস্তমিত বিনয়ের ছ্যাঁকা খেয়েছি আর ভেবেছি গনগনে বিনয়ের তাপ না মেখে ভালোই হয়েছে! চোখ ঝলসে যাওয়ার ভয় ছিল। বারবার কবিতা পাঠে বিনয়ের মন খুঁজতে গিয়ে দেখেছি তাঁর মন ভরে আছে অফুরন্ত প্রেমে। 'কবিতা লিখেছি কবে, দু-জনে চকিত চেতনায়।' নিজেকেই উদ্দেশ্য করে বলা এই কথাগুলো? বাংলাদেশের 'লোক' পত্রিকার সম্পাদক অনিকেত শামীমের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিনয় বলেছেন—''আমি যখন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে ছিলাম তখন গায়ত্রীর বাবা ছিলেন সুপারিনটেনডেন্ট, ... তখন ওর বয়স বছর ১২। তখন থেকে দেখেছি। পুরোহিতের মেয়ে তো। বেশি কথাবার্তা হয়নি। আলাপ-আলোচনা হতো। কবিতা নিয়ে। 'কবিতা লিখেছি কবে, দু-জনে চকিত চেতনায়।'—এবার বুঝলে তো! তারপর ভালো ছাত্রী হওয়ার ফলে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ২৩ বছর বয়সে আমেরিকায় চলে গেলো। আমি তিনটি বই তাকে উৎসর্গ করেছি।''

''বিনয় গায়ত্রী চক্রবর্তীকে ভালোবেসেছিলেন প্রবলভাবে। গায়ত্রী বিদেশে চলে যান। চক্রবর্তীর 'চক্র' শব্দটির অর্থ যে চাকা তা আমরা সবাই জানি। তাই ফিরে এসো, চাকা গায়ত্রী ফিরে এসো শব্দগুচ্ছেরই অপর নাম তা বুঝতে কষ্ট হয় না।''—অনুভব করেছেন এবং লিখেছেন শামসুর রহমান। এইসব প্রকাশিত তথ্য যখন মেধার মধ্যে ঘাই মারে, পরস্পর বিরোধী মনে হয়, তখন সত্যিই আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়। পাঠক এই তথ্য যাচাইয়ের পথে আর হাঁটাহাটি না করে আমরা বরং ঢুকে পড়ি রহস্যময় মনের আলোআঁধারিতে। কবিকে যতই প্রশ্ন করে তাঁর ভাবনা ও মনের কথা জানতে চাওয়া হোক না কেন, কবি কি তাঁর মনের স-অ-ব কথা বলেন? বলেন—তবে রহস্যও রাখেন।

'আমাকে তারারা বলে 'বিনয়দা, বেদনা ভুলুন,
প্রেম হল নুন।'
(কবিতা—বৃহৎ হীরক)

এই রহস্য বড় ভয়ানক। পাঠক সারাজীবন রহস্যের গোলক ধাঁধায় ঘুরতে থাকেন! কবির মনের তল খুঁজতে থাকেন।

'এরূপ বিরহ ভালো; কবিতার প্রথম পাঠের
পরবর্তী কাল যদি নিদ্রিতের মতো থাকা যায়,
স্বপ্নাচ্ছন্ন, কাল্পনিক; দীর্ঘকাল পরে পুনরায়
পাঠের সময়ে যদি শাশ্বত ফুলের মতো স্মিত,
রূপ, ঘ্রাণ ঝরে পড়ে তাহলে সার্থক সব ব্যথা,
সকল বিরহ, স্বপ্ন;'

(ফিরে এসো, চাকা-র ৬৪ নম্বর কবিতার অংশ। লেখা হয় ৯ মে ১৯৬২)

কবি বিরহ ব্যথা নিয়ে জীবনভর অপেক্ষা করেছেন। স্বপ্নাচ্ছন্ন, কাল্পনিক। আমরাও স্বপ্নাচ্ছন্ন। প্রথম মিলনকালে ছেঁড়াত্বকের জ্বালার মতো গোপন ও মধুর বেদনা নিয়ে বসে থেকে খবর পেয়েছেন, খবর রেখেছেন। গায়ত্রী চক্রবর্তী দেশে যখন এসেছেন আমরা দেখেছি খবরের কাগজের পাতায় তাঁর ছবি, তাঁকে নিয়ে খবর। বিনয় মজুমদারও খবরের কাগজে দেখেছেন, পড়েছেন তাঁকে। তিনি খবরের কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন, এটা তাঁর রুটিনের মধ্যেই ছিল। ঠাকুরনগর স্টেশনে

অনেকটা সময় কাটত বিনয়ের। তাই তো সহজেই বলতে পারতেন, 'আমেরিকায় গিয়ে এক কৃষ্ণাঙ্গকে বিয়ে করল। ছেলে-পুলে হয়েছে। এখন একদম বুড়ি হয়ে গেছে। চুল কেটেছে। আমার চুল দেখছ—এর চেয়েও ছোট, কদম ফুলের মতো।' নির্মম রসিকতা, পাঠক এইখানে শব্দের বদলে দু'এক ফোঁটা অশ্রু প্রয়োজন। আর প্রয়োজন কবিকে আরও একটু বোঝা। তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে। অনেক পরে, ১৯৯১-৯২ সালের সময়কালে লেখা, যোগসূত্র জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত বিনয় মজুমদারের অনেকগুলো (আঠাশটি) কবিতার মধ্যে 'বৃহৎ হীরক' কবিতায় কবি বলেছেন—

'তার যোগ্য আমিই তো তখনি ছিলাম।
সেই কথা বোঝেনি সে, কী আশ্চর্য, একথা বোঝাতে
বুড়ো হয়ে গেছি।
বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি, আমি তো ফোকটে।
মনে তবু ব্যথা বাজে, কী যে হতে পারত যদি সে
টের পেত গুণাবলী এবং ক্ষমতাবলী আর ভবিষ্যৎ
সে কি বেছে নিত এই পথ?'

আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী আজ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক।

'ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?
লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝ'রে যায়—
হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, স্মৃতি, অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।
এ আমার অভিজ্ঞতা। ...
প্রাচীন চিত্রের মতো চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তুমি
চ'লে যাবে; ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হবো আমি।'

(ফিরে এসো, চাকা-র ৬৫ নম্বর কবিতার অংশ। লেখা হয় ১৮ মে ১৯৬২)

কবির ভালোবাসার নানারকম প্রকাশ আমরা দেখেছি, বলতে ইচ্ছে হয়, 'এভাবেও ভালোবাসা যায়।' ভালোবাসার এই রকম দেখে, এই প্রকাশ দেখে গায়ত্রীর অভিব্যক্তি কবি শঙ্খ ঘোষও তাই ভাষায় বর্ণনা করতে পারেননি। তবে আবহমান বাংলা কবিতার পাঠক হিসাবে বিনয়ের সঙ্গে একটি নিবেদন রাখতে চাই কবির মানসীর কাছে, বলতে চাই সময় ফুরিয়ে যায়নি। 'তাঁর জন্য যদি কোনওদিন সামান্য সেবা করার সুযোগ পাই—দূর থেকে হোক আর কাছাকাছি পৌঁছে হোক। সেইদিনের অপেক্ষায় থাকব।' —বলেছিলেন গায়ত্রী চক্রবর্তী, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, চাকা...।

'ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন
সুর হয়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।'

(ফিরে এসো, চাকা-র ৭০ নম্বর কবিতার অংশ। লেখা হয় ৭ জুন ১৯৬২)

এমন তীব্রভাবে, আগ্নেয়গিরির লাভা উদগীরণের মতো, নিজের ভিতর বাহির পুড়িয়ে ফেলা কামনার কাছে, ইচ্ছের কাছে ফিরে আসা যায়, ফিরে আসতে হয়, সর্বোচ্চ শুদ্ধতার কাছে, কবিতার কাছে।

বিনয় মজুমদারের সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি গায়ত্রী যদি সারা পৃথিবীর গভীর, মগ্ন, প্রাজ্ঞ কবিতা পাঠকের কাছে নির্বাচিত অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছে দেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ মৌলিক গদ্যগুলোকে তুলে ধরেন, জাগরুক রাখেন; তাহলে সেই কাঙ্ক্ষিত 'বিশুদ্ধ দেশে গান... প্রেম... অবয়বহীন সুর...' হওয়া হবে, পৃথিবীর সকল আকাশে। পৃথিবীর সকল পাঠকের কাছে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এই কাজটি ভীষণভাবে পারেন। তাহলে কাব্যভুবনে সেটাও হবে অন্যরকম! পৃথিবীতে যা কখনো হয়নি। জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন, সুরঞ্জনার পক্ষে কবিকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না, তবে এখানে কবির ইচ্ছাকে মূল্য দিয়ে হয়তো চাকা ফিরে আসবেন, চাকা ফিরিয়ে দেবেন। কোনও এক বিশেষ নারীর জন্য কামনা যেমন 'ফিরে এসো, চাকা'-য় সব মানুষের স্পর্শাতীত কোনও অস্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হবার তৃষ্ণায় পরিণত হয়েছে। বিশুদ্ধ অনুভব হয়ে উঠেছে। তেমনি কবিতাই সব কিছু মিলিয়ে দেবে। কবি এবং তাঁর চাকাকে। বিনয় মজুমদার এবং গায়ত্রী চক্রবর্তীকে। কবিতার চিরবিশুদ্ধ দেশে।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

অলঙ্কার শিল্পালয়

২২/২২ ক্যারেট সোনার গহনা, হায়দ্রাবাদের মুক্তোর সেটের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
Oriflame-এর সমস্ত প্রোডাক্ট পাওয়া যায়
হীরামহল লেন ● বনগ্রাম ● উত্তর ২৪ পরগনা
মোবাইল : ৯৪৭৪০৬১২৪৮
৮০০১০১১৯০৩

শারদ শুভেচ্ছায়

হবি সেন্টার (HOBBY CENTRE)

● বল, ব্যাট, বুট, বেল্ট, ট্রফি, ক্যারিব্যাগ ও মানিব্যাগ
● আনন্দবাজার, এবেলা ও The Telegraph পত্রিকার
বিজ্ঞাপন সংগ্রহকেন্দ্র

কোর্ট রোড ● বনগাঁ ● উত্তর ২৪ পরগনা
মোবাইল ঃ ৯১৫৩৯২৮৭৩৬, ৯১৫৩৬৪৯২৬১
৮৬৭০৬৬৫১৭১
e-mail : hobbycentrebongaon@gmail.com

স্বেচ্ছামৃত্যুর রহস্যধূসর মিউজিকরুম

গৌতম গুহরায়

লেখক যখন সৃষ্টির উন্মাদনায় মত্ত হয়ে ওঠেন তখন তাঁর ভেতরে শুরু হয় এক হননপ্রক্রিয়া। নিজেকেই হনন করে চলেন, দেহে নয় মনে,গভীরে। এই হনন প্রক্রিয়ায় কখনও কখনও সে বেছে নয় মৃত্যুকেও। এই আত্মহনন প্রবণতা আমাদের বিমূঢ় করে, এক সমাধানহীন চৌরাস্তায় এনে দাঁড় করায়। আত্মহত্যার দার্শনিক বা চিকিৎসাগত ব্যাখ্যা আমাদের এক অসহ্য বিমূঢ় ধন্দে নিয়ে যায়। ফ্রয়েডের মতে মানুষ মরে কারণ সে মরবার ইচ্ছা পোষণ করে তাই। কবিদের মধ্যে, কথাকারদের মধ্যে স্বেচ্ছামৃত্যুর যে দীর্ঘ ছায়ামিছিল তা যুক্তি বা ব্যাখ্যার অতীত। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ মনে করতেন মৃত্যু জীবনের চূড়ান্ত মহিমা, এই চূড়ান্ত মহিমায় নিজেই আত্মসমর্পণকারী কবি- সাহিত্যিকদের অধিকাংশই কোনো তাৎক্ষণিকতা আক্রান্ত ছিলেন না। যাপন কথার তানা-বানাতে এই প্রবণতার বীজ বারংবার নড়ে চড়ে বসেছে, অবশেষে প্রকাশ পেয়েছে। কেন আত্মহননের এই ধূসর পথে পাড়ি দেন কবি? এর কোনো সমাধান নেই, আঁতোয়া আর্তো এর বিপরীত বিন্দু থেকে লেখেন, ''আত্মহত্যা স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি সম্পন্ন মানুষদের এক সুদূর বিজয় কাহিনী এবং এক উপকথা মাত্র, এর বেশি নয়। কিন্তু অস্তিত্বের মূলাধারের এক অবস্থান হিসাবে আত্মহত্যা আমার কাছে অতিশয় দুর্বোধ্য।''

সৃষ্টিতে মাতাল যে তাঁর কাছে আত্মহত্যার কারণ অর্থনৈতিকতা সামাজিক বিধিনিষেধ ততটা নয় যতটা তাঁর আত্মার ভেতর রোপণ করা ''আরো এক বিপন্ন বিস্ময়''। প্রিমো লেভি, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, ওয়াল্টার বেঞ্জামিন, আরনেস্ট হেমিংওয়ে, সিলভিয়া প্লাথ, মায়াকোভস্কি, য়েস্যেনিন, তস্‌তেতায়েভা, হার্ট ক্রেন থেকে আমাদের উপমহাদেশের শামসের আনোয়ার, অচ্যুৎ মণ্ডল, অনাময় দত্ত, সুকোমল রায়চৌধুরী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, তাপস লায়েক, গোরখ পাণ্ডে ... আমরা এক ধারাবাহিক ধূসর শোক মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে আর কোনো উত্তর খুঁজে পাই না, শুধু সেই ধ্বনি কোথাও বাঁচতে থাকে যা ''আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে।'' জাপানিদের মধ্যে যে আত্মহত্যার সংস্কৃতির কথা মিশেল ফুকো উল্লেখ করে গেছেন সেই সংস্কৃতি সাহিত্যাকাশের নানা রঙ জুড়েই রয়েছে, অতীত ও বর্তমানের গোটা পথ জুড়ে।

মিল্টন তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে ''মৃত্যুর কোনো বিভীষিকাকে স্বীকার করে না কবিরা; তাদের কাছে মৃত্যু মৃত্যুই নয়, তা যেন এক মহাজীবনে উত্তরণ। মৃত্যু মানে জৈব অস্তিত্বের গরিমা, উচ্চস্তরে আরোহণ।'' এই উচ্চস্তরে আরোহণের নেশার ধ্বংসাত্মক সমাধান সূত্রটিকে অস্বীকার করেন আঁতোয়া আর্তো, আত্মহত্যা কি কোনো সমাধান? উত্তরে তিনি লেখেন 'না, আত্মহত্যা এখন পর্যন্ত একটা অনুমান মাত্র। আমি অবিশ্বাসী হওয়ার অধিকার দাবি করি; বাস্তবের বাদবাকি অংশ সম্পর্কে আমি যে রকম অবিশ্বাসী। এই মুহূর্তে এবং ভবিষ্যতেও একজনকে ভয়ংকরভাবে অবিশ্বাসী হতেই হয়, এবং সকলেই জানেন সে অবিশ্বাস অস্তিত্বকে নয়, বরং এক আভ্যন্তরীণ উত্তেজনাকে, বাস্তু, ক্রিয়া ও বাস্তবতার গূঢ় অনুভূতিকে। আমার চিন্তার মহাজাগতিক নাড়ি যা স্পর্শ করে না তা আমি বিশ্বাস করি না যদিও আমার মনের অনেকগুলি উল্কাপিণ্ড এখন অকেজো হয়ে পড়েছে। অন্য লোকগুলির অস্তিত্বের কালোছাপ আমাকে উত্যক্ত করে—এবং আমি সমস্ত বাস্তবকে অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে ঘৃণা করি। ... এই পৃথিবীর কোনো কিছুই আমার নয়, আমার ভিতরে কিছুই প্রবেশ করে না। বেঁচে থেকে আমি ভয়াবহভাবে কষ্ট পাচ্ছি। আমি অস্তিত্বের কোনো অবস্থাতেই পৌঁছতে পারিনি। এবং নিশ্চিতভাবেই অনেক আগে আমার মৃত্যু হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাকে আত্মহত্যা করানো হয়েছে। যে আত্মহত্যা অস্তিত্বের মূলবিন্দু থেকে এক দূরবর্তী অবস্থা, —যা আসলে আমাদেরকে মৃত্যুর কাছে নিয়ে যায় না, বরং ফিরিয়ে নিয়ে আসে অস্তিত্বের দৃষ্টিসীমার মধ্যে সেই হত একমাত্র আত্মহত্যা, যার কিছু অর্থ আছে।'' (ক্ষুধার্ত, ৩য় সংকলন, অনুবাদ : শৈলেশ্বর ঘোষ।)

সামাজিক সভ্যতার একটা অন্যতম উত্তরণের ধাপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তবায়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই স্বপ্নের অন্যতম একটা বাস্তবরূপ ছিল বিংশ শতাব্দী জুড়ে। কিন্তু রুশ সাহিত্যিকদের মধ্যে এই শতকে ক্রমাগত আত্মহত্যার প্রবণতা জেগে ওঠে। ফাদায়েভ, মায়াকোভাস্কি, যেন্যনিনের মৃত্যু, ম্যাক্সিম গোর্কিদের আত্মহননের প্রচেষ্টা তাই এই

জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়, কেন এই আত্মঘাতী প্রবণতা? 'সোভিয়েত সাহিত্যের বহু ঝড়ঝঞ্ঝার সাথী ও অন্যতম নায়ক 'ইয়ং গার্ড', আলেকজান্ডার ফাদায়েভ-এর আত্মহত্যার প্রসঙ্গে ইলিয়া এরেনবুর্গ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন—'এই ধরনের ঘটনা ঘটলে যেটা অবধারিত ভাবে সব সময়েই হয় সেই বিস্তর জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল। কেন ফাদায়েভ আত্মহত্যা করলেন— ফাদায়েভকে ঘিরে সব ভালো-মন্দ স্মরণ ও সেই নিয়ে আলোচনা। এই আত্মহত্যার কারণ নিশ্চয়ই ছিল একাধিক, ফাদায়েভ নিজেকে সারাজীবন ছেড়ে কথা বলেননি। যতদিন কঠোর শীত জেঁকে বসেছিল ফাদায়েভ লড়েছিলেন। কিন্তু মানুষ যখন আনন্দের মুখ দেখতে পেয়ে ফের মুখে হাসি পেল তখন ফাদায়েভ চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন যে কী অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে এবং তিনি কী লিখেছেন— সবকিছুই নতুন আলোতে তখন তাঁর কাছে দৃশ্যমান হয়েছিল— তখনই ইঞ্জিনটা থেমে গেল। নানা ঘটনার নানা আঘাত ইঞ্জিনগুলো থেমে যায়। নানা ইতিহাস, নানা অভিজ্ঞতার ঝঞ্ঝায়।' (ভাষাবন্ধন/৩ এপ্রিল— মে ২০০১)

১৯৩০-এর ১৪ এপ্রিল আত্মঘাতী হন মায়াকোভস্কি, বিংশ শতাব্দীর প্রথম 'ট্রাউজার পরা মেঘ', অর্থাৎ কবি যিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গী থেকে তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ও কবিতা মানুষের মিছিলে পায়ে পায়ে মিশে ছিল, কিন্তু স্বয়ং রিক্ত এই মানুষটি নিঃসঙ্গ মেঘের মতো ভেসে বেড়াল সারা জীবন, শরীর ভর ভালোবাসার জলকণাকে বৃষ্টিবিন্দু হয়ে ঝরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। প্রেমই ছিল তাঁর পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু, একে ঘিরেই আবর্তিত হত তাঁর সমাজ-স্বপ্নও। এই কেন্দ্রচ্যুতির যন্ত্রণায় তাই লিখতে হয় তাঁকে---'সমুদ্রও ফিরে যায়/সেও এখন ঘুমোতে চলল/গল্পের শেষ এখানেই মানুষ তেমনই ভাবে/ আমাদের তুচ্ছ কাজে ডুবে গেছে প্রেমের শিকারা/যাবতীয় হিসাবনিকাশ শেষে ...'।

শেষের সেদিন কী ঘটেছিল? ১৪ এপ্রিল, সকাল ৮টায় দেখা করেন প্রেমিকা পেলেনস্কায়ার সঙ্গে। কিন্তু পেলেনস্কায়ার হাতে তখন সময় খুব কম, সাড়ে দশটা থেকে নাটকের রিহার্সেল, যেতে হবে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কবি। দাবি করতে থাকেন তাঁর সঙ্গে চিরদিনের মতো থাকতে চলে আসার জন্য; থিয়েটার ছেড়ে, স্বামী ইয়ানশিনকে ছেড়ে। কিন্তু পেলেনস্কায়া রাজি হয়নি। ঘটনার ৮ বছর পরে পেলেনস্কায়া সেদিনের ঘটনার স্মৃতিচারণ করেছেন : 'আমি তাঁকে আবারও বলি, ওকে কতটা ভালোবাসি, ওর সঙ্গে থাকব। শুধু ইয়ানশিনকে একথা বলে আসব একবার। ইয়ানশিনও আমাকে ভালোবাসে, তাঁকে এভাবে ছেড়ে আসাটা সে সহ্য করতে পারবে না; তাঁকে এভাবে আঘাত দিতে আমিও পারব না। স্বামীকে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি আমি। থিয়েটার ছাড়াটাও আমার পক্ষে অসম্ভব, থিয়েটার ছাড়লে তা এক বিশাল শূন্যতার জন্ম দেবে আমার জীবনে, এটা মায়াকোভস্কি নিশ্চয়ই বুঝবেন। এই শূন্যতা অন্তরায় হয়ে উঠবে আগামীতে। ... মায়াকোভস্কি মেনে নিয়েছিলেন, তবুও চাইছিলেন একটা তাৎক্ষণিক ফয়সালার। আমিও পরিস্থিতি অনুভব করার জন্য তাঁর কাছে আকুতি করছিলাম। আবারও পূর্বের কথাই বারে বারে জিজ্ঞাসা করে ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন তিনি, ঘরের এ প্রান্ত ওপ্রান্ত দ্রুত পায়ে পায়চারি করতে থাকলেন। হঠাৎ ছুটে গেলেন ডেস্কের কাছে, কাগজপত্র হাতড়ালেন, শরীরের আড়ালে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। একটা ড্রয়ার টান দিয়ে খুললেন, আবার দ্রাম করে বন্ধ করে দিলেন। আমি জবাব জানতে চাইলাম—কী? তা হলে তুমি আমার সঙ্গে দেখাও করতে চাইছ না আর? শান্ত ও ধীর পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন, চুমু খেলেন, তারপর খুব নরম করে বললেন— 'না প্রিয়তমা আমার, তুমি যাও। আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না তোমাকে।' আবার হাসলেন—'আর কী দেব তোমাকে? ট্যাক্সিভাড়া আছে তো?' 'না'—তিনি আমাকে ২০ রুবল দিলেন। তা হলে রিং করছ আমাকে? হ্যাঁ বেরিয়ে অবশ্যই করব। আমি বেরিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়েছি কয়েক পা। একটা গুলির শব্দ। আতঙ্কে চিৎকার করে ছুটে গেলাম করিডোরের দিকে। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে ভয় হল। তারপর যখন ভেতরে ঢুকলাম, যেন একযুগ পেরিয়ে গেছে। সারা ঘরে বারুদের ধোঁয়া, কার্পেটের উপর পড়ে আছেন মায়াকোভস্কি। হাত দুটো ছড়ানো, বুকের উপর ছোট একটা রক্তের দাগ।' গুলিবিদ্ধ মায়াকোভস্কির রক্তাক্ত নিথর শরীরের জামার বুকপকেটে পাওয়া যায় একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি, তার শেষ ছত্র—

''দেখো পৃথিবী কী আশ্চর্য নীরব ঘুমোচ্ছে
আকাশের ভাণ্ডার উপচে উপহার এসেছে
অগুন্তি নক্ষত্র
ঠিক এসময় একজন দাঁড়িয়ে ওঠে, কথা বলে
সে তখন সময় ইতিহাস ও মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে''

মায়াকোভস্কির মতোই রক্ত নিশানের নীচে দাঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার স্বপ্ন দেখেছিলেন আধুনিক হিন্দি কবিতার অন্যতম স্থপতি গোরখ পান্ডে। কৃষকের কথা মজুরের কথা তাঁর কবিতায় মুখরিত। সেই গোরখ পান্ডে আদর্শের স্বপ্নভঙ্গে বেছে নেন আত্মহননের পথ। মাত্র ৪৪ বছর বয়সে, ১৯৮৯-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করেন, তখন তিনি জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ছিলেন। স্বপ্নদেখা চোখ দিয়ে তিনি স্বপ্নের জাল বুনতেন—

''এই তোমার চোখ/নাকি যন্ত্রণায় উথলে ওঠা সমুদ্র/ওই পৃথিবীটাতে যত তাড়াতাড়ি/পারা যায় /বদলে ফেলা উচিত।''

এই দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন অচ্যুত মণ্ডল। উত্তরবাংলার ছেলে, তুখর মেধাবী ছাত্র অচ্যুত ছাত্রাবস্থাতেই আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে ওঠেন। কবিতা তাঁর প্রিয়তম ক্ষেত্র হলেও ক্ষুরধার প্রবন্ধে চমকে দিয়েছিলেন পাঠকদের, অনন্য ছিল তাঁর দর্শনভঙ্গি। বাংলাভাষা তাঁর অধ্যাপনার বিষয় হলেও রুশ, ফরাসি সহ নানা ভাষা তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। দাস্তয়াভস্কির অনুরাগী অচ্যুতের একটি গল্পের নাম 'ফিওদরের সঙ্গে একঘণ্টা'।

২০১০-এর শুরুতেই হঠাৎ সব সম্ভাবনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে ঝুলে পড়লেন মৃত্যুর গভীরে। অথচ তার এতটুকু আভাসও আগাম জানান দেয়নি তাঁর আচরণ। ঘনিষ্ঠজনেরা বুঝতেই পারেনি এমন কিছু হতে যাচ্ছে, বন্ধুকে আমন্ত্রণ করেছিলেন বাড়িতে, রাতে তার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া জমজমাট আড্ডা ও হুল্লোড়ের মধ্যেই কখন যে তাঁকে 'অমোঘ নিঃসঙ্গতা' আক্রমণ করে তা টের পায়নি কেউ। মৃত্যুর কিছুদিন আগে লেখা তাঁর কবিতা—'কয়েকটি কোকিল ছিল একটি বিশুদ্ধ আমগাছে/গত বৎসরের গান এবারও বসন্তে তাই পুনঃ প্রচারিত/কতিপয় মিথ্যাভাষী কয়েকটি স্বৈরিণীর পাশে/বেড়াতে এসেছে মাঠে; লজ্জারুণ মুখে কিছু ক্ষুদ্র লাল ফোঁড়া/ফুটে উঠতে-চুক্তি করে পুরুত ও ডাক্তার/রোগীর বাড়িতে গেল ঋতুরাজ, সে কেবল 'প্রতিবিধিৎসিতে'। (বসন্ত)

আরও অনেকের মতো অচ্যুতেরও ভেতরের 'আরও এক বিপন্ন বিস্ময়' তাকে হঠাৎই টেনে নিয়ে যায় মরণের কাছে। যেভাবেই বাংলাদেশের আর এক প্রতিভাধর কথাসাহিত্যিক কায়েস আহমেদ এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। দু'জনেরই সংসারের নিকটজনরা একবারের জন্য টের পায়নি তাঁদের ভেতর কোন 'বিস্ময়' হননের আয়োজন করছে! উল্লিখিত কবি সাহিত্যিকদের মতই কায়েসও তাঁর তাজা জীবন ছুড়ে ফেলে দেন। ১৯৯১-এ সদ্য ৪৪ পেরিয়েছেন তখন। তাঁর চোখের মণির মতো ছিল ছোট্ট ফুটফুটে সন্তান অনীক। মা, ভাই, স্ত্রী, সন্তানে ভরাট সংসার। এই সব সম্পর্কের নিবিড় সখ্যকে বিস্মৃত হয়ে চলে যান আত্মহননের পথে। কোনো অভিযোগ, অভিমান কিংবা ক্ষোভের সামান্যতম চিহ্নও কোথাও রেখে যাননি কায়েস। ঘনিষ্ঠজনের কাছে তাঁর এমন করাটা অবিশ্বাস্য। ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন, রুগ্ন স্ত্রী ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনে কোনো খামতি ছিল না তাঁর। সুস্থ সৃজনশীল ও জীবনলগ্ন সাহিত্য ছিল তাঁর সৃজনবিশ্ব। জীবনের প্রতি এই 'পজিটিভ অ্যাটিটিউড'-ই তাঁর মধ্যে ক্রমশ এক শূন্যতার জন্ম দেয়। রাজনীতি, দেশ, দেশের মানুষ সমস্ত কিছুর ব্যাপারে তাঁর হতাশা প্রকাশ পাচ্ছিল। ধীরে ধীরে আলগা হয়ে যাচ্ছিলেন বন্ধুদের থেকে।

১৯৪৭-এর স্বাধীনতার নামে দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মী কায়েসের বাবা শেখ কামালউদ্দিন আহমেদ, সঙ্গে সদ্য পৃথিবীটাকে চিনতে শেখা শিশুপুত্র কায়েস। জীবন সংগ্রামের পথ তাই ছিল দুর্গম। মেধাবী ছাত্র হয়েও আর্থিক অনটনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সের পরীক্ষা দিতে পারেননি। ষাট থেকে আশি, এই সময়টা জুড়ে তিনি জীবনের মুখোমুখি হয়েছেন, লড়েছেন ও লিখেছেন। তাঁর পেছনে ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, সংখ্যালঘু ও উদ্বাস্তুর প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতা ও মর্মবেদনার সুদীর্ঘ নিশ্বাস। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেন মানুষের ক্ষোভ ও হতাশা ও ক্রোধকে, এর সঙ্গে মিলেমিশে ছিল কায়েমের জীবন ও শিল্প।

দেশভাগের কারণে সংখ্যালঘুদের যন্ত্রণা তাঁর সাহিত্যে গুরুত্ব পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। তিনি ছিলেন ওই জীবনেরই অংশীদার। অসীম মমতায় তিনি পদ্মচরণ, হরিমতি, আলো বা কালীনাথদের কথা তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের নদীমাটির সঙ্গেও একাত্ম হয়ে ভূমিলগ্ন সেইসব মানুষদের আবিষ্কার করতে চেয়েছেন যাদের জীবনটাই এক একটা সংগ্রাম গাথা। অসাধারণ ক্ষমতায় সৃষ্টি করেন 'লাশকাটা ঘর', 'জগদ্দল', 'অন্ধ তীরন্দাজ'-র মতো গল্প। কায়েস দেশীয় সীমান্তের বিভাজন গণ্ডিরেখার ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। যেমন উঠেছিলেন সাম্প্রদায়িক ভেদরেখার ঊর্ধ্বে, পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনকে খুনোখুনির পর্যায়ে নামিয়ে আনার যন্ত্রণায় লিখেছেন, যেখানে মানসিকতার আবেদন মুখ্য। তাঁর গল্পে উপলব্ধিগত অস্তিত্বের ভেতরে ক্ষতবিক্ষত, দুমড়ানো মোচড়ানো আর নিঃস্ব মানুষের আর্তনাদ ও হাহাকার। ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে দূরে থাকেননি তিনি, অংশ নিয়েছেন ছাত্রআন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধের সেনানী ছিলেন, এই অসম্ভব জীবনমুখী মানুষটা হঠাৎ কেন আত্মহননের পথ বেছে নিলেন? এই আত্মনাশী ভাবনার কোনও আভাস কি তাঁর লেখালেখিতে আগেই লুকিয়ে ছিল?

কায়েসের ঘনিষ্ঠজন শওকত আলী তাঁর প্রসঙ্গে লিখেছেন—'প্রথম গল্প 'অন্তর্নীল চখাচখী'তে প্রেম প্রধান প্রসঙ্গ, কিন্তু ঐ প্রসঙ্গেই এসেছে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার নানান টানাপোড়েন—আপাত বাস্তবতার অন্তরবর্তী বিষাক্ত মৃত্যুর হিসহিসে সাপ এঁকে বেঁকে অনুভূতির ভেতর দিয়ে চলে যায়। আর একটি প্রতীক রেলগাড়ি তাঁর মনোলোকের একদিক থেকে আরেক দিকে বারবার সিটি বাজিয়ে চলে যায়। মৃত্যু এবং তীব্র বেগে ছুটে যাওয়া—এই দু'টি জিনিস কায়েসের গল্পে বারংবার আসে যায়।"

তাঁর 'খঞ্জ রোদে শালিক ফড়িং' গল্পে যৌন সম্ভোগ করতে করতে ছেলেটি মাটি কাঁপানো রেলগাড়ির আওয়াজ শোনে যে গাড়ি একটি মুন্ডুহীন মানবদেহ ফেলে রেখে যায় ও আর একটি চোখ রেললাইনের সঙ্গে লেপটে থাকে। আর ছেলেটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখে স্নানাহার সেরে ঘুমোতে ঘুমোতে: গাছপালা মাঠঘাট নিয়ে তার চেনা পৃথিবীটা রোদের ভেতর গলে গলে পড়ছে।

প্রতীকী ও পরাবাস্তব উপাদান নিয়ে কায়েস আহমেদ অসাধারণ মুন্সিয়ানায় এর মৃত্যু উপত্যকায় নিয়ে যান পাঠককে—'সেটা একটা বিশাল ফাঁকা মাঠ, জলার মতো। ...লোকটা হাত বাড়িয়েই থাকে, তখন সে তার দিকে এগোয় এবং লোকটা যেন একটা শিশুকে তুলে নিচ্ছে এমনিভাবে তাকে নিজের কাঁধে স্থাপন করলে সে ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে বলে, 'এ, কি হচ্ছে না, না, একি হচ্ছে।' লোকটা কোনো কথা না বলে নির্জন কালো জল কেটে কেটে তাকে কাঁধে নিয়ে খাল পেরুতে থাকলে ভয় প্রবল জাপটে ধরে; লোকটা এবার আমায় ডুবিয়ে মারবে। এবং মনে হয় তাকে কাঁধে তুলে নেবার সময় সে যেন চকিতে দেখতে পেয়েছিল লোকটার কোনো চোখ নেই, নাক নেই, গোল গোল কয়েকটা ছোট বড় ছিদ্র এবং সর্বোপরি তার মুখে কোনো মাংস নেই।' এই কি মৃত্যুর প্রতীক? যার কাছে

একদিন নিজেকেই সঁপে দিয়েছিলেন স্রষ্টা। আত্মিক সংকট থেকেই আত্মনাশের পথে চলে যান স্রষ্টা, এই সংকট আভ্যন্তরীণ কারণে বা পারিপার্শ্বিক কারণে ঘটতে পারে। অনবরত যে হনন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কবির যাত্রা যেখানে শূন্যতার সংকট কখন তৈরি হবে তার আগাম ঘোষণা ঘনিষ্ঠজনেরাও টের পান না। কায়েসের মৃত্যুর কয়েকবছর আগে, ১৯৯৩-এর ১২ জুন বাংলা ভাষায় ষাটের প্রধানতম কবি শামশের আনোয়ারও এই আত্মহননের পথে হাঁটা দেন। মুঠো ভর্তি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পরেন চিরঘুমে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি চরম উপেক্ষার স্পর্ধা দেখানোর সাহস নিয়ে যিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, তিনিই যে এইভাবে মৃত্যুর কাছে হেরে যাবেন তার জবাব কোনো যুক্তির ব্যাখ্যায় মেলে না। শামশেরের মৃত্যুর দিন রাতে বাংলা গদ্য সাহিত্যের আর এক স্বতন্ত্র শিখর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ''আজ সকাল ৮টায় শামশের আনোয়ার শামশেরকে মেরে ফেলল। আত্মহত্যা করার কথা থাকে অনেকেরই, অনেকেই করে না, প্রয়োজনও থাকে না। কারণ মৃত্যু তো আগেই হয়ে গেছে, শামশের ভীষণভাবে বেঁচে ছিল।''

হাসপাতালের সাদা বিছানায় আমন্ত্রিত মৃত্যুকে জড়িয়ে শুয়ে আছেন শামশের জীবনানন্দ-উত্তর বাংলা কবিতায় এক ব্যতিক্রমী কবি। তাঁর কবিতারই যেন পুনর্নির্মাণ—'আমি শুয়ে রয়েছি—/পাশেই ঘুমিয়ে আছে পাঁচ ছয় ইঞ্চি লাশ আমার জিভ; আমি নড়ছি না, পাছে আমার জিভের/ঘুম ভেঙে যায়, জেগে উঠে সে /আস্তে আস্তে/পেঁচিয়ে ধরে আমার/গলা, মেরে ফেলে''। নবাব পরিবারের রক্ত ছিল ধমনিতে, শৈশব থেকে দেখেছেন অভিজাততন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের অন্তর বাহির। ভঙ্গুর সামন্ততন্ত্রের জীর্ণ কাঠামোর ভেতরের আর্তনাদ তিনি শুনতেন। বৈভবে বেড়ে ওঠা শামশেরের সম্পর্কে তাঁর সময়ের আর এক প্রধান কবি ভাস্কর চক্রবর্তী লিখেছেন—'শামশেরের সঙ্গে বন্ধুত্বটা ছিল একটা বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্বের মতো। এতটাই উদ্দাম, অসীমতা, দুঃসাহসিকতা ছিল শামশেরের,---এতটাই আক্রমণাত্মক, বিপন্ন আর ক্ষুব্ধ—এতটাই আন্তরিক ছিল শামশের—এতটাই আন্তরিক যে প্রকৃত শামশেরকে খুঁজে পাওয়াই ছিল মুশকিল।' বন্ধু পরিবৃত শামশের এর মধ্যেই কি নিঃসঙ্গতার কোটরে ঢুকে যাচ্ছিলেন? গড়ে তুলছিলেন নিভৃত এক বৃত্ত। 'আমার হাড়ের ভিতর ঢুকে পড়ছে শীত, নিষ্ফলা শীত; আমি স্পর্শ করলে বাস্তবতা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, বৃষ্টির গুঁড়োর মতো ছায়ায় গুঁড়োর ভেতর কেন আমি বেঁচে থাকি জগতের অপ্রিয়?' (আর কেউ)

ষাটের দশকের বাংলা কবিতার ভাঙ্গন বিস্ফোরণের অন্যতম ক্যাপ্টেন, যিনি বাজার চলতি পত্র-পত্রিকার নিয়মিত কবি হয়েও বাজার চলতি সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও স্বাতন্ত্র্যে সচল-সরব ছিলেন তাঁকে কেন এই ধূসর অন্ধকারের দিকে যাত্রা করতে হল? কবির কবিতা যাপনেই কি তবে সর্বনাশের বীজ সুপ্ত থাকে? 'আমার ঘরের ফ্যানের দিকে গোলাপ ফুলের/চিত্রিত রুমাল/ঐ রুমালেই তো সেই আহ্বান থাকে যাকে আমরা ফাঁস বলি''।

মনে পড়ছে, মৃত্যুর একদশক আগে, জলপাইগুড়িতে, শামশেরদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ হাউসের লনে আলো অন্ধকারে বিজয় দে, সমর রায়চৌধুরী, শ্যামল সিংহ সহ আমরা, মাঝের চেয়ারে মধ্যমণি শামশের। পছন্দের মৃত্যু প্রসঙ্গে সেদিন তিনি বলেছিলেন : 'আমার পছন্দ, সাদা ফুটফুটে বিছানায় শুয়ে মুঠো মুঠো স্লিপিং পিল খেয়ে, ধীরে ধীরে মৃত্যু উপভোগ করতে করতে নিঃশব্দে চলে যাব।'' এ যেন শেক্সপিয়রের প্রতিধ্বনি, হ্যামলেটে মৃত্যুকে নিছক নিদ্রামাত্র বলে উল্লেখ করেছিলেন নাট্যকার। একদশক পরে ঠিক এভাবেই মুঠো মুঠো ঘুমের ওষুধ খেয়ে সাদা চাদরে শুয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন শামশের আনোয়ার, গভীর নিদ্রার মরণ যাত্রা। তবে কি হনন প্রক্রিয়ায় এভাবেই ঘটে চলে কবির প্রতিনিয়ত অভিসার, মৃত্যু রহস্য বাজনা বাতাসে ভাসতে থাকে।

কবির স্বেচ্ছামৃত্যু রহস্য ধূসর মিউজিক রুম থেকে ভেসে আসা সরগমে শুধু স্তম্ভিত হয়ে থাকতে হয়, ব্যাখ্যাহীন যন্ত্রণায়। হার্ট ক্রেন বা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর মৃত্যুতে জলের সঙ্গে কবির নিবিড় ও চূড়ান্ত সখ্যের যে উদাহরণ হয়ে উঠল, সেই 'চূড়ান্ত যাত্রা' মনে করিয়ে দেয় চিনের প্রবাদপ্রতিম গীতিকার লী পো-র কথাও। চিনের এই কবিকে নিয়ে নানা কিংবদন্তি রয়েছে। সুরামত্ত লী পো-র মৃত্যুকে নিয়েও এক রোমাঞ্চভরা কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, লী পো জ্যোৎস্না রাতে ইয়েলো নদীর ধারে আকণ্ঠ সুরামত্ত হয়ে আকাশের 'পূর্ণচন্দ্র'কে উদ্দেশ্য করে কবিতা পড়তে থাকেন। রাতের নদীর জলে বিম্বিত রূপালী চাঁদ তাঁকে আরও মাতাল করে, চাঁদকে আঁকড়ে ধরতে চলেন কবি, ফলত জলে ডুবে ভেসে যান লী পো। একটি ডলফিন তাঁর মৃতদেহকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে চলে যায় 'অমৃতলোকে'।

জলের গভীরে আত্মবিসর্জন দেওয়ার প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে ভার্জিনিয়া উলফের কথা। মৃত্যুকে জীবনের চূড়ান্ত মহিমা বলে মনে করতেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের 'নিজস্ব এক ঘর' (অ্যা রুম অফ ওয়ান্স ওন) শতাব্দীর নারীবাদী সাহিত্যের অন্যতম আলোকস্তম্ভ, লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক বুদ্ধিদীপ্ত আয়ুধ হয়ে উঠেছিল। মাত্র ১৩ বছর বয়সে মাতৃহারা হন এবং ২২শে বাবাকে হারান, দুটো আঘাত তাঁকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। এর প্রভাব গোটা জীবন ধরে বহন করতে হয় তাঁকে। বন্ধু সাহিত্যিকদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'ব্লুমসফ গ্রুপ', এই গ্রুপের সাথী লেনার্ড উল্‌বেরিকে ১৯৪২-তে বিয়ে করেন। ১৯১৫-তে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্য ভয়েগি আউট' প্রকাশিত হয়। ১৯২২-এ স্বামী-স্ত্রীতে মিলে শুরু করেন প্রকাশনা ব্যবসা। এলিয়টের 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' সেখান থেকেই ছাপা হয়। সে সময় ভার্জিনিয়া ক্রমাগত লিখছিলেন, কবিতা, উপন্যাস, সাহিত্য সমালোচনা। হয়ে উঠলেন ব্রিটিশ সাহিত্যের প্রধান মুখ। ১৯৩৭-এ তাঁর প্রথাগত উপন্যাস 'দ্য ইয়ারর্স' প্রকাশিত হওয়ার পর প্রথা ভেঙে নির্মাণে মগ্ন হন, ১৯৪১-তে লেখেন 'বিট্যুইন দ্য অ্যাক্টস'। এ সময় ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে ছোটবেলার সেই মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থা প্রকট হতে থাকে। ১৯৪১-এ

হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে আত্মঘাতী হন। গায়ের কোর্টের পকেটে পাথর ভরে নিয়ে নদীর জলে ডুবে যান, তখন তিনি ৫৯, প্রচুর লিখে চলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ৩টি বড় উপন্যাস, ছোটগল্প সংকলন। গোটা জীবন অক্লান্তভাবে চিঠি লিখেছেন, লিখেছেন ডায়েরি, কিন্তু কোথাও এই সলিল সমাধিতে লীন হওয়ার আগাম বার্তা ছিল ন। জীবনকে বিশেষত নারীর প্রতিবাদকে অন্যমাত্রা দিয়েছিলেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, তিনি বলতেন : মেয়েদের উচিত পূর্বসুরিদের ইতিহাসকে ভুলে যাওয়া। বঞ্চনা ও নির্বাসন যে বিচ্ছিন্নতা ও সমালোচনার সুরের জন্ম দিয়েছে সেটাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত, কারণ আমাদের সভ্যতার দরকার এমন এক সুরে লেখা যেখানে আছে শুধু বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক।' তিনি বিশ্বাস করতেন, 'বাস্তব যত সত্য হবে কল্পনাও হবে ততই উৎকৃষ্ট।" ভারসাম্যময় বিশ্বের জন্য সংগ্রাম ছিল যার জীবনমন্ত্র তিনি হঠাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত কোণে ঘুরে জীবনের থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন!

উল্‌ফের মতোই মৃত্যুকে জীবনের চূড়ান্ত মহিমা ভাবতেন হার্ট ক্রেনও। তবে দু'জনের যাপন অভ্যাস ছিল একদম বিপরীত। শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন যার কাছে ছিল অসহনীয়। মদ্যপানে ডুবে থাকতেন 'আত্মার কণ্ঠ মুক্তি'র জন্য। মদ্যপান ছিল তাঁর অস্মিতা, 'দি ওয়াইন ম্যানেজারি' কবিতায় ক্রেন লিখেছেন, 'মদ দৃষ্টিকে বিমুক্ত করে"। মদ্যপান এক অপার ইচ্ছার বিমোক্ষণ ঘটায়, মদ্যপান ও সমকামিতা-র আত্মবিনাশী হয়ে ওঠার অভিযোগ ছিল মার্কিন সাহিত্যের এই অন্যতম প্রধান কবির বিরুদ্ধে। কিন্তু মৃত্যুকে তিনি বেছে নেন অতৃপ্ত ভালোবাসার যন্ত্রণায় তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের মতো। 'ক্রেনের জীবন এক চড়াই উৎরাইয়ের জীবন। বিবমিষা আর আত্মধ্বংসের প্রতিমান এক যজ্ঞের তিনি ঋত্বিক।' কবি ও সাহিত্য সমালোচক ম্যালকম কাউলের সম্পর্ক বিচ্ছিন্না স্ত্রী পেগী তাঁর জীবনে প্রথম প্রকৃত অর্থে 'প্রেম'। এর আগের অধ্যায় উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরপুর, রেড ইন্ডিয়ান বালকদের বহুগামী যৌনতার সঙ্গী হয়ে সমকামিতায় ভিন্নতর 'সুখে' ডুবে ছিলেন, এই বহুগামী যৌনতাই তাকে নারীর প্রেমের আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেয়, যার অনুভূতি ছিল তাঁর কাছে 'উপশমময় প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ'। পেগী ট্রান্সকোতে আসার পর তাঁর 'প্রথম প্রেম' ঘন হয়ে ওঠে। কিন্তু বিশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ক্রেন ঘর বাঁধার পক্ষে সহজ স্বাভাবিক ছিলেন না, ফলত ঝঞ্ঝাময় হয়ে ওঠে এঁদের সম্পর্কও। কবি উইটার এঁদের সংসার প্রত্যক্ষ করে লেখেন : তাঁদের ঘর-সংসার যে কাউকে পাগল করে দিত। যখন তারা পরস্পর হিংসাত্মকভাবে ঝগড়া করত না তখনও তারা কাজের লোকদের সাথে হৈ-হল্লা করত...তাদের সারাক্ষণ কলহের পরিসমাপ্তি ঘটত নীচের হোটেলে হার্টের চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে।' শৈশব থেকে ক্রেন তাঁর বাবা-মা'র মধ্যে যে কলহের কণ্টকিত সম্পর্ক দেখেছেন, তারই প্রতিফলন ছিল তাঁর নিজের সংসারেও। ম্যাক্সিকো থেকে নিউইয়র্ক ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন, আবার ফিরে এসে বিয়ের কথাও ভাবলেন দু'জনে। বস্তুত ম্যাক্সিকোতে থাকার শেষ কয়েকমাস প্রবল হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন ক্রেন, তাঁর গোজেনহেইম ফেলোশিপের ব্যর্থতা, মন্টেজসার উপর মহাকাব্য লিখে উঠতে না পারা তাঁকে আরও মদ্যপান এবং রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে সমকামিতার দিকে ঠেলে দেয়। এ সময় তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন 'দ্য ব্রিজ'-এর স্রষ্টা, 'দ্য হোয়াইট বিল্ডিংস'-এর মতো কবিতার বই-এর জনক। ১৯৩২-র এপ্রিলে ক্রেন ও কাউলি সমুদ্রপথে মেক্সিকো থেকে যাত্রা করেন। 'ব্রোকেন টাওয়ার' লেখার একমাস পরে 'ওরিজারা' জাহাজে তারা নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই সমুদ্রযাত্রাও দু'জনের কলহের ঝঞ্ঝাটমুক্ত থাকল না। একসময় জাহাজের এক কর্মীকে উত্যক্ত করার জন্য ক্রেনকে মার দেওয়া হয় পর্যন্ত। ২৭ এপ্রিল কাউলির কথায় ক্রেন মানসিকভাবে আহত হন, জাহাজের রেলিং থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু একজন স্টুয়ার্ড তাঁকে ধরে ফেললে বেঁচে যান। ক্রেনকে কেবিনে এনে আটকে রাখা হল তখন। এসময় প্রবল মদ্যপান করে কিছুটা শান্ত হন, পায়জামা পরা অবস্থায় গায়ে কোট চাপিয়ে কাউলির কাছে যান, কাউলি তাকে মধ্যাহ্নভোজের উপযুক্ত পোশাক পরে আসতে অনুরোধ করলে ক্রেন নরম গলায় তাঁর ভালোবাসার কন্যাকে বলেন 'ঠিক আছে প্রিয়তমা আমার, আমি তৈরি হয়ে আসছি।' এই বলে কাউলিকে চুমু খেয়ে 'বিদায় প্রিয়তমা, বিদায়' বলে ধীর পায়ে জাহাজের পেছনদিকে চলে যান। গা থেকে কোটটি খুলে ফেলে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন তাঁদের জাহাজ হাভানা থেকে ২৭৫ কিমি উত্তরে। জাহাজের উদ্ধার কর্মীরা ২ ঘণ্টা ধরে লাইফবোট নিয়ে সমুদ্রে খুঁজেও তার কোনো খোঁজ পাননি। তেত্রিশ বছর বয়সেই মৃত্যুর সঙ্গে গলাগলি করে বিদায় নিলেন অশান্ত করি। ক্রেনের জীবনীকার ফিলিপ হার্টন যার সম্পর্কে লিখেছেন ''ক্রেনের মতো রহস্য ও ভয়ানক, কল্পনা ও বাগ্মিতার বুননে ফুটিয়ে তোলেনি আর কেউ।" র‍্যাবো তাঁর প্রিয় কবি ছিল, কবিতা তাঁর কাছে কখনই পরিশোভন বা মনোরঞ্জনমুখী নয়, বরং এক চেতনার বিকাশে, ব্লেক কথিত সরলতা বা পরম সৌন্দর্যের দিকে। ক্রেন জীবনভর অস্থিরতা থেকে এভাবেই পরম সৌন্দর্যে লীন হয়ে যান। তাঁর সৃজনসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার বিরোধ তাঁর লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু জীবনের প্রতিটি বাঁকে অতৃপ্তি ও শৃঙ্খলাহীনতা ধীরে ধীরে তাঁকে জীবনযাপনের স্বাভাবিকতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, যার পরিণতি ঘটল অন্তিম সমুদ্রযাত্রায়। ভালোবাসতেন সমুদ্রকে, তাঁর শেষ আশ্রয় হল সেই সমুদ্রের ঘননীল। জার্মান ভাষায় বিখ্যাত কবি পল সেলানও জলে ডুবেই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৭৩-এর এপ্রিলে মিরাবো সেতু থেকে সেইন নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন ২য় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানির প্রধান কবি সেলান। ১লা মে, প্যারিস থেকে সাত মাইল ভাটিতে এক জেলে কবির মৃতদেহ খুঁজে পান। ১৯৬৪-তে সেলান

লিখেছিলেন 'জলের সুচ/বিচ্ছিন্ন ছায়াগুলোকে/সেলাই করে—সে সংগ্রাম করে তার পথে/গভীর ভিতরে/মুক্ত হতে", নিজের মুক্তিও সেলান ওই জলের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর ঘরের পড়ার টেবিলের উপর হোল্ডারলিনের জীবনী খোলা ছিল, সেলান আন্ডারলাইন করে রেখেছিলেন একটি লাইন ; 'কখনো কখনো এই প্রতিভাবান অন্ধকারে চলে যেতেন আর হৃদয়ের অরন্তুদ গভীরে ডুবে যেতেন।" হৃদয়ের গভীরে ডুব দিয়েই একদিন ''মৃত্যুসংগীত' লিখেছিলেন পল সেলান, যেখানে তাঁর কাছে 'মৃত্যু এক প্রভু যার চোখ দুটো নীল।' অভ্যন্তরীণ জটিলতা ও যুক্তির ঊর্ধ্বের জগৎ ঘিরেই সেলানের কবিতার জগৎ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মান বা আধুনিকোত্তর সাহিত্যে তিনি এক অনন্য, নির্জন কিন্তু স্পষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সেলানের গোটা জীবনটাই নানা বৈচিত্র্যে ভরা, ভূগোল ক্রমশ পাল্টেছে তাঁর। তাঁর লেখালেখি এক মিশ্র রসায়নের রসদ সংগ্রহ করে ভিন্নতর মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রকৃত নাম ছিল পল আনসেল, কবিতা লিখতে গিয়ে সেলান নাম নেন। বৈচিত্র্যে ভরা তাঁর জীবন, ১৯২০-তে রোমানিয়ায় জন্ম, ১৯৩৮-এ ফ্রান্সের ত্যুর-এ যান ডাক্তারি পড়তে, পরের বছরই বাড়ি ফিরে আসেন রোমান সাহিত্য পড়াবেন বলে। ১৯৪০-এ জার্মান সৈন্য চেরনোউইৎজ দখল করলে তাঁদের মতো সমস্ত ইহুদি পরিবারকে ঘোট্টোতে পাঠানো শুরু হয়, সেলানের পড়াশোনায় সাময়িক ছেদ পড়ে। ১৯৪২-এ তাঁর বাবা-মাকে কন্‌সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানোর সময় সেলান কোনোক্রমে পালিয়ে যান, কিন্তু ধরা পড়ে পরবর্তীতে রোমানিয়ার এক লেবার ক্যাম্পে স্থান হয় তার। ১৯৪৩-এ রুশ সৈন্য চেরনোউইৎজ দখল করলে তিনি মুক্তি পান। আবার লেখাপড়া শুরু হয়। ১৯৪৫-এ বুখারেস্টে প্রুফ রিডার ও অনুবাদকের চাকরি, ১৯৪৭-এ ভিয়েনা, তারপরের বছর থেকে প্যারিসে বসবাস। প্যারিসে থাকাকালীনই জার্মান ভাষা চর্চা শুরু করেন, নতুন করে লেখক জীবনের প্রারম্ভ। ১৯৪৮-এ প্রকাশিত বই ১৯৫২-তে পরিমার্জিত চেহারায় প্রকাশিত হয়, 'স্মৃতি ও পোস্তফুল' তাঁর প্রথম কবিতা বই। চমকে দেয় পাঠককে। এরপর একের পর এক কবিতার বই বেরুতে থাকে। মৃত্যুর আগে তাঁর সেই বই 'সুতো বুনোটের সূর্যেরা'। ১৯৭৩-এর এপ্রিলে কবি আত্মঘাতী হলেন, সে বছরই প্রকাশিত হয় ''আলোবশ্যতা' এবং ছাপা হচ্ছিল 'তুষার পর্ব'। এর পাশাপাশি অসংখ্য অনুবাদ করেছিলেন পল সেলান, হয়ে উঠেছিলেন ইউরোপের মিশ্র ভাষা সংস্কৃতির একক 'প্রতিষ্ঠান', কিন্তু এত সবের মাঝেও তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডের ভেতর এক সমান্তরাল জটিলতার স্তর টের পাওয়া যায়। শেকড়হীন হয়ে ছুটে বেড়ানো, অস্থিরচিত্ততা, সিদ্ধান্তহীনতা এসব কিছুরও উপর ছিল যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতির ক্ষত, বাবা-মায়ের ভয়ানক হত্যামৃত্যু তাঁর ভেতর এক মানবিক জটিলতার জন্ম দিয়েছিল। এই ভয়ানক স্মৃতি থেকে তিনি পালিয়ে যেতে চাইতেন এবং তা তাঁকে কুরে কুরে খেত। অভিজ্ঞতার যন্ত্রণায় তিনি যে অস্থিরতায় আক্রান্ত হতেন তা বারংবার তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনকে বিধ্বস্ত করেছিল। এরই হয়ত করুণ পরিণতি তাঁর আত্মবিনাশী সিদ্ধান্ত। 'দিন ফোটার কালো দুধ তোমায় রাতে পান করি/তোমায় দুপুরে পান করি মৃত্যু আসে যেন জার্মানির উস্তাদ/তোমায় রাত নামলে পান করি আর সকালে তোমায়/পান করি পান করে চলি/ জার্মানির উস্তাদ হয়ে মৃত্যু আসে তার চোখ দুটো নীল। শিসের একটা বুলেট দিয়ে সে ঠিক দাগটায় মারবে.../সে মারবে তোমায়... (মৃত্যু সুরের আলাপ)

মাত্র তিরিশ বছর বয়সেই দক্ষতায় ও জনপ্রিয়তায় ইংরাজি সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান কবি হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন সিলভিয়া প্লাথ। খুব ছোটবেলা থেকেই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা চমকে দিয়েছিল সাহিত্য আলোচকদের। জয়েস ক্যারল ওয়াটস তাঁকে বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর ইংরাজি সাহিত্যের অন্যতম 'সেলিব্রেটেড এন্ড কন্‌টোভালিয়ার্স' কবি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বাস্টনে জন্ম তাঁর, বাবা ওট্টোপ্লাথ ছিলেন জার্মান থেকে চলে আসা কলেজ অধ্যাপক। ছাত্রী আউরিলিয়া স্কবারকে বিয়ে করেছিলেন ওট্টো, তাঁদের একমাত্র কন্যা সিলভিয়া। মাত্র ৮ বছর বয়সে বাবা মারা যান সিলভিয়ার। এই দুর্ঘটনা তাঁর জীবনকে উথালপাথাল করে দেয়, প্লাথের একটি বিখ্যাত কবিতা ''বাবা"। আর্থিক দুরবস্থা ও পরিস্থিতি আউরিলিয়াকে বাধ্য করে ম্যাসচুসিট্টিস চলে আসতে। দুর্দান্ত মেধাবী ছাত্রী হিসাবে সিলভিয়া আবার নজর কাড়েন। বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করেন সেসময়ই তিনি। স্মিথ কলেজে স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা চলাকালীনই তাঁকে অতিথি সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করা হয় একটি বহুল প্রচলিত বিখ্যাত পত্রিকায়। কলেজের গণ্ডি ছাড়ার আগেই তাঁর মধ্যে ডিপ্রেশনের প্রবণতা দেখা দিতে থাকে। মানসিক দোলাচলে ভুগতে থাকেন তিনি। ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠা ডিপ্রেশন-এর কারণেই তাঁর কাছে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন মনে হতে থাকে। ১৯৫৮-র ২০ জুন প্লাথ লেখেন : It is as if my life were magically run by two electric, current; joyous Positive and despairing negative—which ever is running the movement dominates my life floods it." এক অদ্ভুত মানসিক রোগে ভুগছিলেন তিনি। চিকিৎসকরা যাকে বলেছেন "Bipolar disorder" মাত্র ১৯ বছর বয়সে, ১৯৫৩-তে প্লাথ প্রথমবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, প্রচুর পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন সেবার। দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভরতি থাকতে হয় তাঁকে। ইলেকট্রিক থেরাপি দিয়ে সুস্থ করা হয়। এই সময়কালের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখে ফেলেন তাঁর একমাত্র প্রকাশিত উপন্যাস 'দি বেল জার'। সুস্থ হয়ে আবার কলেজে ফিরে যান। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রান্ড পান গবেষণার জন্য, কাজ শুরু করেন। এভাবেই ভরপুর লেখালেখির মধ্যে ডুবে গিয়ে বেঁচে থাকার 'পজেটিভ' চেষ্টা চলতে থাকে তার। দেখা হয় টেড হিউজের সঙ্গে। ১৯৫৬-তে তারা বিয়ে করেন। প্রকাশিত হয় কবিতা সংকলন

'দি কলোসাস', পাঠকদের কাছে দুর্দান্তভাবে গৃহীত হয় এই বইটিও। আবার বিপর্যয় নেমে আসে, ১৯৬২-তে তাঁদের বিয়ে ভেঙ্গে যায়। দুই সন্তান নিয়ে সিলভিয়া আবার একা হয়ে যান। তবুও এ সময় তার সৃজন কর্ম থেমে থাকেনি, প্রথাবিরোধী লেখালেখিতে ঝুঁকে যান, প্রকাশিত হয় 'এরিয়াল'। কিন্তু ''দি বেলজার' এর মত 'এরিয়াল'-নিয়েও পক্ষে বিপক্ষে তীব্র আলোচনা সমালোচনা ওঠে, প্লাথের মানসিক স্থিতি এর ফলে আরও টলে যায়।১৯৬৭তে রান্নার গ্যাস বুক ভরে নিয়ে মৃত্যুর কাছে চলে যান। সাহিত্য জগতের গোষ্ঠীগত চক্র ও আক্রমণের শিকার এই নারবাদী চেতনায় দৃঢ় লেখিকার নিজস্ব মানসিক প্রতিরোধ আগেই দুর্বল হয়েছিল দাম্ভিক বাবা ও অবিশ্বাসী স্বামীর কারণে। 'এরিয়াল'-এর কবিতায় তার আত্মাহূতির আভাষ ফুটে উঠেছিল। লোকাল আলিভার্জ তার 'দি সেভেজ গড'-এ 'এরিয়াল'-এর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন 'কবিতা ও মৃত্যু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, একে অন্যকে ছাড়া থাকতে পারে না, এটাই সত্যি। জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্ট এই কবিতাগুলো যেন মৃত্যুর পরে লেখা।'

২ জুলাই, ১৯৬১—একটি মৃত্যু বিশ্ববাসীকে হতবাক করেছিল। বিখ্যাত সাহিত্যিক। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, বর্ণময় যে মানুষটি, প্রতিবন্ধতাকে জয় করার প্রতীক হয়ে উঠেছিল যার জীবন কাহিনী তিনিই কিনা ডাবল স্যুটারে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী হলেন! বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য শুধু নয় গোটা বিশ্ব সাহিত্যের প্রধান উপন্যাসিক হেমিংওয়ের জীবনটাও তার উপন্যাসের থেকে কম আকর্ষণীয় নয়। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অ্যাম্বুলেন্স চালক হিসেবে অংশ নেন, ২য় বিশ্বযুদ্ধেও নিষ্ক্রিয় থাকেননি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে সাংবাদিক হিসাবে অংশ নেন। এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই লেখেন 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' ১৮৯৯-১৭ জুলাইতে জন্মেছিলেন এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় ছুটে বেড়িয়েছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে। ১৯৪০ থেকে এক দশক ছিলেন কিউবায়। একটি ডিঙি নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, মাছ শিকার তার নেশা ছিল। প্রায় ২০ বছর ধরে ধীরে ধীরে লেখেন গোটা জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে যে উপন্যাসটিকে হেমিংওয়ে চিহ্নিত করেন সেই 'ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দি সি' প্রকাশিত হয় ১৯৫২-তে, সে বছরই পুলিৎজার পুরস্কার পান, ১৯৫৪-তে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। আজন্ম প্রেমিক হেমিংওয়ের জীবনে ১৯ বছরের অদ্রিনা ইভানচ্যুসের সঙ্গে প্লেটনিক প্রেমের ফলশ্রুতি 'আক্রস দি রিভার অ্যান্ড ইট্স দ্যা ট্রিস' তার এক অন্য ধরনের কীর্তি। প্লেন ক্র্যাশ, কার অ্যাক্সিডেন্ট, আগুনে ঝলসে যাওয়ার দুর্ঘটনাও যে জীবনকে থামাতে পারেনি সেই হেমিংওয়ে নিজেকেই নিজে থামিয়ে দিলেন ৬২ বছরে এসে।

জীবনের মধ্যভাগে এসেই গভীর ডিপ্রেশনে আক্রান্ত হয়েছিলেন হেমিংওয়ে। তাঁর প্রিয় বন্ধু ও সাথী সাহিত্যিকদের প্রয়াণ তাঁকে বিষণ্ণ করে তুলেছিল। ১৯৩৯-এ চলে যান উইলিয়াম বটলার ইয়েটস, ১৯৪০-এ ফ্লিজানার্স, ১৯৪১-এ শেরউড আন্ডারসন ও জেমস জয়েস। এর পাশাপাশি ঘটতে থাকে একের পর এক ভয়ানক সব দুর্ঘটনা। ১৯৪৫-এ অ্যাক্সিডেন্ট-এ হাঁটু ভেঙে যায়, মাথার পেছনে গুরুতর আঘাত পান। এরপর সুস্থ হয়ে আবার দুর্ঘটনা, স্কিয়িং করার সময় পিছলে গিয়ে ডান হাঁটুর এ্যাস্কলেট ও হাঁটুতে চোট পান।

১৯৫৪-তে দু'দুবার প্লেন ক্রাশের শিকার হন তিনি। দুটো বিমান দুর্ঘটনার পরেও তিনি অবাক করে বেঁচে যান, কিন্তু গুরুতর আহত হন। সে বছরই সেপ্টেম্বরে মাছ ধরতে গিয়ে বুশ ফায়ারে ঝল্সে যান তিনি। সেকেন্ড ডিগ্রি পুরে যায় তাঁর শরীর, পা ও দেহের সামনের দিকটা, ঠোঁট ও চামড়া ঝলসে যায়। এই দুর্ঘটনার এক মাসের মাথায় নোবেল পুরস্কার প্রাপক হিসাবে তাঁর নাম ঘোষিত হয়। ১৯৫০ থেকে গুরুতর অসুস্থ হয়ে বিছানায় শয্যাশায়ী থাকেন। পরের বছর প্যারী ফিরে আসেন, রিটস্ হোটেলে ওঠেন যেখানে ইতিপূর্বে ১৯২৪-এ ছিলেন, এখানে তাঁর পুরোনো ট্রাঙ্কটি খুঁজে পান, তাতে সেই সময়কার নোটবইগুলো ছিল। আবার পুরোপুরি লেখাতে ডুবে যান তিনি। এ সময় শরীরও তাঁর খুব খারাপ হয়ে পড়ছিল, ইউরিন সমস্যাও ছাড়াও ছিল ডায়বেটিস সংক্রান্ত নানা সমস্যা, ওজন কমে যাচ্ছিল তাঁর। এর মধ্যেই ১৯৬০ প্রকাশিত হয় 'লাইফ-দি-ডেঞ্জারাস সামার'। প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যে ডুবে থাকতেন এ সময়টা। ১৯৬১-এর ২ জুলাই তাঁর নিজের শর্টগান নিয়ে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন। এই আচমকা মৃত্যুকে বেছে নেওয়ার পেছনে তাঁর বংশগত প্রবণতা কাজ করেছে বলে চিকিৎকসদের অভিমত। জেনেসিস (ডিসঅর্ডার Hemochromatos আক্রান্ত ছিলেন তিনি। তার এক ভাই ও এক বোন ইতিপূর্বে আত্মহত্যা করেছিলেন। এই অসুস্থতার সর্বশেষ করুণ পরিণতি তাঁর একমাত্র নাতনি মারগুয়েস হেমিংওয়ের মৃত্যু। ১৯৯৬ ১লা জুলাই এই মার্কিন মডেল তরুণ আত্মঘাতী হন।

১৯৫০-এর ২৬শে আগস্ট ইতালির সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক কবিদের অন্যতম সিজার পার্ভেস তুরিন শহরের এক অপরিসর হোটেলের ঘরে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর সমস্ত লেখার পাণ্ডুলিপি একে একে পুড়িয়ে ফেলেন। শুধুমাত্র কয়েকটি ডাইরি বেঁচে যায়। এই মৃত্যুর পেছনে কেউ কেউ প্রেমব্যর্থতার কারণ খুঁজে পান, অনেকে বলেন যে কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসীয় পাভেসের ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি মোহভঙ্গই তাকে এই আত্মঘাতী সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। পাভেসের ডাইরি থেকে জানা যায় যে আত্মহত্যার প্রতি ঝোঁক তাঁর শৈশব থেকেই ছিল, অবশেষে তা ঘটল যখন তিনি ৪২ বছরে পা দিয়েছেন। পাভেসের কবিতায় এই মৃত্যুর কথন বারংবার এসেছে : ''মৃত্যু আসবে আর তোমার চোখ হয়ে যাবে তার—/এই মৃত্যু যে আমাদের কাছ ছাড়ে না/সকাল থেকে সন্ধে; নিদ্রাহীন,/বধির, বহুদিনের এক অনুতাপের মতো/কিংবা যেন এক আর পপ-অভ্যাস। তোমার চোখ/হয়ে যাবে এক নিরর্থক কথা, একটা চাপা কান্না, এক স্তব্ধতা।'

(অনু : অভিজিৎ মুখার্জি)

লেখক শিল্পীদের একটা বড় অংশই আত্মঘাতী হন স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা থেকে। একজন মানসিকভাবে সক্রিয় মানুষ যার নিজস্ব স্বপ্ন আছে, জগৎকে নিজের মতো দেখার বা দেখানোর ক্ষমতা আছে সেই কেবল এই যন্ত্রণায় আক্রান্ত হতে পারেন। যেমন হয়েছিলেন জাপানি সাহিত্যিক কাওয়াবাতা ইয়াসুনারি, ১৯৭২-এ হেমিংওয়ের মতোই মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জাপানি সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তিই ছিল আভিজাত্যের ঐতিহ্য, কাওয়াবাতা-ও সেই ঐতিহ্যের অনুসারী ছিলেন। যুদ্ধের উন্মত্ততা ও ধ্বংসকে যেমন তিনি মেনে নিতে পারেননি, তেমনি পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত 'লিবারজিম্'কেও মানাতে পারেননি। এই অসন্তোষ তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে, যারই পরিণতি এই আত্মঘাতী মৃত্যু। কাওয়াবাতা ইয়াসুনারি-র মতোই আর এক বিখ্যাত জাপানি সাহিত্যিক ইউকিও মিশিমা-ও ১৯৭০-এ মাত্র ৪৫ বছর বয়সে হারাকিরি করে আত্মহত্যা করেন। 'আকাৎসুকি নো তেরা', 'হারু নো ইউকি', 'হোম্‌বা' আর 'নেথনিন্ গোসুই' এই চারটি উপন্যাস নিয়ে তৈরি বিখ্যাত 'হো জোনো উমি' বা 'প্রজনন সমুদ্র' চতুষ্টক তাঁর এবং জাপানি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তৎকালীন জাপানি সরকারের সামরিক নির্ভরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়েছিলেন তিনি। তাঁরা সম্রাটের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার দাবি তোলেন। একদিন এক সেনানায়ককে আটকে তাঁর সামনেই ছুরি দিয়ে নিজের পেট চিরে সেপ্পুকু বা হারাকিরি করেন মিশিমা, তাঁর এক সহকারী সে সময় তাঁকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে তলোয়ার দিয়ে শিরশ্ছেদ করেন তাঁর। মিশিমার জীবনীকার ও প্রিয় বন্ধু জন নাথান মনে করেন তিনি এভাবে আত্মঘাতী হওয়ার পরিকল্পনা আগেই করে রেখেছিলেন।

কেন 'আত্মহত্যা'? এর কোনো উত্তর নেই! লেখক-কবি-শিল্পীদের কল্পনা একটা প্রধান শক্তি, সেখানেই কি লুকিয়ে আছে তার উত্তর, নাকি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণ যন্ত্রণার করুণ পরিণতি এই মৃত্যু। কোনো উত্তর নেই! ইউকিও মিশিমার গদ্যাংশ থেকে এক খণ্ড তুলে আনা যায় : গোধূলির আলো অতি চঞ্চল আর এর মধ্যে আছে একরকম উড়ানের বৈশিষ্ট্য। এটাই যেন জগতের ডানা। ফুল থেকে মধু খাওয়ার সময় হামিংবার্ড যখন দ্রুত ডানা ঝাপটায় তখন তাতে ধরে রামধনুর রঙ, সৃষ্টি যেন আমাদের দেখতে চায় কত ওপরে উঠে যাবার ক্ষমতা ছিল ওর; গোধূলির আলো সবকিছুতে যে কী ওড়ার উল্লাস, উচ্ছ্বাস ... আর তারপর সবশেষে মাটিতে পতন ও মৃত্যু।" এই মৃত্যুর শোভাযাত্রায় আমরা শোকমগ্ন হয়ে স্মরণ করি দুই বাংলার আটের দশকের তরুণ কবি সুনীল সাইফুল্লাহ ও তাপস কুমার লায়েককে, শামিম কবিরকে, তাঁদের মৃত্যু শুধু হতবাক করে, কোনো ব্যাখ্যার অতীত এই নৈঃশব্দ্য ও অন্ধকার।

শারদ শুভেচ্ছা জানাই—

সোনালিকা জুয়েলার্স

● স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা ●

● হলমার্ক গহনা পাওয়া যায় ●

চাকদহ রোড (রবীন্দ্র মূর্তির পাশে)

● বনগাঁ ● উত্তর ২৪ পরগনা

গিলগামেষের মহাকাব্য

সুজন ভট্টাচার্য

প্রথম ফলক

সবকিছুরই দ্রষ্টা যিনি, তাঁকে আজ পরিচয় করাব আমি
তোমাদের সাথে,
শোনাব তাঁর কথা, সমস্ত অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ যিনি—
দেব আনু যাঁকে দিয়েছিলেন পূর্ণতার যাবতীয় জ্ঞান,
যিনি দেখেছিলেন গোপনতম সবকিছু, আবিষ্কার করেছিলেন
সমস্ত লুকিয়ে রাখা কথা,
প্লাবনের আগেই যিনি জেনেছিলেন সময়ের রহস্য।
নিজেকে নিঃস্ব করে তাঁর যাত্রা ছিল দূরতম লোকে,
অবশেষে পরম শান্তিতেই হল উত্তরণ তাঁর।
পাথরের দেয়ালেই লিখেছিলেন তিনি তাঁর শ্রমের কাহিনী,
গড়েছিলেন উরুকের আবাসের প্রাচীন,
এন্নার মন্দিরের দেয়াল, পবিত্র দেবালয়।
তামার মতো ঝকঝকে এই পাঁচিলটির দিকে তাকাও,
ভিতরের দেয়ালটিও দেখো,
দেখো তো, এর তুল্য আর কিছুই কি আছে পৃথিবীতে!
সামনের পাথরটিকে প্রাণপণে ধরো—প্রাচীনকাল থেকে সে
ওখানেই আছে।
এন্নার মন্দিরের কাছে যাও, ওখানেই ইশথারের আবাস,
পরবর্তী কোনও রাজা বা মানুষ যার সমকক্ষ নয়।
উরুকের প্রাচীরের উপরে ওঠো, চারপাশে প্রদক্ষিণ করো,
দেখো তার ভিত, ইটের কারুকাজ।
স্বয়ং সপ্তর্ষিরাই পরিকল্পনা করেছিলেন তার।
প্রসারিত একটি নগর, পামবন,
বিস্তীর্ণ নিচু জমি, ইশথার মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ।
আরো বহুদূর হাঁটো, পাঁচিলের ঘেরাটোপে উরুকের উন্মুক্ত
স্থান।
দেখো তামার ফলকের সেই আধার,
খোলো ... ব্রোঞ্জের তালা ... খোলো ...
গোপন বাঁধনগুলি একে একে খোলো।
ছুঁয়ে দেখো, পাঠ করো লাপিস লাজুলির একেকটি ফলক
কীভাবে গিলগামেষ জয় করেছিলেন সমস্ত অকল্পনীয় বাধা।

সমস্ত রাজার চেয়েও মহত্তর, স্বয়ং ঈশ্বর যেন,
তিনিই নায়ক; উরুক-সন্তান তিনি, রক্তস্নাত বন্য মহিষ।
সকলেরই সামনেই তিনি, স্বভাবজ নেতা;
পশ্চাতে যখন,
সাথীদের চরম বিশ্বাস তখনও অটুট।
পরাক্রমী জালে মানুষের রক্ষক তিনি,
বন্যার জলরাশি এনে
পাথরের দেয়ালও ভেঙে দেন তিনি শিশুর উল্লাসে।
লুগালবান্দার ঔরস, পূর্ণতাই তপস্যা তাঁর;
রিমাত-নিনসান-পবিত্র গাভীর গর্ভে প্রস্ফুটিত তিনি,
উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
তিনিই উন্মুক্ত করেছিলেন পর্বতের পথ,
পাহাড়ের সানুদেশে তিনিই খুঁড়েছিলেন গভীরতম কূপ।
তিনিই সমুদ্র অতিক্রম করেন, দুরন্ত সাগর
পৌঁছে যেতে উদিত সূর্যের কাছে;
পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তরে পৌঁছে যান তিনি
প্রাণের সন্ধানে।
নিজের শক্তির বলে তিনিই উদ্ধার করেন প্লাবিত নগর।
কে-ই বা গিলগামেষের মতো বলতে পারে—'আমিই সম্রাট'?
অর কারই বা জন্মের দিন থেকে নাম হয় 'গিলগামেষ'?
দুইভাগ তার স্বয়ং ঈশ্বর, একভাগ মানব।
মহত্তমা দেবী আরুরু যত্নে বানিয়েছিলেন তাঁর দেহের কাঠামো,
অবয়ব তাঁর—
... সুন্দরতম পুরুষ...
...ত্রুটিহীন...
উরুকের প্রাঙ্গণে বিচরণ তাঁর।
বন্য মহিষের মতো, প্রবল, উদ্ধত শির।
এমন কোনও শত্রু নেই তাঁর
সাহসে ভর করে যে তাঁর দিকে অস্ত্র তুলতে পারে।
অনুগামী যত, তারাও সজাগ,
বিনাপ্রশ্নে পালন করে যাবতীয় নির্দেশ।
উরুকের জনপদবাসী শুধু একটিই আশঙ্কায় ভোগে—
পিতার জন্য একটি সন্তানও রেখে যেতে ব্যর্থ গিলগামেষ,
দিন আর রাত, সে বড়ই উদ্ধত।

শাসিত নাগরিক যারা উরুক নগরের
তারাই হাহাকার করে—
''গিলগামেষ কি সত্যিই উরুকের মেষপালক এক?
সত্যিই কি মেষপালক সে...
দৃঢ়, বহুখ্যাত, সন্ধানের উপযুক্ত এবং জ্ঞানী!
কোনও কন্যাকেই সে ছাড়ে না মায়ের কাছে যেতে—
যোদ্ধা-দুহিতা অথবা যুবকের বধূ।''
দেবতারা কান পেতে শুনলেন যাবতীয় কথা;
নগরের দেব আনুর উদ্দেশে বললেন তারা—
''তুমিই জন্ম দিয়েছ উদ্ধতশির এই বন্য মহিষের।
এমন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই তার
যে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারে।
গিলগামেষ কোনও পিতার জন্য তার সন্তানকে ছাড়ে না।
দিন আর রাত সে উদ্ধতগামী।
সত্যিই কি সে উরুকের মেষপালক এক?
সত্যিই কি সে তাদের মেষপালক,
দৃঢ়, বহুখ্যাত, সন্ধানের উপযুক্ত এবং জ্ঞানী!
কোনও কন্যাকেই ছাড়ে না সে মায়ের কাছে যেতে
যোদ্ধা-দুহিতা অথবা যুবকের বধূ।''
নিশ্চুপ, আনু শুনলেন অভিযোগ যত;
অবশেষে দেবতারা আরুরুকে নির্দেশ দিলেন—
''তুমিই সৃষ্টি করেছ অবয়ব তার,
এবারে সৃষ্টি করো জিক্-রু—উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী এক।
তাকেও অধিকার দাও সমতুল বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের।
দুজনেই হোক পরস্পরে যোগ্য অনুরূপ
যাতে উরুক অবশেষে শান্তি ফিরে পায়।''
সবকিছু শুনে আরুরু নিজের মধ্যেই সৃষ্টি করলেন
আনুর জিক্-রু এক।
নিজের হাতদুটি তিনি পরিষ্কার করলেন জলে,
কয়েকদানা মাটি তুলে ছুড়ে দিলেন অজানা গন্তব্যে।
তীব্র বন্যতার বীজ থেকে তিনি সৃষ্টি করলেন প্রবল এনকিদু,
নৈঃশব্দ্যের সন্তান, দেব নির্নুতার শক্তিতে প্রবল।
সারা দেহে মেঘের মতো রোম-কুঞ্চিত, ঘনসন্নিবেশ,
নারীর মস্তকের মতো লম্বিত কেশ;
মানব অথবা তার নগর-আবাস
সবকিছুই অজ্ঞাত তার।
একখণ্ড বস্ত্র শুধু গায়ে, যেন সুমুকান।
মৃগদের মতোই তার তৃণের অভ্যাস,
পশুদের সাথেই জলের উৎসের কাছে ভিড় করে সে,
পশুদের মতোই তৃষ্ণা মেটে তার নিঃসৃত জলে।

জলের উৎসের কাছে এক কুখ্যাত শিকারি হল মুখোমুখি তার।
একদিন, দ্বিতীয়দিন, এমনকী তৃতীয়দিনও
উৎসের বিপরীতে থেকে স্বচক্ষে দেখে নিল তাকে
আনুপূর্ব, খুঁটিনাটি সব।
ভয়ার্ত মেঘ ঢেকে দিল শিকারির মুখ,
এনকিদু আর তার যত পশু-সঙ্গীগণ
ধীরে ধীরে ফিরে গেল ঘরে।
ভয়ে স্থবির হয়ে গেল শিকারির দেহ,
হৃৎপিণ্ডে যেন ঝড়ের আহ্বান, বর্ণহীন মুখ।
দীর্ঘ পর্যটনে রত পথিকের মতো
যাবতীয় ক্লান্তি এসে কেড়ে নিল উদ্যম তার।
ঘরে ফিরে পিতাকে জানাল সে—
''পিতা, পাহাড়ের শীর্ষ থেকে নেমে এসেছে কেউ।
তার মতো শক্তি আর কারো নেই,
আনুলের উল্কার মতোই অসীম ক্ষমতা আছে তার।
পাহাড়ের চূড়ায় স্বচ্ছন্দে হেঁটে যায় সে,
জলের উৎসের মুখে জটলা করে পশুদের সাথে,
জলের প্রবাহের বিপরীতে স্থাপন করেছে নিজস্ব তার পদ।
বড় বেশি ভয় পেয়েছিলাম বলে
তার দিকে একটুও এগোইনি আমি।
যেসব গর্ত খুঁড়েছিলাম আমি শিকারের আগে
মুহূর্তে সবগুলো ভর্তি করে দিল সে,
যতগুলো ফাঁদ পাতা ছিল,
সবগুলো ছিন্ন করে মুক্ত করে দিল
জালে বাঁধা সমস্ত পশু।
আর কোনও সুযোগ দিল না আমায়
অরণ্যে যাতে নিশ্চিন্তে শিকার করতে পারি।''

পিতা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে—
''বাছা, উত্তরে ওই উরুক নগর,
সেখানেই বাস করে গিলগামেষ, বীর;
তার থেকে শক্তিমান আর কেউ নেই পৃথিবীতে।
আনুর উল্কার মতোই দুর্ধর্ষ সে।
যাও, যাত্রা করো উরুকের পথে,
অবহিত করো তাঁকে
এই নবীন শক্তির কথা।
তিনি তোমাকে নিশ্চিত দেবেন এক নারী,
চমকে দেয় যে চারিপাশ রমণীয় ছলনাতে।
তাকে সঙ্গে নিয়ে যেও।
সেই পারবে শুধু জয় করে নিতে অজ্ঞাত সেই মানুষটিকে,
কেননা নারীরাই শক্তিমান
যেকোনও পুরুষের থেকে।
যখন পশুরা একত্রে আসবে নেমে উৎসের জলে,
নারীটির বস্ত্র নিও খুলে,
প্রকাশ করে দিও তার কমনীয় দেহ।
একবার যদি দেখে
সেই অজ্ঞাত বীর
ধীরপায়ে পৌঁছে যাবে নিশ্চিত নারীটির কাছে।
হাহা বাছা, মুহূর্তে অরণ্যের পশুরা সব
তার কাছে অপরিচিত হয়ে যাবে।''

পিতার আদেশ মেনে শিকারির যাত্রা হল শুরু উরুকের পথে।
নগরীর পথ ঘুরে
অবশেষে উপনীত হল সেই প্রস্তর-আসনের কাছে,
যেখানে ঐশ্বরিক সিংহের মতো
গিলগামেষ নিজের প্রতাপ রাখে।
নতজানু, শিকারি একে একে বিবৃত করে দিল সব।
গিলগামেষ নীরবে শুনলেন বসে অভিজ্ঞতা তার;
ভ্রূ-যুগল কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত যেন।
তারপর মেঘের আবাস থেকে আনছেন টেনে
যাবতীয় শব্দপুঞ্জ তার
এমন ভঙ্গিতে বললেন তিনি—
''শিকারি, ওহে, তোমাকেই যেতে হবে ফিরে
পুনর্বার জলের উৎসের কাছে।
না, একাকী নয়;
তোমাকে সঙ্গে দেব এক অপরূপা নারী,
শরীরের বিচিত্র দোলনে সব
চারিপাশে যে ঝড় ডেকে আনতে পারে।
পশুরা যখনই আসবে সেই উৎসের মুখে
সযত্নে নিরাবৃতা করে
নারীটিকে এগিয়ে দিও একদম সম্মুখে।
একবার দেখতে পেলে
সেই অজ্ঞাত জীব নিশ্চিত ছুটে আসবে নারীটিকে ছুঁতে;
আর
যে সমস্ত অরণ্যের পশু
দিনরাত ঘিরে থাকে তাঁকে
মুহূর্তে তাদের ভুলে সে শুধু নারীকেই লক্ষ্য করে নেবে।"

নারীটিকে সঙ্গী করে শিকারি রওয়ানা হল নতুন শিকারে।
সহজতম নয়, সরাসরি, অতএব কিছুটা দুর্গম
এমন পথের খোঁজ তাদেরও অবগত ছিল।
তিনদিন ক্রমাগত চলে
অবশেষে উপনীত হল তারা বাঞ্ছিত স্থানে।
শিকারি ও তার শিকার-সঙ্গিনী
প্রথমেই খুঁজে নিল যার যার উপযুক্ত স্থান।
জলের উৎসের ঠিক বিপরীত দিকে।
প্রথমে বেরিয়ে এল পশুরা সব অরণ্যের গভীর থেকে,
জলের ধারায় মুছে নিতে তাদের তৃষ্ণার দাগ।
একদম শেষে এনকিদু, পর্বত-তনয়,
মৃগদের মতো যার তৃণের অভ্যাস,
জলের উৎসের কাছে রেখে যাবে বলে দিনাগত পিপাসাও তার
পশুদের দলে অনন্য একজন হয়ে।
নারীও দেখল তাকে—আদিম মানব এক,
সভ্যতার পরিচিতিহীন, যেন মরুর প্রবাসী।
শিকারি চাপাস্বরে বলে, যথেষ্ট উত্তেজিত সে—
''ওই! ওই সে। নিজেকে মুক্ত করো আবরণ থেকে,
নির্গত করো শরীরের ছলাকলা যত
যাতে সে নিজেকে দগ্ধ করতে পারে তোমার উত্তাপে।
সংকোচ রেখো না কোনও, সামান্যতম দ্বিধা;
যতক্ষণ পারো
ওর থেকে শুষে নাও শক্তির আকরিক যত।
তোমাকে দেখতে পেলেই—আবরণহীন,
পাথরের অজস্র কোণের মতো রহস্যময়ী—
নিশ্চিত আসবে হেঁটে শুধু তোমাকেই পেতে।
বসনটি উড়িয়ে দাও হাওয়ার ডানায়;
তাহলেই সে এসে তোমাকে সম্পূর্ণ পাবে।
আদিম এই মানুষটির সাথে
নারীত্বের কর্তব্যটুকু নিখুঁতভাবে পালন করতে হবে,
তোমাকেই, এইখানে।
তার সব সহগামী যারা, অরণ্যের পশুদের দল,
যার সাথে একসাথে বড় হয়েছে তারা,
মুহূর্তে অপরিচিত হয়ে যাবে
নারীত্বের সাথে প্রথম আলাপে।
শুধু তোমাকেই নিয়ে,
শুধু তোমাকেই ছুঁয়ে
ও আজীবন আর্তনাদ করে যাবে।"

ধীরে ধীরে তুলে ধরল নারী
মহার্ঘ যা কিছু আছে তার দৃষ্টি ও শরীরের পটে।
দুরন্ত ঝড়ের মুখে উড়ে যাওয়া পাতাদের মতো
নারীও ভাসিয়ে দিল আবরণ তার;
পাথরের দেয়ালে লেখা প্রতিমার মতো—
আহা, বড় বেশি উত্তেজক যেন।
আদিম মানব এসে সাগ্রহে মিলে গেল
নারীর শরীরে।
সুদীর্ঘ সাতটি দিন ধরে
এনকিদু শিখে নিল চুম্বনের জাদু,
কীভাবে প্রস্ফুটিত হয় স্তনের কোরক,
গভীর সুড়ঙ্গের শেষে
কতভাবে নিজেকে নিঃস্ব করা যায়।
নারীর শয্যায় যত উত্তেজনা আছে
সবকিছু অবগত হলে
তারপরে ফিরে যেতে হয়।
এনকিদু এইবারে তাই ফিরে যায় জলের উৎসের মুখে
যেখানে মৃগদল এখনো বিভোর হয়ে আছে
জলের সাক্ষাতে।
পায়ের আওয়াজে তারা চমকিয়ে ওঠে,
সতর্ক মুখে দেখে—আসছে মানব এক,
গায়ে তার রমণীর গন্ধ আছে মাখা।
ভয়ার্ত হরিণের দল মুহূর্তে লুকিয়ে পড়ে
পাথরের কঠিন আড়ালে।

যাবতীয় পশু, তার সব সঙ্গী যত জন্মের মুহূর্ত থেকে,
তারাও ক্রমশ পিছনে হাঁটে,
যেন অস্পৃশ্য দানবের প্রেত হঠাৎই এসেছে ছুটে
কলুষিত করে দেবে বলে
অরণ্যের পবিত্রতা যত।
এনকিদু চাইছিল ছুটে যেতে ঝড়ের বাতাসের মতো
ধাবমান পশুদের সঙ্গ নেবে বলে।
হায় রে, নিবিড় রমণ আর রমণীর আতিথ্য-দেহ
জানুকে স্থবির করেছে তার, যেন আদিম পাথর।
ছুটে যাওয়া এতখানি ক্লান্তিকর আর কবে ছিল!
কবে, এনকিদু ক্রমাগত পিছিয়েই যেত বাতাসের থেকে!
অবশেষে উপলব্ধি হয়—পৃথিবীর সব শক্তি নিতান্ত রিক্ত এখন।
পরাভব কখনও বা মনে আনে দর্শনের সূত্রের রেখা।
এনকিদু দাঁড়িয়ে পড়ে, কিছুটা বেড়েছে তবে অনুভূতি তার,
আবার শিথিল পায়ে ফিরে আসে নারীটির কাছে;
স্মিতহাসি মুখে, গায়ে তার বিজয়িনী-বাস,
রাজ্ঞীর মতো বসে সে পাথরের উপরে।
এনকিদু ধীরে ধীরে বসে তার পায়ের পাশে,
বাক্যহীন দেখে শুধু নারীর দৃপ্ত মুখ—কাজল নয়ন।
তারপর মৃদুস্বরে বলে—
''তুমিও কি চলে যাবে, এইভাবে,
দূরে, পাহাড়ের পিছনে রাখা তোমার আশ্রয়ে?''
নারীর কোমল হাত তার দুই গালে রাখে স্পর্শের তাপ;
তারপরে বলে
''এনকিদু, বীর, দ্যাখো, কী অপূর্ব হয়ে গেছ তুমি
শুধু এক নারীকে পরাজিত করে
তোমার পৌরুষের দাপে!
কেন ফিরে যাবে
অরণ্যের অন্ধকারে যাযাবর পশুদের সাথে
ফিরে পেতে হারানো সখ্যতা?
তোমাকেও নিয়ে যাব আমি উরুক নগরে,
নিয়ে যাব দেবালয়ে, আনু আর ইশথারের পবিত্র আবাস,
তারপরে নিয়ে যাব গিলগামেষের কাছে—
একতিল ত্রুটি নেই যার গভীর প্রজ্ঞায়,
তথাপি অবোধ, বন্য ষাঁড়ের মতো
নিজের ক্ষমতা প্রযুক্ত করে শুধু মানুষের দিকে।''
এনকিদু প্রত্যুত্তর করে—
''চলো, আমাকেও নিয়ে চলো সেই পবিত্র মন্দিরে,
নিয়ে চলো গিলগামেষের কাছে।
আমি তাকে ছুড়ে দেব দ্বন্দ্বের আহ্বান...
উরুকের জনপদে সদম্ভে ঘোষণা করে দেব—
আমিই প্রবলতম পৃথিবীর পরে।
নিয়ে চলো একবার শুধু নগরীর ভিতরে;
আমিই বদলে দেব যাবতীয় প্রথা;
কেননা জন্ম যার অরণ্যের গভীর শিকড়ে
পৃথিবীর সমস্ত শক্তি তার বাহুর আগলে।''
নারী তাকে বলে—
''চলো, একত্রে যাই, যাতে সে তোমাকে দেখতে পারে।
তোমাকে নিয়ে যাব যেখানে থাকতে পারে গিলগামেষ বসে।
ভাল করে দেখো, উরুকের প্রাচীরের ভিতরে
উজ্জ্বল বস্ত্রপরা নরনারী কত,
প্রতিটি দিন যেখানে উচ্ছল শুধু উৎসব-আলোয়,
যেখানে অবিরল বেজে যায় শুধু বাঁশি আর মৃদঙ্গ-ঢোলক,
নারীরা যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, আহা, দ্যাখো কত সুন্দর তারা,
রমণীয় সম্পদের ভারে তারা উদার লাস্যময়ী,
শুধুই হাসছে সুখে জীবনের নিবিড় লালনে,
আর শেষে রাত নেমে এলে
শয্যায় বস্ত্র পাতা হবে
অবাঞ্ছিত বস্ত্র সব বর্জিত হবে বলে।
এনকিদু, কীভাবে বাঁচতে হয়, অজ্ঞাত তোমার,
আমিই চিনিয়ে দেব কোনটি গিলগামেষ
যে শুধুই জানে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয়
অনুভূতি নিয়ে।
দ্যাখো তাকে, দ্যাখো তার মুখ
সুন্দর সে, যুবক, নবীন পাতার মতো সর্বদা সতেজ,
সর্বাঙ্গ থেকে বিকীর্ণ হয় যেন ইন্দ্রিয়ের তাপ।
দিনে রাতে নিদ্রাহীন,
তথাপি শক্তিতে প্রবলতর সে সর্বদা তোমার থেকে।
এনকিদু, তোমার ধারণা ভুল,
গিলগামেষই একমেব পুরুষ, প্রতিটি নারীই ভালবাসে যাকে,
দেব আনু, এনলিল আর লা প্রসারিত করেছেন হৃদয়ের পরিধি
তার
যাতে সে সকলকেই স্থান দিতে পারে।
পর্বতের শীর্ষ থেকে যখনও নামোনি তুমি অরণ্যের ভিড়ে
গিলগামেষ স্বপ্ন দেখেছিল
তোমারই মতন কেউ নেমে আসছে ধীরে।''

ঘুম থেকে জেগে শঙ্কিত গিলগামেষ
দ্রুত পায়ে গেল তার জননীর কাছে,
এবং জানাল তাঁকে—
''মাগো, কাল রাতে এক স্বপ্ন দেখেছি আমি,
আশ্চর্য স্বপ্ন এক।
দেখি, আকাশের সমস্ত তারা মুহূর্তে মুছে গেল,
অন্ধকার থেকে
আনুর উল্কার মতো কিছু একটা ছিটকে এল নীচে,
পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়ে পড়ল ঠিক আমারই পাশে,
আপ্রাণ চেষ্টা করে গেলাম দুহাতে তুলতে তাকে;
মাগো, গিলগামেষের শক্তির থেকে বড় বেশি ভারী।
চেষ্টা করলাম, যাতে উলটে দিতে পারি।
না, কিছুতেই কমানো গেল না তার স্ফীতি;

গিলগামেষ যেন বড় অসহায় তার ক্ষমতার কাছে।
উরুকের নাগরিক সব—
যাবতীয় বালবৃদ্ধবনিতা
সকলেই সমবেত হল সেই উল্কার কাছে,
তার সাথে জড়িয়ে নিল নিজেদের
যাতে আরো বেশি বড় হয়ে ওঠে সে।
যেন সে এক পবিত্র কিশোর, স্বয়ং স্বর্গ থেকে আসা—
এমন বিচিত্র ঢঙে
তারা সব চুম্বন করছে তার পায়ের পাতায়।
আমি তাকে ভালবেসে ফেলি, মাগো,
আপন বনিতার মতো জড়িয়ে ধরি তাকে।
তোমার পায়ের নীচে আমি রেখে দিই তাকে;
আর
তুমি তাকে বাধ্য করো
যাতে সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে।

রিমাত-নিনসান, গিলগামেষ-মাতা,
সর্বজ্ঞা, স্থিতাবুদ্ধি বলে যাকে সকলেই জানে,
উত্তর দিলেন স্মিতহাসি ধরে রেখে মুখে—
''শঙ্কার কারণ নেই কোনও, শোনো তুমি, বীর পুত্র আমার।
অবিলম্বে দেখা পাবে তুমি
প্রবল মানুষের এক,
সবথেকে বলবান যে মাটির উপরে,
সহযোদ্ধারূপে যার থেকে ভরসাযোগ্য আর কেউ নেই,
বন্ধুর পাশে যে সর্বদাই সহায়।
শক্তি তার আনুর উল্কার মতো।
তুমি তাকে ভালবেসেছিলে,
প্রতিদানে
সেও রক্ষা করবে তোমায় অদূর-ভবিষ্যতে।
স্বপ্ন তোমার শুভ;
আগামীর উজ্জ্বলতা লেখা
তোমার স্বপ্নের গায়ে।''

মায়ের চরণ ছুঁয়ে গিলগামেষ বলে—
''এনলিল—আত্মা মহান—যতকিছু নির্দেশ দেন,
সবকিছু পালনীয় জীবনে আমার।
তাহলে আসুক সে, সেই সহচর ও উপদেষ্টা একসাথে,
আসুক, আসুক সে,সহচর ও উপদেষ্টা আমার।''
নির্বাক এনকিদুর কাছে উচ্ছল রমণী
এভাবেই ব্যক্ত করে স্বপ্নের কথা,
গভীর ঘুমের মাঝে
গিলগামেষ দেখেছিল যতটুকু—
এমনকী পর্বতের নবীন তনয়
যখনও আসেনি এই অরণ্যের বুকে।

নিছক আত্মকথন নয়।
প্রিয় মানুষ, প্রিয় বই, প্রিয় ছবি ও গান
ছুঁয়ে ছুঁয়ে স্মৃতির রেকাব।

গদ্যগ্রন্থ

১৫, মেমারি লেন

আবীর মুখোপাধ্যায়

কৃতি

কুমার চক্রবর্তী

খ্রিস্টীয় কবরখানায়

খ্রিস্টীয় কবরখানায় হাঁটছিলাম, চিহ্নফলকগুলো তাকিয়ে ছিল চোখে চোখ রেখে, অথবা
আমিই বোধহয় ছিলাম তাকিয়ে তাদের নিঃসঙ্গ চেহারার দিকে। এখানে মৃতরা জীবিত—মৃত্যুতে, তারা তো গোধূলিশাসিত। আর মৃতদের অদৃশ্য প্রতীকগুলো দেখতে দেখতেই পুনরুত্থানের কথা মনে পড়ল আমার :
মৃত্যুর পর কী স্বরূপে আমাকে পুনরুত্থিত করা হবে? ধরে নিলাম যৌবনই ছিল আমার নজরকাড়া সময় কিন্তু তা ছিল দীর্ঘ বৃক্ষের খাঁজগুলোর মতো এক ও অসংখ্য, সুতরাং এই বহুত্ব থেকে একটি রূপকে কী করে বের করা হবে! আর ভালো করে চিন্তা করলে, যৌবন আবেগপ্রধান, নষ্টকাল, প্রকৃত সৌন্দর্য আসে যৌবনের পরে। কিন্তু প্রৌঢ় বা বৃদ্ধকাল স্বর্গসুখের জন্য প্রশস্ত নয়, জরাব্যাধি নিয়ে আর যা-ই হোক অমর্ত্যে যাওয়া অনৈতিক। এভাবে যৌবন ও বুড়োকালকে বাতিল করে আমি শৈশবে ফিরে গেলাম, হলাম এক শিশু, আর শিশুর মতোই ভাবনাহীন হয়ে পুনরুত্থানকে বাতিল করলাম, এবং নিজেকে ভস্ম করারই পরিকল্পনা করলাম যেন উড়ে উড়ে গিয়ে সমস্ত হারানো জীবনের জায়গাগুলোতে পৌঁছে যেতে পারি, যেখানে ছিলাম আমি—শিশু, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ : শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে আর বৃদ্ধকালে, যাতে এতসব স্মৃতির ভেতরে গিয়ে আমি আমার হারানো জীবনকে আবার খুঁজে পেতে পারি।

দীর্ঘ গাছের নীচে

দীর্ঘ গাছের নীচে হাঁটতে ভালোবাসি আমি। এখানে বৃক্ষপত্রালির অগোচরে কী এক গোপন ধরে রাখে তার অন্তর্মহিমা। ভালো লাগে আমার আকাশ আর পাতালের দিকে চলে যাওয়া দীর্ঘ গাছগুলো, যারা দৃশ্য থেকে দৃশ্যহীনতায় নিয়ে গেছে তাদের রূপ আর রূপান্তরকে।
আমার ভালো লাগে, ভালো লাগে আমার, লাগে আমার ভালো এই গাছের নীচে হাঁটতে, যেন আমি তাদের দীর্ঘত্ব থেকে চুপচাপ কিছু গ্রহণ করতে পারি, পারি সোজা আর সরল হয়ে উঠতে, পারি তাদেরই মতন স্থির এবং উদ্ভিন্ন হয়ে উঠতে। চিরটাকাল বামনদের সাথে থাকতে থাকতে কশেরুকা বেঁকে গেছে আমার, হারিয়েছি শস্যক্ষেত্রের ভাষাও। ছোট হয়ে যাওয়াতে পাখিরাও ছেড়ে গেছে আমায়। এখন হাড় আর স্নায়ুর মাঝখানে কী এক বাতাস এসে স্তব্ধ হয়ে থাকে। টের পাই আমি, ঠিক টের পাই। আজ এই দীর্ঘ গাছের নীচে এসে জীবন আমার খুলে দিয়েছে সব গুহারহস্যের দ্বার। আমার আত্মা এখানে বের হয়ে বন্ধুরই মতো আমার পাশে পাশে হাঁটে আর সপ্রতিভ গগনচারিতা দেখায়।
ভালো লাগছে আমার, এখানে, গাছের নীচে হাঁটতে, কেননা এই উলম্বতা গূঢ়ার্থব্যঞ্জক, আমাকে মুহূর্তেই দার্শনিক করে তোলে।

প্রকৃতিবিদ

নদীর পার ধরে হাঁটছি। এই ধীর বিকেলবেলায় নদী দেখে আমার স্বর্গের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল টাইটান আর অলিম্পিয়ানদের যুদ্ধের কথাও। নরকের কথাও মনে পড়ল, কেননা নরক ছাড়া স্বর্গ কোনো স্বয়ংক্রিয় চেতনা সৃষ্টি করে না। সোনামণিরা,কী বেশ্যা, কী মাগি, নাম যত খারাপই হোক না কেন, তোমরাই শ্রমকে করে তুললে নান্দনিক। যে আসে, সে খুশি মনে আসে, যে যায় সে খুশি মনে পয়সা ছুড়ে খুশি মনেই চলে যায়। পৃথিবীর আর কোথাও খুশি মনে টাকার কারবার চলে না। তোমরা কায়কারবারকেও করে তুললে স্মৃতিবহুল, আর অবলীলাময়।
গোপনে বেদনা জাগে। গোপনে। আলস্যশিথিলতা ভেঙে এখন আবারও হাঁটছি আলস্যশিথিলভাবে। নীচের দিকে তাকিয়ে হাঁটলে ঘাস হয়ে যেতে ইচ্ছে করে, উপরের দিকে তাকিয়ে হাঁটলে গাছ। এভাবেই ভেতরের দিকে যাই আমি, এবং প্রকৃতিবিদ হয়ে উঠি। আর যেইমাত্র তা হই, তখনই প্রকৃতিই আমাকে ছেড়ে দূরে চলে যায়।

কাব্যমাতাল

কবিতা লেখা কী অর্থহীন ও বিপজ্জনক, নিজের গোপনগভীর অন্যকে জানিয়ে দেওয়া! কিছু না হলে জীবিতাবস্থায় আত্মভস্ম গায়ে মেখে চুপচাপ বসে থাকা। আর হলেটলেও অপেক্ষা করতে হবে মৃত্যুর পর পর্যন্ত। কী আশ্চর্য, অমরত্বের জন্য আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়।
হওয়া না-হওয়ার মাঝে আজ সুস্থ থাকতে চাই আমরা, ভুলে যাই জীবন অসুস্থ করে, কবিতা আমাদের অসুস্থ করে, ফলে পূর্ববোধ আর অলীকত্ব থেকে মুক্ত হতে গিয়ে আমরা যন্ত্রণা আর শান্তির গলুইছুট নৌকায় উঠে যাই এখন আবার।
ঘুম পান করছিলাম আমরা। ঘুম। আর স্বপ্নের ভেতর কেঁদেও উঠেছিলাম শব্দহীন। কবি হতে গিয়ে কবিতাও পান করেছিলাম। আর এখন নিজেকে পান করে করে আমরা হই কাব্যমাতাল।

শামীম রেজা

জাতিস্মরের কবীর সুমন

ও বনে কেমন করে উল্কা ছুটাও গভীর ধ্যানে
ও চোখে হরিণ ছোটে গোপন বনে সংগোপনে।
কেমন করে নীরব ভাষায় ভালবাসার যুদ্ধ করো
চোখের জলে নদী ভাসাও, ছবির ছায়া বুকে ধরো।
সাধনা নদীর ধারে ও তুমি তিস্তামতী, বসে আছো হাজারবছর
আগুন-আগুন অনুভবে স্পর্শ করি হৃদয়সাগর।
ও তুমি কেমন করে ভালবাসার আগুননদী সাঁতরে গেলে
ভালবাসার উজানস্রোতে কেমন করে আমায় পেলে।
ছায়াকৃতি দূরে ভাসে ইচ্ছেনদীর অপার কূলে
তোমার ভিতর ঈশ্বরের রূপলাবণ্য দেখেছি, ভুলে।

মুজিব ইরম

চম্পুকাব্য

তোমাদের বাড়ি ফুল ফোটে। সেই নানা রঙ্গা ফুলের গন্ধ ছুটে ছুটে আসে, আর সরল অঙ্কে ভুল হয়, তৈলাক্ত বাঁশে বানরটি শুধু উঠে আর পিছলে যায়! ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত, পাটকে সোনালি আঁশ বলা হয়—এইসব সরল বাক্যের অনুবাদ পড়ি, আর ভুল করি। এই মন ফুলচাষি হতে চায়। করতে চায় ফুলের বাগান, যে-বাগানে তোমার নামেই নাইন-ও-ক্লক ফোটে, মোরগচোট ফোটে, গেন্ডা ফুল মনে হয় তোমার নামেই শীতরোদে হয়ে ওঠে বিনাশী হলুদ। লক্টন জবার রঙ, বাহারি কচুর ফুল, জিনিয়া-ডালিয়া আর রজনী-কামিনী ফোটে তোমাদের বাড়ি। আর আমি উঁকিঝুকি মারি, আর আমি তোমার হাতে ফুলচাষ, ফুলের বাগান দেখে দেখে আসি। অপেক্ষায় থাকি, কবে যে তুমিও একদিন দেখতে আসবে এই অধমের চাষ, ডেকে উঠবে চাষী, ডেকে উঠবে মালী। এই স্বপ্নে আগলে রাখি পড়ার টেবিল। এই স্বপ্নে ডেকে উঠি নাম, তোমার সুনাম। তোমার হাতের কাজে, ফুল তোলা রুমালের ভাঁজে মজে থাকে মন। এই মন খায়েস বাড়ায়, একদিন দিও তুমি ফুল তোলা রুমালের চিঠি—ফুল ফুটে ঝরে যায়, এই তার রীতি, মানুষ মরিয়া যায়, রেখে যায় স্মৃতি!

মাসুদ খান

মা

এই ধূলিওড়া অপরাহ্ণে,
দূরে, দিগন্তের একেবারে কাছাকাছি
ওই যে খোলা আকাশের নীচে একা শয্যা পেতে
শুয়ে আছেন—
তিনি আমার মা।
দূর্বা আর ডেটলের মিশ্র ঢেউয়ে, ঘ্রাণে রচিত সে-শয্যা।
নাকে নল, অক্সিজেন, বাহুতে স্যালাইন,
ক্যাথেটার—
এভাবে প্লাস্টিক-পলিথিনের লতায় গুল্মে
আস্তে-আস্তে
জড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি।
শয্যা ঘিরে অনেকদূর পর্যন্ত ধোঁয়া-ধোঁয়া
মিথ্যা-মিথ্যা আবহাওয়া।
মনে হল, বহুকাল পরে যেন গোধূলি নামছে
এইবার কিছু পাখি ও পতঙ্গ
তাদের উচ্ছল প্রগল্‌ভতা
অর্বাচীন সুরবোধ আর
অস্পষ্ট বিলাপরীতি নিয়ে
ভয়ে ভয়ে খুঁজছে আশ্রয় ওই প্লাস্টিকের ঝোপঝাড়ে,
দিগন্তের ধার ঘেঁষে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা
প্রাচীন মাতৃছায়ায়।

ফারুক ওয়াসিফ

প্রকৃতির প্রস্তাব

প্রকৃতির প্রস্তাবে আমিও তাহাই—মানুষ।
অধিকখানি জল কিছুটা অস্থিমাটি আমাকে খুঁড়িলেও পাইবে।
প্রকৃতির প্রস্তাবেই দৃষ্টি, নিদ্রা ও মৃত্যু ছাড়া আর সবই আমাকে শিক্ষা করিতে হয়। এ বাঁকপ্রধান ভঙ্গুর নদী, যার নাম জীবন, তা কত সম্পর্কের পরিখা দিয়া ঘেরা। সুবাহ-সন্ধ্যায় আমি সে সকল
যথারীতি প্রদক্ষিণ করি, তাহাদের উপশিরায় প্রবাহিত করি পীতরস।
যথারীতি আমি পুরুষ, প্রকৃতির প্রস্তাবে কিছুটা ধাতব—তাপ ও পীড়নে প্রসারণশীল। খরস্রোতে আমি শাণিত করি ছুরি।
আমার দু'চোখে দু'টি ছিন্ন শিমুলের কুঁড়ি। প্রকৃতির সরল প্রস্তাব হয়তো ইহাই ছিল যে, আমি লিখিব সমুদায় নীরবতা।
আমাকে তাই আর উচ্চারণ করিও না।

শাহেদ কায়েস

কয়লা

ওরা সত্যিই কি মানুষ না দানব?
চমকে তাকায় বনের প্রাণী, ওরা কারা!
ততদিনে পুষ্প-বৃক্ষ-বিহঙ্গ-নদীর শব...
চারদিকে ছড়ানো হাড়, পাখির পালক
উহারা কয়লা নিয়া খেলাধুলা করে—
শূন্যস্থানে কারা যেন গলাগলি করে...
ওই দেখা যায়—তুই উন্নয়ন, তুই উন্নয়ন!

পিয়াস মজিদ

ঈশ্বরীর দিকে অবিরত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন। আজকের বক্তা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। বিনয়ের ঈশ্বরী—সেই গায়ত্রী। বিশ্ববিদ্যাজগতের এক নারীনক্ষত্র। বক্তৃতা দিচ্ছেন গায়ত্রী আমাদের মনোকৌণিক অবভাস, ভাষার ছলনা, সাম্রাজ্যবাদী শয়তানি ইত্যাদি বিষয়ে আর আমার সব কেমনই গুলিয়ে যাচ্ছে কেবল। মান্না বসে ছিল পাশের শ্রোতা-সিটে। বলল 'বুঝছিস, চক্রবর্তীর চক্র থেকে হয়েছে বিনয়ের চাকা'। আরে তাই তো ... ফিরে এসো চাকা... রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে ফিরে আসো তুমি। বিনয় মজুমদার; আজকালকার আর্ট ফিল্মের শুরুতে রবীন্দ্র-নজরুল-জীবনানন্দের বদলে বিনয়ের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে ফিল্মমেকাররাও তাদের অতিআধুনিক কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতা জানান দিতে ভুলেন না। কিন্তু গায়ত্রী কি ভুলে গেছে বিনয়কে? সিনেট ভবনে এত এত বুদ্ধিভারী মানুষের মাঝে এই কথাটা তাকে জিজ্ঞেস করার জো নেই। হয়তো অঙ্কসুন্দরী মিস ফজিলতুন্নেসা যেমন নজরুলকে স্বীকার করেননি, গায়ত্রীও তেমনি। তবে কী আশ্চর্য এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে ফজিলতুন্নেসা হল আর এখানেই চিরতরে শুয়ে আছে নজরুল এবং এখানেই আজ বক্তৃতা করছেন বিনয়ের ফুল্লরা, বিনয়ের ঈশ্বরী—গায়ত্রী। না, ঘটল না কোনো আকস্মিকের খেলা, গায়ত্রীকে পেলাম না কাছাকাছি আমরা। বক্তৃতা শেষে গায়ত্রী চলে যাচ্ছে একটা সাদা গাড়িতে করে আর বিনয় মজুমদারের অতিকালো ভূত শিমুলপুরে বসে এ খরজ্যৈষ্ঠে লিখে চলেছেন অবিরাম ঈশ্বরীর উদ্দেশে তার অঘ্রাণ অনুভূতিমালা।

শামসেত তাবরেজি

জন্মকাহিনি

কলস ভাসা গাঙে ডুব দিয়ে ঘুম ভাঙে
শ্যাওলাদলে রঙ্গ করে অতি,
আঁশ ছাড়ানো মাছ উল্টাসিধা নাচ
জানে না কো কঠিন পরিণতি!
বালিশ ভেজা রাতে বড়শি লয়ে হাতে
ছুটল আমার ধীবর যুবরাজ,
একটা কিছু হবে জলীয় রৌরবে
তিন ভুবনের শ্লিষ্ট মন্তাজ।
শিরায় জাগা চাঁদে গুপ্ত শেহেরজাদে
রুইয়ে দিল আত্মলীনার বীজ,
বর্ণরঞ্জনাতে ফুটল মাংস তাতে
কী মনোহর রাতুল মনসিজ!

জিললুর রহমান

জার্নালিস্ট

কেরামান কাতেবিন পাহারায় রাত্রিদিন
সিসিটিভি নিদ্রাহীন হিসেবের খাতা
মনুষ্যের জন্ম আহা ভাল কাজ মন্দ কর্ম
ঘরেদোরে বিছানাতে লজ্জাহীন যথা
এখন তাদের কাছে শিখেছে যুবক বৃদ্ধ
দৃষ্টি রাখে নিষ্পলক বোধশূন্য প্রতিটি ঘটনা
কে মরে কে রিপুর শিকার আজ—নিস্তেজতা প্রতিক্ষণে
চারিদিকে যত না রটনা
তারোপরে চুরি যায় ইমানের খুঁটিগুলো
টেবিলের তলে তলে বখশিশ ঘুষের খেলা
শহরে গড়ায় জল অনর্গল পাখি ওড়ে
গাড়ি ঘুরে—অহর্নিশি স্রোতোন্মত্ত মানুষের মেলা
কোথাও বটের গাছ সেজে আছে বৃহন্নলা—আহা মাতৃভূমি
চারিদিকে হিজড়া হিজল
নোটবুকে পাপপুণ্য টুকে রাখে নিরাবেগ—সামনে কত
সিনেমার মতো ঘটেছে চঞ্চল
হত্যা কি ধর্ষণ তাতে কী-বা যায় কী-বা আসে
কেবল হিসেব টুকে অপলক দেখে
প্রান্তরের পড়ে থাকা হিম দেহ রক্তভেজা
ফেলেই উড়াল মারে স্বর্গ সোপানের দিকে

হাসান রোবায়েত

কবিতা

কথার সবটা শেষ হয়ে গেলে একা চেয়ে থাকি—
ঘাসের মৃত্যুতে মাটি কি
কেঁদেছে কোনোদিন! যদি সুবিল পেরিয়ে চলে যাই
মোনামুনি গাছটার খোঁজে
তবে কারা এসে মুখ থেকে এ মূকাভিনয় ফেলে ছুড়ে
দেবে গান! এখানে ফড়িং
এসে শুধু গড়িয়ে দিয়েছে ঘুম—অস্থির
নক্ষত্রমান এক পাখি সারাবেলা ঠোঁট
ঘষে আলেয়ায় যেন এই অশোক গাছের থেকে
পেয়েছে কাঠের চোখ তাই যতটুকু
দেখে সেটুকু সন্তান তার!
পাতার গভীর জানে কীভাবে সাকিন ভুলে কীর্ণ
অন্ধকারে উড়ে যায় মাতৃভাষা,
তারাও নির্জনে খোঁজ রাখে ক্রীত আয়নায় মানুষ
প্রথমে দেখে নিজের উদ্বেগ, আর
বিস্মরণ, স্থির কুকুরের পাশে গোল হয়ে ওড়ে—

মাহমুদ টোকন

মহাত্মন

মাটির ভেতর যত লুকোনো কাহিনি আমি জানি
থরে থরে সাজানো অঙ্কুর, তার পাশে আলতো শুয়ে আছে
অন্ধকার। জীবনের মতো, মৃত্যুর মতো, ছাপোষা কাহিনি।

কী শেখাবে বিদ্যালয়? কী বিষাদ আরও আঁকা বাকি?
যুক্তি-তর্ক প্রযুক্তির শামিয়ানা তলে
জন্ম। যন্ত্র কিংবা যন্ত্রের বিভাজনরেখা। সম্পর্কের পাশে
নিযুত সংখ্যারূপ-বিচ্ছেদ গণিত। চারপাশে ভাঙাচোরা
আকাশ আর ছিন্নমূল শোকের সংগীত।

পোড়োবাড়ির মতো একেকটি ফ্ল্যাট, কবরের মতো নীরবতা।
সম্পর্কহীন শিশুতোষ। মায়ের বহুগামিতা, জনকের আকণ্ঠ
নিমজ্জন
কী আশ্চর্য কী তমসাময়। কী আছে সূত্রে গাঁথা
শিক্ষা নিকেতন? আনন্দ খুনেদল প্রাত্যহিক কথা বেঁচে ফেরে।

কী শেখাবে চৌকাঠ, এখনও ফাঁসির দড়ি? অন্ধের প্রার্থনা?
পাতায় পাতায় ভরা অশ্রুজল ভিজিয়েছে ঈশ্বর চিবুক
বুকের গোপনে যারা রেখে গেছে, নীলরঙ, সামান্য আগুন
স্মৃতি আঁকড়ে অবনত ধস্ত তরুণ।
জামরঙ শাড়ি দেখে বার বার মায়ের ডালপালা, ঝাপটাচ্ছে
তারপাশে মেঘ। ঘাসের মতন কোনো সবুজ অন্ধকার
ঘন হয়ে খুলে দিচ্ছে জামার বোতাম,শেষ দমে শুষে নাও
যতটুকু পারো সকরুণ, ওগো সকরুণ।

শিখে গেছে ঝাউগাছ সমুদ্রের লবণসংবাদ। শিলাখণ্ড জমে জমে
ইতিহাস বেড়ালের মতো, নিঃশব্দ পায়ে এসে শিখেছে শিকার।
পাতার ঝুমঝুমি, শান্ত থাকে ভিনদেশী পর্যটক এলে
শিখেছে তাদের গান নোনাধরা বারান্দায় বেড়ে ওঠা অচ্ছুত
মানুষ।
বাড়ি ফিরে যাও বলি, বাড়ি ফিরে যাও বিভ্রম। বাড়ি ফেরো
হে বুনো মাতাল। শান্ত হয়ে বসে থাকো জনক-জননী ব্রাত্যঘাম
পাথরে পাথরে ঘষে আবিষ্কার আজও কম্পমান। সময় সম্পাদ্যে
তুল্য
যা কিছু মহান...

এঁকে দিলে সবচিহ্ন যদি হয় খামারের যিশু শিশুতোষ
সকল সংসার যদি আদ্যোপান্ত রোদ্দুরে ভুলগান
ফেরার যে ছায়াপথ আচ্ছাদিত হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ
জীবাশ্মে জীবাশ্মে জমে বিলুপ্তির মায়া আখ্যান।

কী তবে অধ্যয়ন, কতটুকু মহাকাল জঠরে তোমার
নিরেট পাথরগল্প আর কিছু দ্বন্দ্বসাম্পান।
আরও কী শেখাবে তুমি আরও বলো কী শেখার বাকি
আমরা সবাই আগুন... আমরা সবাই জল...আমরা একাকী...

নাজনীন খলিল

অঝোর বৃষ্টি নামুক

আজ এমন মনপোড়ানো চাঁদ উঠল কেন?
জ্যোৎস্নার তীব্র কলরবে ভেসে যাচ্ছে চরাচর।
চাঁদনি চাইনি।
বৃষ্টি চেয়েছি।

আজ এই শহরে অঝোর বৃষ্টি নামুক।
সবুজপাতারা সারাদিন বৃষ্টিপ্রত্যাশায় আছে।
বাচাল এক টুকরো ঝড়োহাওয়া নীপবনের গল্প শোনাতে এলে,
বলি—চুপ করে থাকো না আরো কিছুটা সময়।
মেঘের ভেলায় চড়ে বৃষ্টিধারায়

নেমে যাবে একঝাঁক সাদা রাজহাঁস;
কোলাহলে থমকে গেলে, ফিরে যেতে পারে।

যখন কাশগুচ্ছমেঘদল ভিড় করেছিল
কামিনীঝোপের মাথার উপরে; দেখা হয়নি।
অন্যমনে ভাবছি তখন অঝোরবর্ষণের কথা।
এই অভিমানে জলরাশি দূরে সরে গেছে; জানা হল না।

আজ তুমুল বেজে যাচ্ছে বৃষ্টিশৈশবের স্মৃতিমেদুরতা।
ভীষণ দুলছে কাগজের নাও;
অতলজলের দেশে মৎস্যকন্যা;
নোলক হারিয়ে গেছে পাতালপুরিতে;
প্রবল ধারার ভেতরে রেণু রেণু ছড়িয়ে গেল,
প্রথম কদমদিনের পাপড়িগুলো।

এক খণ্ড অলস উড়োমেঘে খুব উদাসীনতায় ঈশানকোণের দিকে
উড়ে গেলে ... মনে হল আজ আর বৃষ্টি হবে না।
চাতকেরা অভিশাপ ছড়াতে ছড়াতে দূরনীলিমার পথে
হারিয়ে গেলে
বাতাসের মীড়ে মীড়ে মিশে গেল বিষাদের সুর।

ধারামগ্নতায় জলপাহাড় গড়েছি আজ সারাটা বিকেল
ছড়িয়ে দিয়েছি ঘাসে ঘাসে
ফড়িংয়ের ঠোঁটে ঠোঁটে সেই শুভসংবাদ পৌঁছে গেছে
গাছে গাছে, লতায় পাতায়;
কেতকীকেয়ার ফুটি ফুটি কুঁড়িগুলো প্রতীক্ষায় আছে।
আজ কেন তবে বৃষ্টি হবে না?

আজ এই শহরে অঝোর বৃষ্টি নামুক।
রাতের আকাশ চিরে বেজে যাক জলঝরনামৃদঙ্গের তান।

''বিশ্বাসকে হতে দাও আমার ঢাল
আনন্দকে আমার তুখোড় যুদ্ধাশ্ব''

বেলাল চৌধুরী

সানাউল্লাহ সাগর

জন্মদিন

আজ তোমার জন্মদিন। বরষার অভিমান ছুটি দিয়ে গুছিয়েছি নৃত্যের শোক! এমন একটা ব্যাপার—পৃথিবীতে যেন আর জন্মদিন হয়নি কোনোদিন! নদী-ফুল-পাখি—এমনকী সাপেরও জন্মদিন হয়। অথচ তোমার জন্মদিন এলে আমি বোবাপাখি হয়ে যাই। ভুলে যাই আমারো একটা জন্মদিন আছে...

আজ আয়োজন করে ঘুমকে ছুটি দিয়েছি—ঘণ্টা হিসেব করে সুখকে উপোস সাজিয়েছি। বালি ও মগজের সমতা বিধান এদিনেই একাকার হয়ে গেছে! চুপ মেরে ফিরে যাওয়া বিকেলকে বলে রেখেছি—আজ রাতে তুমি এলে কেউ যেন আর কেঁদে না ওঠে। তুমি আমার ঘুম হলে বেশ ভালো হত; তোমার চোখে তাকিয়ে ঘুম ভুলে যেতাম...

আজ তোমার জন্মদিন—
মৃত্যুর সীমানা পেরিয়ে আমাদের জ্বর হাসিয়ে রাখুক যুদ্ধাহত প্রাণীসকল;
...অপেক্ষা করছি কালো কোর্তা দাঁড়িয়ে হাসলে—আমি আরেকবার জন্মলাভ করব...

বীরেন মুখার্জী

রেসের ঘোড়ার মতো সন্ধ্যা নামে

রেসের ঘোড়ার মতো সন্ধ্যা নামে;

আমি দেখি—
নৈঃশব্দের ঝড়ে ওড়ে কারও তীক্ষ্ণচোখ
বিষাদ লুকিয়ে ছুটে চলি তার দিকে,
সময়ের কাছেই গচ্ছিত রাখি
ক্ষতদীর্ণ যত দীর্ঘশ্বাস।

আমি বলি—
এই মৃত্যুগন্ধা বুকের ভেতর
স্মৃতির কফিন জুড়ে অহোরাত্র
বাজাও তোমার বিচিত্র খেয়াল...

অথচ,
রাতশেষে নিশ্চিত প্রত্যুষ
ভেঙে যায়—রঙের উৎসব।

নভেরা হোসেন

হে পাতক, হে প্রেমিক

যখন ঘৃণা এবং অপমান তোমাকে ছেয়ে ফেলবে
রাতগুলো বালিশের কোনায় লুকাবে কান্না
আমি তখনও তোমায় বাঁচাতে চাই
শত শত বোমা আর রাইফেলের শব্দে
যখন প্রকম্পিত হবে শহরের প্রতিটি রাস্তা
যখন জল আর পারদের মাঝে কোনো ফারাক থাকবে না
রক্ত হবে পানীয়
আমি তখনও তোমাকে বাঁচাতে চাই
প্রতিটি মাঠ যখন হাশরের ময়দান হয়ে যাবে
নমরুদ বেড়াবে আতশবাজি,
তুমি যখন পালিয়ে বেড়াবে পাহাড়ের নাভিস্থলে
হে পাতক আমি তখনও তোমাকে বাঁচাতে চাই
প্রেম যখন ঘৃণায় পরিণত হবে
আমি তখনও তোমাকে বাঁচাতে চাই
হে মানব
তখনও তোমাকে বাঁচাতে চাই
হে মানবী

বিজয় ঘোষ

লীলাবতী কিংবা আফ্রোদিতি কথা

পৃথিবীর উলটো পিঠে কী আছে? সাতটি মৃত তারা। অস্থির নদী।
নাকি নরকভূমি? চলো একবার দেখে আসি। মৃত সব বিষ জড়িয়ে
ধরেছে আমাকে। আমি মৃত্যুটা উপভোগ করতে চাই। বৃষ্টির মতো
গায় মেখে। আফ্রোদিতি আমি তোমাকে ভালোবাসি। রতির চেয়েও তুমি সুন্দরী? সেক্সি? তোমাকে কামনা করি।

আমার কামনা ঈশ্বরী দূর আকাশের ছয়টি কাকের ভিড়ে মিশে আছে। আফ্রোদিতি তুমিই আমার কামনা। কিংবা ঈশ্বরী।

পৃথিবীর উলটো পিঠে আছে যত কামনা। মৃত সব নদী।
সুন্দরী হুরিরা আপাতত বেহেস্তে ধূমপানে রত। আকাশ থেকে সোমরস ঝরে পড়লে আমিও বেহেস্তে যাব। পুষ্পক রথে চড়ে।

আয়। আয়। আমার বকুল ফুল। পৃথিবীর উলটো পিঠটা দেখে নিই। মৃত্যুটা চেখে নিতে নিতে সেখানেই যাব। নাগরাজকন্যা উলুপি আমার অন্তর্জাল বন্ধু। আফ্রোদিতির সঙ্গে চ্যাটিং করি। ভালোবাসা ভালোবাসা খেলি নিঝুমরাতে।

পার্থ ঘোষ

নীলরঙা মাছির গপ্পো

কাঁঠালের হলুদ ভূতি ভাস্ মারে
ভনভন নীলরঙা মাছি
স্থিতধী গাছ চেয়ে দ্যাখে নরক যাপন।
খয়রাতি হাওয়ায় একে একে
মুছে যাচ্ছে যাবতীয় আলো
সমস্ত বাতিস্তম্ভে এ'পাড়ায় ও'পাড়ায়
ঝান্ডা বদল। পাল্টে যাচ্ছে মুখ—
দুনিয়ার মেহনতি হাত
পুরনো পোস্টার ছিঁড়ে
আগুনে সেঁকে আয়ু—চাটে উত্তাপ
অসুখে-বিসুখে ভোগা তোমার ভবিষ্যৎ
চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে কপাল ফোলায়
কপাল জুড়ে চাঁদ
চাঁদকপালী দেশ আমার
ঘরে ঘরে আজ গণতান্ত্রিক কাঁঠাল
ঘিরে—নীলরঙা মাছি ভন্ ভন্ করে...

অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায়

রাখালরাজা

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সেই...
ফিরছিলে বুঝি সেরে শান্তিনিকেতন,
সপ্তাহান্তে,
সঙ্গে বুঝি বাদলবাবুরা, নাকি ছিল আর কেউ?
আমি শুধু চোরা চোখে দেখেছি সম্রাট এক, গল্পে মশগুল,
তবু চোখ জানালা ছাড়িয়ে খোঁজে দিকশূন্যপুর।
হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সেই, হাওড়াতে গাড়ি ঢুকল যেই,
উপরের বাঙ্কে রাখা লাগেজ নামাতে, তুমি ফের দাঁড়িয়েছ,
অমনি এক লাফে,
হঠ্ যাও মহারাজ, নাদান য়ে বান্দা কিস কাম্
তুমি বলছ, না, না, আমি নিজে...
তবু চোখে অনুনয় দেখে স্মিত হাস্যে থমকে দাঁড়াও রাজকীয়।
আমি সে-ই মহারাজ, শেষের যেদিন, চিরকাল যেরকম টিকিটবিহীন,
দিকশূন্যপুরে পৌঁছে গেলে, নির্জন স্টেশনে রিকশা নেই...
আমার সাইকেল ছিল, কী হবে অপেক্ষা করে বাসে...
অগ্নিকাণ্ড হয়ে আছে শিমুলে-পলাশে
তার মধ্যে ভেসে... তোমাকে পৌঁছিয়ে দিলাম ...বেলাবেলি।

সেই থেকে সাইকেল পড়ে আছে, কে হবে সওয়ার?
ধূপধুনো দিয়ে রাখি ... রাজা শুধু এসো একবার
না হয় না হবে ফেরা, মেলাব এ বেসুরো গলা-ই
এবার তোমার সাথে দিকশূন্যপুরে চলো যাই ...

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা

১

তোমার অপেক্ষার পাশে দাঁড়িয়ে আছি।
অন্ধকার বারান্দার গ্রিল।
শহর ছুঁয়ে থাকা আলো
তোমাকে অবয়ব দিয়েছে।
ছায়া দুলছে দীর্ঘ ছায়া ঘোলাটে হলুদ ছায়া।
ভোঁতা ছায়া দুলছে কাঁপছে ঈষৎ।
তোমাকে নৌকার মতো লাগছে
সুতো হয়ে আসা হাত মাস্তুল
ফুলে উঠছে হাফ হাতা ফতুয়া।
ক্রিমরঙা অপেক্ষা ফুঁপিয়ে উঠছে থেকে থেকে।
আমিও হাত বাড়াচ্ছি স্রোতের এপাশে
আঙুল পৌঁছচ্ছে না।
নখ কোনো কথা বলছে না লালচে
কেবল জরাসন্ধ ঠেস দিয়ে আছে কাচের করাতে।

২

অপেক্ষা আর উপেক্ষা
দুই শস্যের ডাকনাম।
এ বুকে দাঁড় চালাই
এ বুকে সুখ মেলে না।
কোনো জমি নেই
সাদা খই সাদা খই আগুন হয়েছে.
পোড়া ঘি বাতাসে ভাসছে
কোনো পাখি নেই নিজস্ব উড়ানে।
তুমি বড্ড ভালোবাসো সবুজ
বৃষ্টি আর নরম ছোঁয়াকে।
ছাই হয়ে যাওয়া অপেক্ষার পাশে আমি রেখে
আসব ভাঙা সাইকেল, ওড়ার ইচ্ছে
আর খোলস বাঙ্ময়।

৩

নদী যাচ্ছে নিজের মতো।
ঘাসের জঙ্গল পেরিয়ে সেদিন
কয়েকটা শিয়াল এসেছিল
হাড়ভস্মের সরার সঙ্গে
ভেসে ভেসে চলেছিল সারারাত।
আমার শহরের নদী তুমি রোজ
আধপোড়া হাড় নাভি খাও
শবের হিম মাঠ তোমার শরীর জুড়ে।
অপূর্ব স্নানে তাই লেগে থাকে
মৃত মাংস অর্জিত চর্বির স্নেহ।

৪

তোমার চোখের উপর জেগে থাকছে মুখ।
যতবার চোখ তুলি আনত থাকে দৃশ্যবৃন্তগুলি।
এই হাত মাখিয়েছে ঘিয়ের শরীর
কালো তিল, কলা, মন্ত্র আর যবের মণ্ড।
এক কুঁচিধারী নদী সহস্র হয়ে
বয়েছিল এক হওয়া কয়েকটি নিশ্বাস।
কাদা আর ধোঁয়ার ভেতর পোড়ামাংস ছাল
তুমি ছড়িয়ে পড়েছ টুপটাপ গড়িয়ে পড়েছ আমাদের
ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবির শীলুটে।
এত ধূপ, অগুরু চন্দন, জড়ো হওয়া কুক্কুরী পরিবার সরিয়ে
সত্যি বলো আমার কি একবারও জন্ম হবে না!

সোনালী মিত্র

স্বপ্নবর্জিত

তোমাকে স্বপ্নবর্জিত ভাবলাম
তখনি ছুড়ে দিলে মুঠো মুঠো অসন্তোষ
নগরের সর্বস্ব উষ্ণতা নিয়ে আবার তোমাকে ছুঁতেই
অমনি আশুতোষ ক্ষুধায় জ্বলে গেল তুরুপ অঙ্গ

তোমার বুকের ঐশ্বর্যে গলে গেল সূর্য গঠিত বাহু
তখনি তুমি অপ্সরা সাধনায় ভরিয়ে তুল্লে ইন্দ্রপ্রস্থ
অবলীলায় কেমন দৈব হয়ে উঠলে
আর আমি প্রথম যজ্ঞ মর্ত্যআগুন,
আহুতি নাও দেবী আমার!

বাস্তব হও নারী...
শব্দের মধ্যে বয়ে গেছে কয়েকশো আর্ত অগ্ন্যুৎপাত
তুমি জাতিস্মরে রেখে যাচ্ছ গত জন্মের ঈশ্বরী নাভিশোক
আমি জন্মান্তরে হেঁটে যাচ্ছি বাস্তববর্জিত তুমি...

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

নদীকথা

জল ও সাঁতারের চাবিকাঠি
এখন আমার হাতে
ভৌগোলিক পথ সাঁতরে
পৌঁছতে চাইছি
        জলরঙা নদী উপত্যকায়
দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে
প্রকৃতি ডোবানো সংলাপ
কাকে নেব তবে, এ জলজ বিহারে
        অন্তর্গত নির্জনে
প্রতিশ্রুতি ছাড়াই দেখা হল
গোপন নদীটির সাথে
        খিলখিল হাসিঠাট্টায়
প্রকারান্তরে জল ও সাঁতারের সাথে
বন্ধুত্ব পাতিয়ে, বেখেয়ালে আবারও
শুনি, গুনগুন জলস্পন্দন
        অনেকখানি বিকেল দৃশ্য
কবিতার অকপটে আমাদের
        সেই জরুরি বাক্যালাপ...

পীযূষকান্তি বিশ্বাস

হাত

যে আঙুল শিলালিপির কথা বলে,
সিংহল সমুদ্র থেকে উঠে আসা উচ্ছ্বাস
এই হাত এক মানচিত্র,
এই হাত এক ইতিহাস
এই হাত এক রং, তুলি, হাতুড়ি, বাটালি
কোরা কাগজ, কলমের গভীর থেকে
        ছলকে ওঠা কালি।
এমনই এক হাতের কাছে
কবি এক গল্প, অর্বাচীন
এক ধারণা নিয়ে এক উপমার অবতারণা,
তাকে লিখে ফেলা দুস্তর কঠিন।
এক তাড়না থেকে এক মুক্তির খোঁজ
        চেতনা ঘিরে আসা অবিসংবাদী বোধ
পৃথিবীর আর এক অন্ধকার থেকে
        তীব্রবেগে ছুটে আসা রোদ।
গতির তীক্ষ্ণতা নিয়ে আমার মাঝে মাঝে
আঙুলের সাথে কথা হয়,
বোধগম্যের তারতম্য নিয়ে
        তাপমাত্রার উঠানামা নিয়ে,
কলম লিখে নিতে চায় ত্বরণজাত যাবতীয় বেগ
এক উত্তাপ আর এক পিপাসা নিয়ে,
এক বৃষ্টির স্বপ্নে ঘেরা সমস্ত সন্তানসম্ভবা মেঘ।
এক চিঙ্গারী উপচে আসে
        উষ্ণ-আর্দ্র ঠোঁটে
কবিতায় আগুন লেগে যায়
নিকাল আতা হে খুন,
        আঙুল ঝলসে ওঠে।
কলমে দৌড়ে আসে প্রাণ
        যেন ঝরনা ছুটে আসে,
ক্যানভাসে দারুণ তুষারপাত
তুলি থেকে ফিদ্দ ছুটে যায় রং,
আঙুলের সংঘবদ্ধ সারি
        ফিরে এসে একবার আঁকড়ে ধরে হাত।
কবি
চেতনার স্পর্শবিন্দু দিয়ে
        তীক্ষ্ণ করে তোলা এক বোধ
সবুজ-পান্না-রং জন্ম নিয়ে তার কবিতা কথা কয়
সময় পার করে যেতে চাওয়া তার এ কাব্য
হাত খুলে কাউকে তবু তো
        তা লিখে যেতে হয়
হাত
সে তো নয় সির্ফ নির্জীব কারিগর
হাত তো কোনো জীবনানন্দ নয়
সন্তানের মুখ ধরে চুমু খেতে চাওয়া
হাত এক বীজ সন্তানসম্ভাবনাময়।
এই এতটা পথ এসে বুঝি
        হাত এক বিস্মৃত অভিলাষ
আঙুলের স্পর্শ ভুলে যায় কবিতা
রাস্তা পার করে যায় মুঠো মুঠো ইতিহাস
রাস্তা তো সির্ফ এক রাস্তা মাত্র
বরং
মাইলফলকের পরিমাপযোগ্যতা নিয়ে
        উঠে আসে অভিঘাত,
দেশ, কাল, কবি, মানচিত্র ছিঁড়ে
মুঠো ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চায় এই হাত।

নির্মাল্য বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্টুনের রাত

‘দশটা বেজে গেল, চল বাড়ি’
ট্যাভার্ন বলে তাকে, ‘করবি কী?
হ্যাগার-হরিবল, লুটমারি?
হেল্লা, লাকি এডি, সব মেকি!”
‘চাক্ দে’ ফুটব্রিজ পেরিয়ে যায়
স্মৃতিতে আলো আছে, শরীরে নেই।
যদিও এই রাতে মরতে চায়,
পায়ে-পা মার্চপাস্ট সাবধানেই।
মৃত্যু কেন এত সহজ নয়?
মৃত্যু তুমি বুঝি মার্গারেট?
ডেনিস আমি, তোকে এড়াতে চাই
লগ অফ্ করে আজ ইন্টারনেট!
সর্ষে নাকি কাঁটা পায়ের নীচে!
না বুঝে ক্রমাগত হারিয়ে যায়
অবুঝ, কার্টুন এক ক্যারেক্টার
ঝাপসা-চোখ কোন অনামিকায়!

‘কবিতা আশ্রম’

অনলাইনে পড়ুন।

ওয়েবসাইট

kabitaashram.wordpress.com

****

আমাদের মেইল আই-ডি

kabitaashram@gmail.com

সংগ্রহ করুন

কাব্যগ্রন্থ

মোম ● সন্দীপ বিশ্বাস

চাঁদ লাগা চৌষট্টি আশমান ● সমীরণ ঘোষ

অপারেশন থিয়েটার ● নাসের হোসেন

আয় পাখি ধান খা ● কবিরুল ইসলাম কঙ্ক

কথার কথা ও অন্য কবিতা ● অভিজিৎ রায়

গদ্যগ্রন্থ

কাচের ছায়া ● অমিতাভ মৈত্র

উপন্যাস

মহাসাগরের জল ● বিপ্লব চক্রবর্তী

আলকাপ প্রকাশনী

বই পেতে ও প্রকাশের জন্য

যোগাযোগ করুন : ৯৮০০০৮৯৩৭৫

অনুপম মুখোপাধ্যায়

পাঁচটি পুনরাধুনিক কবিতা

কফ্-ফড়িঙ

।
যে ফড়িঙ। স্থির আছে
বাতাসের চোখে
বাতাসের নখ
তাকে
রেহাই দেবে কি
।
সুবিধার মুখে তুমি
~~পাখি~~ কাশি
হয়ে থাকো
।
শ্লেষ্মার ডানা হয়
আমি। জেনে গেছি
।
পাটাতনে ~~জিজ্ঞাসার~~ কুঠারের
বরফ। জমেছে
স্টীমার
এগোচ্ছে
সিরাপের দিকে
।

রুপার হার রুপার হাড়

।
যে। ~~আমাকে~~ দেখিয়েছে
বোঝাতে পারেনি
কোন অপশন থেকে
কী আলো এসেছে
।
সাধারণ ছায়া। থেকে
সাহায্য চেয়েছি
।
সবুজ সমাধি থেকে
ট্রেনে
উঠতে চেয়েছি
লাল। সমাধি থেকে
।
ট্রেনে
।
উঠতে চেয়েছি
।
রুপার হাড়। আর
রুপার হার
~~আমি~~
হাহাহাহাহাহাহা
লুকিয়ে রেখেছি
।

ডাব্লিউ

।
ডাব্লিউ ১টা। অপরূপ
ডিগবাজির নাম
।
হে বঙ্গ
তোমার কোনো
ডাব্লিউ
~~নেই~~ নাই
।
বাংলার পুকুরে। কোনো
অক্টোপাস
নেই
।
কফিমগ
ছুঁয়ে গেছে
টেলিফোন তার
।
এসো। আজ
।
দূর হই
বাংলাকথা করি
।

কী-বোর্ড

।
কী-বোর্ড তুমি আমার
হাতের অংশ
।
২০ বছর বয়সে
বাঁচতে চেয়েছি
।
~~মসজিদ~~ মন্দির ছুঁয়ে
তোমাকে
মিথ্যা বলি না
।
~~মন্দির~~ মসজিদ ছুঁয়ে
তোমাকে মিথ্যা। বলি না
।
শীতের সকাল
এই চোখ। লাল
।
কী-বোর্ড। তুমি
আমার চোখের
।
অংশ
।
৩০ বছর বয়সে
বাঁচতে চেয়েছি
।

জন্মান্তর

।
সমুদ্র। গরম হলে মা-মা লাগে
নরম পৃথিবী
।
স্টোভে লেগে থাকা কিছু
চা-পাতার দাগ
।
যথা
।
কাজল ঘিরেছে
।
আমি। বুঝি
~~আমার~~ তোমার চোখে
আমার মেয়ের কোলে
।
মেয়ে
~~ছেলে~~ হই। আসি
।

রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়

তোকে লিখছি

১

এই যে তোকে লিখছি, লাল টিপ, ছিলা ভ্রূ, কৃষ্ণ আঁখি, পুরু ঠোঁট; তোকে লিখছি, দীর্ঘ বাহু, ভীরু নখ, মৃদু স্তন, মায়া নাভি; তোকে লিখছি, মধু যোনি, ভারী গোছ ও উদ্ধত গোড়ালি; আজ এক নির্ভার শাদা মেঘের টেবিলে বসে মুখোমুখি সারারাত দেখা হল তোর সাথে। কথা হল।
জানা হল এই আমাদের সব অকাতর শ্রাব্য ও দৃশ্য আধার।
বল জীবন যেত না চলে কুড়ি কুড়ি বছর আগে দেখা হলে, আর ইয়া পার।

২

পাখি শ্রেষ্ঠী ডাকছে। যখন হলুদ টাওয়ারগুলোর গায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো চাঁদ আর পাওয়ার স্টেশনের হাই টেনশন তার সাথে বাজছে।
মাতাল ডাকছে পাখি এই শিল্প শহরে তোর সাথে আমার বোঝা ও পড়া হচ্ছে আকাশের নীচে, মাটির বেশ কিছু ওপরে।
তুই বলছিস অবশ্যম্ভাবী, আমি বলছি কাকতালীয় ছাদের দেওয়ালে আমাদের দীর্ঘ ছায়াগুলো জেগে থাকছে।
আমরা উঠে যাচ্ছি।

৩

তোর ঘুমের মধ্যেও আর একটা ঘুম পাচ্ছে আর তোর মনে পড়ছে, কী রেখে যেন এসেছিস ঘোরের ঘরে, কী নিয়ে আসতে ভুলেছিস।
খালি ভয় পাচ্ছিস ব্যূহ রচনায় লঘু হয়ে পড়ছিস। আর আঁকড়ে ধরছিস ছায়া পরছায়া।
আমি তোকে এই বাক বনাম বোবাযুদ্ধ জারি রাখার কথা বলছি। বলছি অস্ত্রশস্ত্র।
আমাদের চোখ ও কান ভরে নেওয়া কথা। ইচ্ছামৃত্যুতে শান দেওয়া কথা। আরো একের ভেতর এক হয়ে যাওয়া কথা।
চল লুকোই, তোর ছায়াতে আমি। আমার ছায়াতে তুই। তারপর ছাদের দেওয়ালে ওরা ঘুমোলে আমরা উঠে পড়ব।

পৃথিবী এতটুকুই।

৪

রোববারের এই সকালে বল এত আহ্লাদ আর কোথায়? তোর কথারা আমার কথার পিঠে বসছে। তারপর আমাদের প্রেম ও পতাকা থেকে ঘষে ঘষে মরচের দাগ তুলছে।
আমরা আবার সংলাপ লেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। অর্ধসত্য থেকে মিথ্যেগুলোকে ছেঁটে ফেলছি। এই মঞ্চে আমি আর তুই।
এই ব্যাকড্রপ জুড়ে থাকা আয়নায় আমি আর তুই। যতক্ষণ না পারদের গলনাঙ্ক নেমে যাচ্ছে। যতক্ষণ না মঞ্চ ভেঙে
পথে ভেসে যাচ্ছে আমাদের অবদমিত ক্ষুধা, ঘুম ও যৌনতা।

৫

বিকেল কখন হয়? যখন জানলাগুলো খুলে যায়? দরজাগুলো? তুই খুলে যাস পরতে পরতে? তোর টিপ খুলে যায়? সমস্ত উড়নি? তুই ডিং মেরে ভেতরের সবক'টা আগল খুলে ফেলিস? তারপর মসীমাখা দিগন্তের নীচে বসিস? শব্দের অভিসারে যাস?

৬

ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে যখন অবগাহনে তুই নেমে যাচ্ছিস সান্দ্র মায়ার নীচে নিজের সঙ্গে নিজে রমণেচ্ছায় পেয়ে বসছিস আর শরীরে মাধুকরী ফোটাচ্ছিস; ভীষণ শুনতে ইচ্ছে করছে তোর শীৎকার যার ধাতু তারল্যে ভেঙে যাওয়ার আগে সান্ধ্য গান রচনার ছিল আর এই দৃশ্য ও শ্রাব্যেরা নিরন্তর যাওয়া আসা করছে আমার মাথার প্রকোষ্ঠে যেন কুলুঙ্গিতে দাঁড়ানো ঠায় ঈশ্বর এখন শোবে ঈশ্বরীর দিকে কিছু পাশ ফিরে। জাগতিকে এই ঐশ্বরিক নিবন্ধের বিশেষ টের পাওয়া যাবে না তবে অলৌকিক আর অবশ্যম্ভাবীর দ্বন্দ্বে কাঠের সাঁকোগুলো দুলে উঠবে আত্মন নদীটির ওপর। আমরা তখন একই অঙ্গে প্রোথিত হব। প্রত্যঙ্গে প্রত্যঙ্গ জড়িয়ে অপেক্ষা করব যেন অনন্তমূর্তি ধ্বনি সৃষ্টির পূর্বকাল থেকে তাকিয়ে আছি মাটির কাছাকাছি কোনো এক অপূর্ব খেলাঘরের দিকে।

৭

আলোর ওপর থেকে যে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো গড়িয়ে নামছে অমি তাদের ভেতর থেকে খুঁজে নিচ্ছি তোর সবক'টা পাতা। দেখছি শিরা উপশিরা দিয়ে বয়ে চলা সেই জলের চলনসারি আমার জিবের মধ্যে দিয়ে শরীরে ঢুকে পড়ছে। তারপর রসের সেই উতস্রোত পৌঁছে যাচ্ছে মাথায়। আমি মাথা দিয়ে তোকে আমার শরীরে প্রতিষ্ঠা করছি। ভাবছি বাহুলগ্ন বেড়ে উঠব দু'জনেই। অপেক্ষা করব কবে রাধাকৃষ্ণচূড়া ফুটবে আমাদের শরীরে। সেই ফুটে যাওয়া ঘামবাষ্পের নীচে আমরা পাশাপাশি জেগে থাকব অনেকক্ষণ। এরকম একটা পরা-অপরা বাস্তবের অন্তর্গত দ্বন্দ্বে যতক্ষণ জেগে থাকা যায়।

যতক্ষণ আলো ও বৃষ্টি পরিপূরক ঝরে পড়ে। পড়তেই থাকে।

বিকাশকুমার সরকার

সরণ

আমাকে নাড়িয়ে দেওয়ার আগেই, ঝাঁকিয়ে দেব পৃথিবী।
আপাতত আলস্যকে জড়িয়ে ধরে চুটিয়ে আদর করি
যতক্ষণ না-নিয়ে আসছে জীবিকা, ডাকপিয়ন।
আমাদের সবকিছুই তো খামে ভরা আগামী...
তবে এখনও কেউ ডাকে ফেলেনি আমার ভবিষ্যৎ।
তার মানে আজও হতে পারিনি কারো চিন্তার কারণ!
সন্তর্পণে জোনাকি হয়ে তাই জ্বলছি তোমার মনে—
অথচ সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখেছ কৃত্রিম আলো।
মনোরম চরিত্রের মতো আসলে নিরাপদ করতে চাইছ আশ্রয়
জানালার ওপারে যতই দাঁড়িয়ে থাকি আমি পুরুষ অন্ধকার
আকাশ বিছানায় ছড়িয়ে রেখে তারার ফুল...

সত্যিই বোধহয় আর কেউ বেরোতে পারব না
অনিবার্য এমন আদর থেকে, অনুগত এই কারাগার হাড় মাংসের
মানুষ ভাবছে না কাউকে, নতুন করে

যদিও বৃত্তের বাইরেই গড়ে ওঠে প্রকৃত বসতি

পরামর্শ

কার হাতে গড়া আমি
জানি না বলে আগ্রহ কম
শুধু মনের চাহিদার জন্য হয়েছি শ্রমিক
কখনও বোঝার সুযোগই পেলাম না কেমন হয় অবসরের
উৎসব
নাড়াচাড়া কিন্তু হল অনেক
ভিজে উঠল কেবল আয়োজনের ত্রুটিহীন দ্বার
লবণের বাড়াবাড়ি সেও তো বিস্বাদ!
বরং পৃথিবীর সমস্ত বিপরীত আমার থাক
জল মেশানো সব বিষে ভর্তি গ্লাস
নিমেষে সাবাড় করে তবু দাঁড়িয়ে আছি অতল
পায়ের নীচে যদিও অস্থির মাটি
ছলনা যেমন সম্পর্কের গিঁট
খুলতে গিয়ে তখন থেকে পথিক, জানল
নিরবচ্ছিন্ন এই দ্বন্দ্বের নাম জীবন
জেদ থেকে তাই বড় হয়ে উঠছে বিশ্বাস
অবিনশ্বর শক্তির কাছে একদিন হেরে যাবে শরীর

তখনও কি তোমার রহস্যের অফুরান রসদে বুঁদ হয়ে থাকব
জানি না, শুধু জানি জানার বাইরে এসব ভেবে লাভ কী?

তার থেকে এসো জীবিত অবস্থায় যারা পূজারী
নানান উপাচারে সাজাও মাথার মন্দির
যেন যে কেউ এসে উত্তর না পেলেও
তোমার স্পর্শে সবাই খুঁজে পায় শান্তি

আশ্চর্য

অনেকেই কান পর্যন্ত এসে খেই হারিয়ে ফেলে
এতদূর সাঁতরানোর পরেও কেন অপছন্দ জল—
বিপরীত দিকে, অচেনার জন্য অনেক কিছু গোপন করে
পরিচিত অভ্যাসবশে মানুষ এভাবেই সারাক্ষণ কাছের সাজে

অকৃপণ সব দান কিন্তু করছে দূরের জগৎ
মনের চেয়ে মিথ্যে আর কীই-বা হতে পারে

দ্রুত ফুরানো সব কিছুর মধ্যে এক শয্যায় শোয়া শরীর যখন
অন্যতম
তাহলে হিসেব করে তুমি কতদূর যাবে?
সুপরিবাহী মাধ্যম জীব। তবু হয়ে রইলে আগাছা আগামীর!

পারলে, চোখ নিভিয়ে ব্যবহার করো তাকে
যে মনবাহনের জ্বালানি রক্ত

ক্ষুদ্রতম

সমুদ্রের মধ্যে একটা পুকুরও থাকে
জীবনের মধ্যে যেমন উদ্ভিদ
কিছুই এসে যায় না তাতে
কারও বাহ্যিক আকার আয়োজনে
সবার মূলধন যেহেতু যৌনশক্তি
বৃহত্তরের প্রতিনিধি হয়েও আমরা তাই
খেতে থাকি, একে অপরের বিপরীত ঠোঁটে চুমু

তবু আকাশ আসলে অশ্রু
বাষ্পভাবে পাগল হয়ে ছুটছে
বানিয়ে দিয়ে বাড়ির জলছাদ
জানি ক্ষণস্থায়ী এসব প্রতিরোধ
পরক্ষণেই আবার আমাদের ভিজিয়ে দেবে
আশার মধ্যে যেভাবে বসবাস করে নিরাশা
পশুর পুষ্পমন আর মানুষের ঊষর-ঈর্ষা
আলাদা করতে না পারার জন্যই হয়তো
ফেরত যাওয়ার আগপর্যন্ত সবার সবকিছু থাকে সূর্যের আওতায়

অন্ধের কাছে অন্ধকার সেকারণেই সত্যিকারের আলো।

সমরেশ মুখোপাধ্যায়

মেঘের নীচে

মেঘের নীচে ঘাপটি মেরে বসে থাকে পরাজয়
চুরি হয়ে যাওয়া স্বপ্ন ও দীর্ঘশ্বাস...
বাজারের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে
ব্যাগের ভিতরে ঢুকে পড়ে আকাশের চেনা মেঘ
বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ...

তরকারির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে
মনে পড়ে বঁটির কথা...
টুকরো টুকরো করে কাটা
শরীরের গন্ধে
চমকে উঠে ফিরে যেতে থাকি
মাছ বাজারের দিকে...
চেনা মেঘের নীচে এখনও এইরকম বাজার
এইরকম আর্তনাদ ও
ধ্বংসের প্রতীক বিক্রি হতে থাকে...
আমাদের শ্রম ও অর্থ নিয়ে
লোফালুফি করে দোকান মালিকেরা...

হিমসাগর

পঁচিশ রকম গোয়েন্দার মাথা থেকে নেমে এল
যে বাগান তার চতুর্দিকে পাহারা বসানো...:
কত বাদাম আর চকোলেট নিয়ে ঘুরে ফিরে আসছি
উনুনের কাছে ... অসম্ভব এক আগুন রঙের তেজ

আমার সব অসফল নৌকাগুলোকে জাগিয়ে
রাখছে ... ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা
পর্যন্ত খোঁজ করে করে ডুব দিয়েছি হিমসাগরে...

সর্বরোগহর হিমসাগরে ডুব দিতে দিতে তৈরি হয়েছে
হিমশৈলের ধারণা
ডুব দিতে দিতে দেখতে পেয়েছি বিশাখা বিতস্তাদের
নুড়িতে ডোবা শরীর ... অজস্র মহাকাশ ভেঙে নিয়ে চলে
যাচ্ছে দূরে ... আমার নিশ্বাস ক্রমাগত পিছু নিচ্ছে
তার...

ছিপ

জলের বুজকুড়ি দেখে ছিপ ফেলছ
মেপে নিচ্ছ চতুর্দিক...

দশমীদ্বার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দৃষ্টি চলে
যাচ্ছে অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্রে...

মুরলী বেঁধে রেখেছে অন্তর

অনেক দূরে অপেক্ষা করছে বংশীবদন
তার মৃদু হাসিতে গড়িয়ে যাচ্ছে পরকীয়া মেঘ
আজ এখানে বর্ষা তো কাল ওখানে বিদ্যুৎ
শস্যক্ষেত মাথায় করে এগিয়ে চলেছেন লালন...

তথ্য

ক্রমাগত ছোট হতে হতে
আর কত ছোট হব
ঈশ্বরকণা!

তারপর তো বিস্ফোরণ হবে

তৈরি হবে মহাজগৎ আর
তাদের ভিতর দিয়ে
গড়িয়ে যাওয়া আলো অন্ধকারের পথ

যা আমাকে নিঃশেষিত হওয়ার
ধারণা দেয়
নিখোঁজ হওয়ার ধারণা দেয়

ছোট হতে হতে এইভাবে আমি
বড় হওয়ার তথ্য সংগ্রহ করি!

> ''না, আমি দিকশূন্যপুরের ঠিকানা
> কারুকে জানাব না!''
>
> সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জয়দেব বাউরী

জাগরণ

জানো কোন মহামন্ত্রে, পত্রপুষ্প ধূপ সহযোগে
মৃন্ময়ী তোমাকে এই চিন্ময়ী করেছি শুভক্ষণে?
পাঁচটি প্রদীপ জ্বেলে নিষ্ঠাভর নিগূঢ় আরতি,
প্রতিটি প্রহরে পুজো ধ্যান প্রিয় নিষিক্ত শিশিরে।

নিদারুণ তৃপ্তি তাই রোদ হয়ে আছে সারা মুখে।
তৃতীয় নয়ন থেকে সৃজনের আলো এসে পড়ে
তবুও বিনত দেবী, তোমার আদর্শ পুরোহিত
সহস্র শ্লোকের পর ভোররাতে মন্ত্র ভুলে যায়!
কীভাবে দেখেছ তার মহামন্ত্র ভুলে যাওয়া ত্রুটি?
জ্বলন্ত প্রদীপে মন সেও যে রেখেছে তারপর।

সাধনার এই পথে আলো আর আশা আনাগোনা
তিমিরনাশিনী, তবু নিবিষ্ট তিমিরে আরাধনা!

জমাট খনির দেশ

যে প্রকোষ্ঠে অন্ধকার জমাট খনিজ হয়ে আছে
সেসব প্রকোষ্ঠে আজ আলো ধরো অন্ধকার রাত।

বিষাক্ত কীটের লালা যেন রক্তকরবীর জাল
সেখানের কোনো সত্তা সূর্যালোক দেখেনি কখনো
শোনেনি মাটির গান, ভরামাঠে সবুজ ফসল...

সুষুপ্তির দেশ থেকে যে ভীষণ দূর দেশে গেছে
যাও সেই দেব-সত্তা ঘুম থেকে তুলে নিয়ে এসো।
চোখে মুখে জল দাও। আলো দিয়ে মোছো তার ঘর।

পাবন-আলোর রাত, স্পর্শটুকু ছোড়ো অনুরাগে
ঘুমন্ত সত্তার দুই বীজপত্র ডানা পেয়ে যাবে।

অবস্থান

অনুসুরে জ্বলে গেছ কোটি কোটি বার
অভ্যস্ত সেসব তবু ছিল সহনীয়

আমূল বদল এল ভেতরে যে কার
গতিপথ আজ তাই নেই রমণীয়!
বাকি সব গ্রহে গ্রহে ধ্বনির সুষমা
ছন্দময় চেনা গতি, চেনা গতিপথে

কোথাও পড়েনি কারো কোনো মাত্রা কমা
কেবল তোমার পথ মিশিছে বিপথে

অনুসূরে দগ্ধতার ভস্মতার ভয়।
অপসূর অবস্থান প্রিয়তর জানি

শিথিল হয়েছে হাত আরো কী কী ক্ষয়
দূরত্ব বজায় রেখে ঘোরো এতখানি...

কিছুই ঘটেনি তবু লেন্সে ধরা যায়
সূর্যের স্থিরতা বোধ নড়ে যেতে চায়!

কার্তিক নাথ

এ নির্জনে

যেখানে লেখার কথা কেবল আমার
কারা দেখি, লিখে গেছে
যা লিখেছে তা আমার নয়
সম্পূর্ণ তাদের
আমি যে কোথায় লিখি
আমার এই কথাদের!
যেভাবে বইছে নদীজল, তাও লিখে রাখি
একদিন এভাবে বইবে না সে
কীভাবে কাঁদছ তুমি, লিখে রাখা দরকার
দরকার ঝড়ের দৌরাত্ম্য লেখা,
ঘর-ভাঙা, তাদের সমূহ সর্বনাশ

এ সময় ভেঙে যাচ্ছে,
অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা দরকার তাকে
কতটা হারিয়ে গেছ তুমি, তাও লিখি

এ নির্জনে আজ

বিস্ময়ে

কথা না বলাও এক অস্ত্র
তাকেই শাণিত করো বারবার
নিজের ছায়ার সাথে
নিবিড় হয়েই কথা বলো
বিস্ময়ে হারাই যেন শ্বাস
আর দেখি, অদূরে দাঁড়িয়ে আছো
এক ধূম্র পাহাড়

ফুল

যে গাছগুলোকে জল দিই নিয়মিত
একটা সময় তারা কী ফুল ফোটায়!
আমাকে ডেকেও বলে এই নাও উপহার

আমার ভালোবাসায় কতবার সিঞ্চিত হয়েছ
অথচ বলোনি ডেকে একবারও,
এই নাও ফুল বিকেলের...
এক একটি নির্মাণের সূত্র দেয় এই ফুল
আর তুমি অবেলায় কেমন ঘুমিয়ে থাকো

গাছেদের মৃত্যু হয় ফুল কিন্তু জেগে থাকে চিরকাল।

অক্ষরে অক্ষরে

কবিতা লেখার খাতা
আমি লিখি তোমার কথাই
তুমি কেন এত দিন না-বলা কথাই রয়ে গেছ
গভীর বনের মতো মন-ভার আজ এই
পাতার দখলে
কেমন আছ এ-কথা লাল অক্ষরে যখন লিখে ফেললাম
পাতার উপরে নদী এল
স্মৃতি ঘিরে রইল সে জল
আমি সে জলের পাশে বসে লিখে যাচ্ছি তোমাকে

তুমি কত কথা ফেলে গেছ তা কি জানো
কথাগুলোকে সাজাই অক্ষরে অক্ষরে

এ সকাল

কিছু ভালো লাগছে না আর
সকালের রোদ এসে পড়েছে লেখার খাতায়, দেখছি
আঙুলের ফাঁক দিয়ে কলমটি পড়ে গেল
ধোঁয়া উড়ছে চা থেকে
নিহত অক্ষরগুলি পড়ে আছে এ পাতায়
ভেঙে পড়া মন, অসম্পূর্ণ অক্ষর এবং
সকালের রোদ মৃত কবিতার উপাদান

কিছু ভালো না লাগা আসলে এক মৃত্যু
মৃত আমি শুধু চা পান করেই শেষ করলাম এ সকাল

অন্যদিকে তুমি হয়তো রুটির সাথে
জ্যাম, জেলি মিশিয়ে রবীন্দ্রসংগীত শুনছ একান্তে

স্বরূপ চন্দ

মণিভূষণের বাড়ি দেখা যায়

আমি জন্মেছি উগান্ডার জঙ্গলে
আমি জন্মেছি সানতিয়াগোর সেই ফ্ল্যাটে
যেখান থেকে মণিভূষণের বাড়ি দেখা যায়
আমি জন্মেছি দস্তভয়েস্কির বইয়ের পাতায়
ঘাস-ফড়িঙের গুহ্যদ্বারে।

কেউ আমাকে ভোম্বল বললে আমার প্রেস্টিজ টনটন করে
কেউ আমাকে স্বরূপ বললে আমার ইগো টনটন করে
আমি আসলে এমন এক মুরমু এমন এক হাঁসদা যে
অনেক অনেক কবির অভিভাবক হয়ে
বসতে চাই—বাংলা আকাদেমির জ্যোৎস্নায়।

এর ফলে দু'একটি মেয়ে আমার নামে
ডালা চাপাবে মা কালীর মাথায়
এর ফলে দু'একটি মেয়ে রাত জেগে
হস্তমৈথুন করবে আমার নামে
এর ফলে আমার সেক্সি ইমেজ আরও একটু সেক্সি হবে
অহংকারের মাত্রা বাড়বে দু'পেগ।

একদিন হাভানার রাস্তায় চুরুট টানছি
উল্টো দিক থেকে একটা লোক এসে বলল—
আমি ফিদেল—আগুনটা একটু দেবেন?

একদিন সানতিয়াগোর রাস্তায় সিগারেট ধরিয়ে
অপেক্ষা করছি ফুলমণির জন্য
সে এসেছে অযোধ্যা পাহাড়ের গ্রাম থেকে
সে এসেছে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে

তার গা থেকে নিমতেলের গন্ধ
তার চুল থেকে ঝাড়খণ্ডের গন্ধ শুঁকছি যখন
এমন সময় উল্টো দিক থেকে একটা লোক বেরিয়ে
পুলওভারের পকেট থেকে হাত বের করে বলল—
আমি পাবলো—আগুনটা একটু দেবেন?

পাবলো মানে চিলির কবি পাবলো নেরুদা
ফিদেল মানে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রো
আমি মানে জঙ্গল মহলের চে হপন হাঁসদা

আমাদের তিনজনের হাতে তিনটি 'গীতবিতান'
তিনজনের হাতে তিনটে সিগারেট
আমরা হাঁটছি সানতিয়াগোর দিকে
যেখান থেকে মণিভূষণের বাড়ি দেখা যায়

সনাতন

স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সনাতন দেখে
তার মা ভাত বাড়ছে
মাড়-ভাতের সঙ্গে কাঁচালঙ্কা, ছাঁচি পেঁয়াজ
মাড়-ভাতের সঙ্গে শুষনি শাকের পাতপোড়া
সেই ভাতের গন্ধ আর খিদের চোটে
তার জিভ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।

স্কুলে আজ একটা বাবু আসে
সে সনাতনকে জিজ্ঞেস করেছে—কুজ্‌ঝটিকা
শব্দের অর্থ কী?
কুজ্‌ঝটিকা শব্দের অর্থ সনাতন জানে না
কুজ্‌ঝটিকা শব্দের অর্থ সনাতনের মা জানে না
কুজ্‌ঝটিকা শব্দের অর্থ সনাতনের বাবা জানে না

সনাতন জানে কীভাবে কেঁদুপাতা তুলতে হয়
আঙুলের কৌশলে কীভাবে বুনতে হয় বাবুই দড়ি
সে জানে সেই নিয়ম মেনে কীভাবে
সাত বছর বয়স হয়েছে তার।

সাত বছরের সনাতন দেখে
প্রতিবছর শীতের শেষে কেঁদুপাতার মহাজন আসে
লরি নিয়ে তাদের গ্রামে
সেদিন গ্রামে মদ-মাদলের ফোয়ারা ছোটে।

শেষ রাতে তার বাবা যখন কেশে কেশে রক্ত তোলে
সনাতন দেখে—সেই বাবুটির ঘর থেকে
বেরিয়ে আসছে তার মা।

সনাতন তার মাকে চিনতে পারে না
তার মায়ের গায়ে তখন একটা অন্যরকমের গন্ধ
অন্য রকমের তৃপ্তি নিয়ে সনাতনের মা ঢোকে
তার বাবার ঘরে।

''ছাই ঘেঁটে দেখে নিও পাপ ছিল কিনা''

তুষার রায়

জারিফা জাহান

সাপ

আজন্ম ফুসফুসে ভরা একফালি বাতাসিয়ায় চারা পুঁতেছি কিছু,
বেঘোর ঘুমে।
ঝাঁঝরি গলা টুপটাপ জল, এঁটো কাঁটা সার সব অনুষঙ্গ খবর
নিয়েছে বেড়ে ওঠার,
ভেজা ফুরফুরে হাওয়ায়।
গাছের শান্ত পাতারা কপাল ছুঁয়ে ঘুম পাড়ায়
রাত বাড়লে বেমানান স্বপ্নে, কীভাবে, হঠাৎ গাছেরা সাপ হয়ে
যায়, ফণা তোলে।
বিভ্রমের কোনো অনুরণন নেই
হাঁসফাঁস করতে করতে জড়িয়ে যাই আরো গভীর, পিচ্ছিল
আঁশটে গন্ধে
(ফলত সেজদা ও মোনাজাতের মাঝে ধুম জ্বর আসে)
আল্লাহর নাম নিতে নিতে মৃত্যু হলে সাপেরা পেঁচিয়ে ধরে
আরো
প্যারিস থেকে ব্রাসেলস, অরল্যান্ডো থেকে গুলশান
সারি সারি রক্তমাখা বুলেট তেলাওয়াত করে দোয়া ইউনুস,
রক্তে ছেঁকে ধরা কালো পিঁপড়েরা এ সংবাদ পৌঁছে দিতে
পারে না কোনো মসজিদে।
('জেহাদ'-এর অর্থ ওরা কী বোঝে?)
অথচ হিজাব না পড়া যে মেয়েটার কোমরে ঢেউ খেলেছিল
কিংবা 'বিধর্মী' কিশোর
যার চোখে আঁকা ছিল খসড়াসত্য
তারা নাকি আজ বেহেস্তের বাসিন্দা।
হে হাদিস, হে কোরান
যে দোজখের আজাব থেকে আত্মমুক্তির হিসাব বুনেছিলাম
তোমাতে ভর করে,
বিশ্বাসহন্তা, কীভাবে তোমরা চলে গেলে পটপরিবর্তনে?
জানাজার আগেই সর্পাঘাতে ভেঙে পড়েছে অনুন্নত ধার্মিকলিপি।
তোমাদের জন্য দোয়া কবুল—
'নাজ্জাল তাকুন মুনকারীদা'

পুতুল ও নারী

১

পুতুলকে জড়িয়ে ধস্তাধস্তি আদরে ডুবে ছিল মেয়েবেলা।
নীল চোখের ফর্সা পুতুলের জামায় আঙুল খেলত চঞ্চল
শ্যামলা আমার সভয়া মন-ঝড়ে অগোচরে চলে যেত টিক-টিক
শব্দ।
ড্রপসিনে তাড়াহুড়োয় তবু আনমনা, শনশন ভ্রুকুটিতে ভিড়
জমত প্রশ্নদের,
প্রিয় ফ্লেমিংগো ড্যাপ্সিং-ফ্রকে।
বেলাশেষের লালপেড়ে তারাদের গায়ে রাঙাতে জারি ফরমান
ওরা নাকি অকপটে নেচে নেচে ছবি আঁকে উজ্জ্বল লীলাভোরে।

২

মেয়েবেলায় কান্না ছিল, অভিমান ছিল না পুতুলের মতো।
ওর ঠোঁটের হাসিতে হাত বোলালে
দূরের খাঁচার আওয়াজ পেতাম,
বন্দী পাখির ডানাহীনতার আভাস আমাকে কাঁদাত হু হু
আমি শ্যাওলা-ঠোঁটে শিস দিতে দিতে সুর বুনতাম মিহিকা।
শিসের শব্দেও 'ফতোয়া' জারি হলে মনে পড়ে বোবা পুতুল
আর ভালোবাসা, হুমায়ুন আজাদ,
যিনি লিখেছিলেন—
''নারী সম্ভবত মহাজগতের সবচেয়ে আলোচিত পশু।''

৩

পূর্ণযৌবন পুতুল কখনো রজঃস্বলা নয়,
প্লাস্টিকের ভাঁজে গড়ে তোলা স্তনে তবু কাফেরের লাল চোখ।
কপালে স্বচ্ছন্দ বজ্ররেখা নেই, নেই উরুতে গড়িয়ে আসা
ঋতুরক্ত।
মন খারাপের অসম্পূর্ণ নারীত্বে তাই ভাসছে কিছু বুদবুদ
ফেটে যাওয়ার পর আপসের ক্যানভাসে ছড়িয়ে পড়ে কিছু
লাল-সাদা ছিটে
রক্ত, কান্না, সংসারের ছবি আঁকতে।

চিরঞ্জিত সরকার

পিতাপুত্র অঙ্ক

এদেশ আমার থেকে অন্য কারও বেশি
অন্য কারও উল্লাস আমাকে বোবা সাজায়
ভয় পাই...

বাবা ঘুরে আসতে বলে পুরী
জগন্নাথ থেকে হাসি নিয়ে
সাজতে বলে বহুরূপী। আরও
বলে—ভুলেও যেন না যাই গভীর সমুদ্র,
ভয় পান যদি না ফিরি।

আমি ভালবাসতে জানি
সাঁতারও জানি
ভাগাভাগি বুঝি, হেরে যাওয়া বুঝি
গৃহস্থ বোঝাপড়ার সিঁড়ি ভাঙিতে জানি

লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে উড়ি,

পরিচিত ইহঃগাছ, মাঠ, পথ ও ঘাট
নতুন বৃষ্টি ও জীবন ফার্মেসি।

২

ঘুরে ফিরছি সেই বছর ত্রিশ থেকে
ফিরে দেখি
খোলা দরজার চৌকাঠে
সাজানো প্রশ্ন! মাটির উঠোনে
সারি সারি গাঁদার গাছে চোখের জল ছিটানো!
চোখ দিই, গুনে গুনে শ্বাস ছেড়ে বলে দিই
কীভাবে হারাই আমি।

খেতে বসি, কষি পিতাপুত্র অঙ্ক
মা মনে ও কথায় মেপে ঢুল দেন
বসে থালায় জমাই আঁধার তখন
ধুয়ে মুছে পথে ঘুম দিই
ঠিক রাজার মতো...

৩

শ্বাসরুদ্ধ সন্ধ্যায় আমাদের পরিষ্কার দ্যাখে গাছ।
তুমি দ্যাখো নতুন কবিতার খোলা বুক, সুখ সতর্ক
ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্ট,
কিছু সরল, কিছু সবুজ, কিছু হাসি, সকালের
নিশ্চিন্ত ঘুম...
অথচ চাঁদের পায়ে পায়ে হেঁটে অস্পষ্ট শব
ছুঁয়ে বসে আছি, নিজের ছায়া করেছি উপুড়,
বহুকাল ধরে ঝুলে সম্পর্কের সেতু, তার
মৃত্যুকালীন জবানবন্দি লেখা পথ।

পথ সেজে উঠছে মৃত্যুভয় দিয়ে
চারপাশে রক্ত, অন্য ক্ষুধা ভর্তি পেটে,

যদিও লেখা ছিল বর্ষা আসবে
ধুয়ে যাবে ক্ষয় হবে
অ্যাসিড নেমে পুড়ে যাবে চরিত্র
সম্পর্কের পিন ও পাসওয়ার্ড হাতে থাকবে আমার,
তুমি তখন দেখে নিয়ো সুখ, শুনিয়ো আনন্দ,
এখন মেপে নাও ভেতরের সমুদ্র—
ভাঙা পিতাপুত্রের সম্পর্ক।

যাপন

প্রথমেই খুলে নেওয়া হোক পোশাক থেকে
আমাকেই...
পোশাকে সাজাও ধন, দাও শিল্পবোধ নিজের
আমাকে দেখে লাগুক আদম, বিয়োগে যাক
সভ্যতার প্রিয় দর্শন।
প্রভু ব্যর্থ হতে পারে জেনে হেসে পুনরায়
ছুঁয়ে দ্যাখে আমাকে; শক্তপোক্ত একটা গাছে
সম্পর্ক বেঁধে দেন। অমর হই।

জিৎ পাল

সংঘ

একঝাড়ে থাকলেও প্রতিটি বাঁশই তার নিজস্ব ভঙ্গিতে
মাথা তুলতে চায়
কেউ কেউ নুয়ে পড়ে
কেউ কেউ হেলে পড়ে অপরের গায়ে

কারো কারো শীর্ষদেশে দোল খায় পাখি
আর...
কারো কারো শীর্ষদেশ ছুঁয়ে থাকে মাটি

সাধক

আগুন এড়িয়ে যাওয়া সাধকের পথ নয়
সে যাবে আগুন ছুঁয়ে ছুঁয়ে
আগুন পোড়াবে তার সুকুমার দেহ
অথচ সে ক্ষত খুলে মানব সমাজে
কোনোরূপ করুণা নেবে না

শুধু...

নীরব ঝলসানো গন্ধ গোপনে বহন করবে
অশরীরী হাওয়া
হানা দেবে অন্দরমহলে

আগুন এড়িয়ে যাওয়া সাধকের পথ নয়
সে আগুন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে...

ধ্যান

আমি আর নীরবতা চুপ করে বসে আছি ছাদের উপরে
আকাশে বিষণ্ণ মেঘ, কালো
আচমকা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে আলো
একদিন জ্বেলে দেবে তারা
পাশে বসে নীরবতা ফিসফিসিয়ে দিচ্ছে যেন
তার-ই ইশারা

বন্ধুদের লম্বা জিভ, লালা, কুৎসা, ঘৃণা
আমাকে বিচ্ছিন্ন করে নীরবতা নিয়ে এল
একাকী গুহায়

সাধনা একাকী বড়, সংঘে তার ধ্যান ভেঙে যায়

জাতক

সে থাকে একাকী তার
নিজের গুহার মধ্যে এঁকে রাখে গোপন বেদনা
হাওয়া পাহারায় থাকে
উৎসুক পাখিরা আসে, উঁকি দিয়ে ভেজায় দু'চোখ
অনেক পতঙ্গ তীব্র কম্পনের স্রোত, আর
পায়ে মাখা অপার্থিব রেণু ফেলে যায়
জন্ম নেয় আরো আরো ভ্রূণ
সে থাকে একাকী তার
বেদনা পলাশ হয়ে ফুটে থাকে পাথরের গা-য়

দূরে আবছা জনপদ, অতৃপ্ত কুয়াশাঘেরা ঘৃণা
রাত্রে জ্বলা অগ্নিশিখা অতিরিক্ত স্নেহ ঘষে জাতক শরীরে
সে যাবে ঘুমিয়ে তার নিশ্চল জাতকগুলো
অন্ধকার চিরে ঠিক বুনে যাবে নতুন ঠিকানা...

শান্তনু হালদার

অন্ধত্ব

কোনওদিন আর কোনওদিন
আমার না-ফেরা নিয়ে
অভিযোগ করব না নীল সমুদ্রঝড়!

শুধু একবার ধার দিয়ো বিদ্যুৎ,
তোমার তীব্র ঝলক—
ঝড়ো বাতাস আর মেঘের ভেসে থাকা

টইটম্বুর অক্ষরমালা গলায়
আমি অনন্তে ঝাঁপাব...

গিলে খেয়ো হে শূন্যতা!
আমি পরমানন্দে এই জন্মের অন্ধত্ব ঘোচাব—

কবিতার চারাগাছ

জন্মের উৎস থেকে ভেসে আসছে গন্ধ..
ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি আর প্লাবিত অক্ষর।
আমি ঝাঁপ মারি,
লুফে নিই কিছু বীজ..
তারপর একদিন
ঠোঁটে দানা রেখে
খুঁজে চলি সন্তানসম্ভবা কোনও পাড়া..
সামনে শ্রাবণমাস অপেক্ষায় থাকি,
আকাশ ভাঙবে কবে গ্রামের ক্ষেতে
আর অঙ্কুরিত হবে কবে, কবিতার চারা...

উত্তাপ

মোলায়েম উত্তাপ থেকে দূরে রেখো জীবন!
কিছুটা উষ্ণতা ঠোঁটের ভাঁজে লুকিয়ে
ক্রমশ নিজেকে হারাতে দেখেছি
হে স্ফটিক মুখরতা!

আরও দেখেছি
গলি থেকে এক শীতল রাস্তা
ক্রমশ কড়া নাড়ছে আমাদের দরজায়।
তার থেকে একটা পথ হঠাৎ উপড়ে
কতবার শিখিয়েছি মৌনব্রত..
তবুও যুঝতে পারিনি নিজেকে
সে উত্তাপে
শিরস্ত্রাণহীন আমি
পুড়ে পুড়ে ছাইটুকু অবশিষ্ট...

ঈশ্বর

কোথায় পড়েছি
আজ আর ঠিক মনে নেই..
শুধু কথার আবেশ রয়ে গেছে..

মানুষের বইয়ে যে ঈশ্বরের নাম ছাপা থাকে
তা মনুষ্যসৃষ্ট আসলে...
সত্যি হল
ঈশ্বর নামহীন অদৃশ্য পোশাক,
শুয়ে থাকে মুখরিত প্রকৃতির কোলে..

মৃত্যু

বাতাসে খোদাই করি নাম
স্রোতের ফণায় ঢালি বিষ
দেখি নিথর বাজিয়ে ধেয়ে এসে
তুই দিনান্তে সংগ্রহ করে নিস...

অরিজিৎ চক্রবর্তী

মোমগ্রন্থি

দেড়শো বছরে একটি বার ফুল ফুটিয়ে যে বৃক্ষ মৃত্যুর
কোলে ঢলে পড়ে—আমি সেই পুয়ারাইমণ্ডি বৃক্ষের
অবাকবিজ্ঞান জেনে নেব আজ। আর সংশ্লেষ, অভিযোজন
থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনব কাহিনির শেষে। তুমি দেখবে
ভালোবাসার আর্তনাদ ... যুগপৎ যামিনী ও ভোর! এমন একটা
প্রহর, যেখানে আলো প্রকোষ্ঠের ভিতর অজস্র বিধুর পাখি,
ওয়াচটাওয়ার আর বিস্মিত দূরবীনে তুমি অন্তহীন জঙ্গলসিরিজ
কিংবা আকাশকুসুমের অভিসারে একটা সুগভীর খাঁড়ির
জায়গায় একটা অগভীর জলাশয়ের অভিনয়

ফলে প্রাচীন বৃক্ষ যেটুকু আড়াল করবে তা এক কিংবদন্তী হয়ে
থেকে যাবে চিরকাল...সাঁওতালপল্লীর ডুয়াং নাচের ভেতর একটা
খাট আমাকে বহন করবে..একটা চাদর আমাকে ঢেকে দেবে
সাদায়...আমি হেই হো...তোমাকে ভালোবাসব...আর
দিকভ্রান্ত বার্ডওয়াচারের মতো আটকে পড়ব সবুজের কালো
ফাঁদে!
পাখি ধরতে ধরতে একদিন ক্রিমিনাল আইনে ফেঁসে যাবার
ভয়ে ছদ্মবেশ নেব বহুদিন। প্রাচীন বৃক্ষের নীচে বেড়ে
উঠবে চারাগাছ...

অস্থি ও জীবাশ্মে ভরা রক্তিম ফুলটির মতো মৃত্যুর পরিহাস...
আমার অবাকবিজ্ঞান জেনে নেব আজ... যেমন সঙ্গম শেষে
জল ... খুঁজে নিই সকলে ... শুধু তুমি বোধপরবাস ফিরে
যাবে পুনরায় জঙ্গলের দিকে...

মনে রেখো

শুরুটা হয়েছিল অন্ধকার ঘরে, যেখানে ছোট্ট একটা লম্ফ
জ্বালিয়ে আজ থেকে তিন দশক আগে সূচীছিদ্র ক্যামেরার
উৎপন্ন প্রতিকৃতির মতো আমাকে তুমি ভালোবেসেছিলে।
আমি পৃথিবীর উপচ্ছায়া অঞ্চলে 'আলো, কোথায় তুমি?'
বলেছি গোপনে ... অনেক কথার পরে হঠাৎ চুমুর শব্দে...
মনে হল সব পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না! আমি মগহিভাষী,
গেঁয়ো অরিজিৎ, এই বিড়ি খাব ... বিড়ির টুকরো ফেলব দূরে
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আয়না হব না কোনোদিন। শুধু
স্বপ্নকে স্তম্ভিত করে মরফিন স্তনের টিলায় জমানো পূর্ণিমাকে
দেখে নেব। আর অন্তর্বাহিনী নদীর মতো যেটুকু স্মৃতির
সবই অশ্রুত মনে হবে পুনরায়।

নিবিষ্ট পাঠকের কথা ভেবে পাদটীকা লেখার খেয়ালে
''আরো আলো, আরো আলো, এ নয়নে প্রভু ঢালো''
সূচীছিদ্র ক্যামেরায় ধর্মের মতোই নিজেকে দেখব
তোমার সাপেক্ষে উল্টানো প্রতিকৃতির মগ্ন ভালোবাসায়...

দাঠা বংশ

দেহের বাইরে রক্ত যেমন তঞ্চিত হয়... ঠিক তেমনই
এক অনুভবে নিজেকে জেনেছি তঞ্চকরোধক সাপের
বিষে প্রতিতুলনায়। আর উদ্দীপকের উদ্দীপনায় সাড়া
দিয়ে শিষ্য ক্ষেমের মতো বুদ্ধের চিতা থেকে দন্তটি
উদ্ধার করে রাজা ব্রহ্মদত্তকে সমর্পণ করেছি মাত্র

যেন সকল পরাস্ত, তার কাছে, তবু চিরদিন পদ্মোপরি
বুদ্ধের ছায়াবৎ হয়ে পুনর্বার দেখা পাব। রিক্তের পূর্ণিমায়
আঙুলে সুতো বাঁধার নিতান্ত খেলায় রক্তপ্রবাহ
থামিয়ে ভাবি মুগ্ধের প্রশ্নে কীভাবে অর্চনা স্থির
আমার হৃৎপেশীর নিঃসাড়কাল, আগ্রাসী কোষ,
প্লীহা...আমার রক্তিম, আমি কতদিন পর বুঝেছি...
কলিঙ্গরাজাদের অধীনে স্থিত আটশত বছরের ইতিহাস

অঙ্কনধর্মী

যেকোনো কারণেই হোক তোমার আমার এই অন্তঃপ্রজাতি
সংগ্রাম
সন্তানসন্ততির মনে সঞ্চারিত হয় একদিন। তবুও ক্ষুধার শেষে
দুটি
সংযোগকারী জীবনের মতো ব্যবহার অব্যবহারের গুমঘর
পচনের
ভয়াবহ জৈব আলোকে সাংসারিক বিরক্তির স্বপ্ন দেখায়। নিমিত্ত
নিজেকে সামনে রেখে প্রবক্তা অপমান থেকে বহুদূরে কেন যে
কবিতা লিখি? এই সময় শঙ্খ বাজলে মধ্যবর্তী সময় ভারী
পাথরের মতো গড়াতে থাকে..। ভাবি রণে ও প্রণয়ে মিথ্যাচার
কোনো পাপ নয়! যেমন আমরা যে হাতটি বেশি ব্যবহার করি,
অন্য হাতের তুলনায় সেটি সক্রিয় হয়! অপমান, শেষদেখা,
বিষাদকথা, দুঃখ বনসাই হয়ে ওঠে একদিন আর অগ্রসর
মেরুদণ্ডী সভ্যতা রাসায়নিক কিছু আবর্জনা নিয়ে ভূপাতিত
সম্পদের
কিয়ৎ চাহিদা মেটায়... আমি আমার আমাকে শরীরের মধ্যে
বিলোপ করে পাখি ও আরশোলার ডানার মতো সমবৃত্তীয়
অঙ্গের যোগাযোগ খুঁজে পাই...
যেকোনো কারণেই হোক আমাদের এই অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম
শিকড়ের মতো কাছাকাছি টেনে রাখে গভীর প্রোথিত। যেন
আত্মহত্যার পর, একটা স্বপ্ন থেকে বেঁচে ওঠা কথাকলির
মুখোশ...

স্বপন চক্রবর্তী

বায়োপিক

অস্পষ্ট সন্ধ্যা কোলের কাপড় মেলে দাঁড়িয়ে আছে। উৎসে রুক্ষতা জেগে উঠছে কঠিন, কঠোর। তোমারও গতিধারা চর জাগা নদী। জলের বোল থেকে যাবে জানি। তবু মন থেকে মানতে পারিনি। সমভূমির ফুসফুসের মতো নদী হয়ে আমি খুঁজে চলেছি তোমার তোড়ার হারানো একটি কিঙ্কিণী। তুমি নদী অনুরূপা...
প্রতিটি শেষের খেয়ার পেছনে
ফিঙে
ডানা বন্ধ করে হাঁটে
অনিকেত হরিধ্বনি
গুটি-গুটি পায়ে
চলে যায় নদী তীরের সেচ উৎকর্ষতার ভিতর
ভূমিকাহীন অস্তিত্বও
টিকটিকির সামনে দেওয়ালে পর্ণ-হারা মথ
অস্তিত্ব পাপোশের ধুলোয়
রুগ্ন
অসহায়
তুমিও মোম
তোমার শ্বাস টের পাওয়া বালিশ
ডালিম দানার কক্ষরক্ত
ঝরা শ্রাবণ-কে
পারানির কড়ি জেনে
ফ্যাকাসে নিস্তেজই ঠোঁটে
সূর্যাস্তের রঙ তুলে আনে
তখন মরিস নৃত্যে জেগে ওঠে
খাট, বিছানা-বালিশ
শ্রেণিকরণের দার্ঢ্যতার নকল
টিভি, ফ্রিজ, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল...
এখন তোমাকে ঘুম থেকে তুলে দেয়
ওষুধ খাওয়ার সময়
এই রকম অভ্যাসবশেই কি আমি
আত্মার অক্ষর তুলে আনি
আশংকা
গ্লানি;
কান্না
লুকাতে চাই বলেই
আমি আমার মায়ের পুরুষতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা
পিতার অভব্য যৌনাচারের মধ্যে
ধারালো পাতা হয়ে এসেছিলাম
কিন্তু সাত সকালেই
মা হারানোয় মা খাওয়ার বদনাম নিয়ে এখনো জীবিত
সে কি খরবাদী হওয়ার অপরাধ
নাকি ধাপ্পা দিয়ে বেঁচে থাকতে শিখেছি তাই?

২

ঘণ্টাধ্বনি উঠছে ফেন্তা থেকে কেটে যাওয়া ঘুড়ির মতো হাওয়ায় হাওয়ায়। ভিক্ষুকেরা এখন জেট অপেক্ষা দ্রুতগামী। নিলাজ সম্ভ্রম মাছির মতো বসে আছে মুখের ওপর। আর বৃষ্টি বলে কোনো বাধা নেই, তেরিয়া রোদ পরাভব মেনে অস্তায়মান দ্রুত গমনের উৎক্ষিপ্ত ধুলোয়। শান্ততা চিরে ফেলা কংক্রিট গ্রামকে আছড়ে ফেলছে বাজারের পাটায়
পৃথিবীর দিকচিহ্নহীন আয়নায়
ঢুকে পড়ছে গতি
বাতিলেরা সিজারলিস্টের গাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে
তোলা না দেওয়ার শাস্তি স্বরূপ
রাত পাহারাদারদের প্রস্রাবে এত মরচে পড়েছে যে
নীলামে ওঠার তাকত তাদের নেই
গাড়ির একটা ভাঙা কাচের তীক্ষ্ণতায়
আমার ভাইয়ের মুখ গিঁথে আছে
আত্মহত্যা বলে এতটুকু মলিন হয়নি
সংসার সন্ন্যাস মানেই
থুতু গেলা
আপস
এজন্যই ডিভিডেন্ট
সিনেমা, থিয়েটার, পর্ণ
মাদারির খেল
মিছিল
ভড়ং
এই যে কথাগুলি লিখছি মোম
এগুলো তোমার প্যাংক্রিয়াসে ম্যালিগন্যান্ট
কোষ বৃদ্ধির কিলবিল পোকা
জীবিতরা টের পাচ্ছে
কিন্তু তাদের শেখানো হচ্ছে সেফ ড্রাইভ
হাঁটছি কিন্তু বলতে পারছি না
চড়া রোদে দাড়ি কামানো গাল পুড়ে যাচ্ছে।
থেকে থেকে আওয়াজ উঠছে হামলা বোল। জলায় শিকড় নামিয়ে নির্মাণ গলা বাড়িয়ে বুঝে নিতে চাইছে মেঘ-রোদ্দুরের রহস্য। যাদের পালক এখনো খসেনি তারা হ্যাচারির বাইরে। তাদের পানাপানির নিশ্চয়তা কম। শুধু গা ভাসানা, সময়েরও সময় কম। ধর্মবোধহীন মন কাল। ক্লান্তি কাটতে না কাটতেই

কাউকে দাঁড়াতে হবে রক্তচোষার শিবিরে। কফিনের সমারোহ
রাষ্ট্রীয় প্ররোচনা ও কর্তব্যের মোটা চামড়ার মারাত্মক চিড় ঢাকতে
ব্যস্ত। অন্য দিকে তোমার হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ৮.২। সোডিয়াম
১২৩। প্যাংক্রিয়াসে পোড়া কোষ থেকে অসুখ অন্যত্রগামী।
জীবিত কোষগুলি রেহাই পাচ্ছে না। তবু আওয়াজ উঠেছে ...
অরণ্যসংগীত ক্রম প্রসার্যমান
মর্মর নয়
দাঁতে দাঁত চেপে গেরিলা কুচকাওয়াজ
সঙ্গীন
শেষ ভবিষ্যৎ
সান শাইনস...
গান উঠে আসছে
পাকস্থলী থেকে
একদিকে চাঁদ
অন্যদিকে গাঢ় অন্ধকার
প্রয়োজন বলেই কবিতা লিখি
অন্ধ গলিঘুঁজি খুঁজেও
পৌঁছাতে চাই সদর
সমস্ত রিমসিম টলানি
ছিঁড়ে খুঁড়ে
শাপলার মুখে বাঁচিয়ে রাখি
এই অবসেশান
পৃথিবীর ধাতুপাত্রে
এখনো জটিল বিন্যাস
মন-মনান্তর
এককহীন দূরত্বে স্থিত প্রজ্ঞা।
মোম, তোমার ক্যান্সার থেকেও ভয়ংকর
এই অসুখ
কবিতা লিখি বলে
আমার উচ্চতা বিগত কয়েকটি যুগে
যা ছিল
আজো তাই
কেবল অর্জুন রক্ষার জন্য
আমি ভিতি মারি
খোঁচ মেরে আগুনে মেঘ কতদূর
কতদূর বন্যার তোড়
বুঝে নিতে কুকুরের মতো ঘ্রাণ নিই
চাঁদ চুরি হতে পারে জেনে
রাতপাহারাদার যেমন চেঁচায়
হেই জাগতে রহো..:.
গো অঙ্কের ভুল নিয়ে সহাবস্থান থেকে কয়েক মিটার দূরে
কবর শ্মশানে তার আতপ বাতাসের মুখ ঘুরিয়ে দিচ্ছে
খাঁড়ি পেরুনোর বালতি একা খাড়া ভাবে ডুবছে
স্কুলপাঠ্য থেকে সরে যাচ্ছে কাঁচা বাঁশের লাবণ্য
কিছুতেই রাম-রহিমকে হাতে হাত রেখে বলানো গেল না
সমকামী হও
প্রতিনিয়ত এই সব ভস্ম মেখে শব সাধনায় বসি
টের পাই মৃতের শরীরে জো লাগছে—বিভ্রমও হয়
না কোরান, না গীতা, না বাইবেল
কোনোটাই যে একা কারো নয়
সেই সত্য যাপনে
একটি ধূপও আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেনি।
মোম,
আমরাও
আমাদের ভাষ্যি হবে না।
প্রয়োজনে এক কোদাল মাটিও কাটিনি আমরা
ছেঁড়া পলিথিন ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে মাটির
আড়াল তুলেছি
প্রকৃতির দুগ্ধক্ষেত্রে গড়ে তুলেছি ইমারত
বেসমেন্টের নীচে ছটফট করতে করতে
মরে গেল জলভাঙ পুরানো দিনের মাছ, শামুক, মুথা ঘাস...
বাইজেনেটিয়াম সভ্যতার দিকে এই যে উড়াল
ঝুলন্ত বাগানের প্রতি এই যে দুর্নিবার তাড়না
সবই মৃত্যুর মুখে চাপিয়ে দেওয়া মুখোশ
লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেলেও এই উন্নয়নের গতি
কাদায় গিঁথে যায়নি।
ক্রিয়াশীল হাত গলাকাটা মুরগির মতো উড়ে যায়নি
এইসব বিশ্রস্ত ফাগু
হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসমান কুচো জলকণার নীচে
অন্ধ অতীত
ঘোলাটে বর্তমানের নিষ্ঠীবন
গায়ে ঝরে পড়লেও
সন্ত্রস্ত
তবু হেঁটে যাই
হ্যাড আই দ্য ভ্যাস্যার অফ শের উড...
চোখের গভীরে কতগুলো ভোর ডুবে আছে।
নিরেট অন্ধকার। কুয়ো থেকে তোলার ফাঁকেই ভোরের সেই
জড়োয়া অহংকার। ক্ষারে কাচা কাপড়ের মতো অনুজ্জ্বল হয়ে
পড়ে। চেনা যায় না। সন্দেহ বাড়ে— যেমন ঘরের অর্থ খোঁজার
সময় বিকল্পগুলিই বড় বেশি জীবন্ত মনে হয়।

প্রতিবেশীর বাণের জ্বালায় গাভিন পালান ফেটে রক্ত ঝরছে
আঙুলে গোবর্ধন গিরি তুলে ধরার প্রতীকের সাথে
এই দৃশ্য আমি মেলাতে পারি না

কেবল টিকে থাকার জন্য
একটা গাছকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি গাছ

মোম, তোমার অসুখ তুমি ঠিক এভাবে চালান করোনি

তোমার হাতের অসংখ্য রেখায় নক্ষত্রস্নানের জল বয়ে যাচ্ছে
স্রোতে
তোমার শৈশব
কাগজের নাও
কুচো কৌতূহল
তোমার রানী সাজা ঝরা পায়রার পালক
ইলশেগুঁড়ি সকাল
চট মাথায় দিয়ে
রিফিউজি প্রাইমারি স্কুল
গুটি কাটার উদ্বেগ
আত্মহত্যায় প্ররোচিত প্রজাপতির ডানা
ডোবায় বেলাশেষে ডিমালু হাঁসের প্রতি ফিরে আসার ডাক
আশংকা
চৈ চৈ...:

ধস নামার আগে ভারী মেঘ
মেঘভাঙা বৃষ্টি
কোনো অপেক্ষা ছিল না

শ্যাওলার জন্মে যে সংকেত ছিল গভীর গোপন
সেই সংকেত তোমার কোষে কোষে বুনে চলেছে মৃত্যুবীজ

সারি সারি কলার বোগ
নীচে জুই লাগা আলগা মাটি

বিসর্পিল ব্রিজের মাথায়
ছেঁড়া এ্যাড
ফ্যাকাসে চাঁদ

স্তন্য দেওয়ার কোনো প্রতিশ্রুতি নেই
মৃত হাড়-গোড় দুনিয়াদারির জন্য
শষ্পের মূল ধরে টেনে নামাতে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে
গতিকে নাচিয়ে তোলে কবর-স্থানের জিন-বাতাস

শ্রেয়তর কাঁটা তীক্ষ্ণতায় রক্তের স্বাদ নিতে পারে তবু ভাঙে
দুরন্ত সাহস আত্মাকে উপোসী রাখার অর্থ একদা তেলশূন্য
প্রদীপ, টেথিসের মতো এই ভূ-ভাগ, নদী, প্রেম-অপ্রেম;
প্রজাপতি-ওড়াউড়ি করের অধীন। জেনেছি, প্রতিটি ধর্মবোধে
নিরুচ্চারে রয়ে গেছে আগ্রাসন, পাতাল-আহ্বান। প্রতিটি
পুষ্প-বীজ উৎসাদিত হওয়ার আগে তোমার ভেজা পাতার মতো
চিকচিক করে, জন্মদত্ত দু'টি নীলসায়র মানুষের আত্মহত্যার
কারক; দেশ, দশ, অস্তিত্ব ভ্রমের সহচর। সবই শূন্যে নৌকার
মতো ধায়; চুইংগামের মতো কিছুতেই লেগে থাকা যাচ্ছে
না ...

মুজরো শেষে চলে যাচ্ছে আতর
সাইবার হানায় ভেঙে পড়ছে আকাশের নিজস্ব নিরাপত্তা
লাল চোখের ওপর জেগে উঠছে পীত চোখ
জোয়ানকে আজও টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমির দিকে

নদী পাড় ভাঙছে
শব্দ গিরিপথ
গতি সড়ক
অস্তিত্ব শর্ত
হৃদয় বোঝাপড়া

এ সবই মৃত্যুর মুখ, মোম
আমরা কি কোনোদিন এই সব শর্তের অধীন হইনি
কোনোদিন কেন
আজও...

আমাদের সাধ আকাঙ্ক্ষা তারাখসা আকাশের মতো
অসহায় রুগ্ন
এখন তোমার স্তন যেভাবে শুকিয়ে এসেছে কোনো গূঢ় নির্দেশে
এই যে পূর্ণহীন ফাকড়ার মতো বেড়ে উঠছি
ধানের মধ্যে
গমের মধ্যে
শঙ্খের ভিতর
পরজীবীর মতো
এও কি মৃত্যু নয়?
কিন্তু কী ভীষণ ভালোবেসে আছি
এই সব নকল
জেনে
বুঝে
আজও ...

আজও কি তুমি বুঝতে পারোনি মোম
কী ভয়ংকর এক মৃত্যু
অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরেছিল তোমায়
তুমি শ্বাস নিতে পারোনি
ওষ্ঠের লবণ বারংবার লুণ্ঠিত হয়েছে দস্যুতায়
অর্ধেক আকাশের সৌজন্যে

এখন যে আমার উদ্ভিদ চেতনায় মরা পাতার কালো ছোপ লেগে
আছে
তার সবটাই কি তুমি
নাকি তুমি নিরুদ্দেশের গলুইয়ে পা তুলে দিলে
আমি মরে যাব
এই ভয়।

জানি, জীবন ক্রমশই মাটির গভীরে ঢুকে পড়ে মহেঞ্জোদাড়োর
মতো, বায়োপিকেও তুলে আনা যাচ্ছে না ব্যক্তির মুহূর্তের
রসায়ন, পড়ে থাকে হেঁসেল পাতিল, পয়ঃপ্রণালী দিয়ে ভেসে
যাওয়া শীৎকার, শীতে জবুথবু সাদা হাড়গোড় আক্রমণ
প্রতিরোধের স্মারক
মনে নেই মায়ের চিতা ধুয়ে দেওয়ার জন্য কেন আমাকেই
বাধ্য করা হয়েছিল,
মনে নেই পিতার মৃত্যুর পর কবে থেকে অর্থের জোগান বন্ধ
হয়ে গেছিল,
মনে নেই কবে প্রেম দড়ির ফাঁস হয়ে লেগেছিল আমার ভাইয়ের
গলায়
যা মনে নেই তাই ফিরে আসে
তাই দীর্ণ অবসরের আবেশ।

একটি দরোজার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি
দরোজার নীচ দিয়ে বেরিয়ে আসছে মৃত্যুগন্ধী বাতাস
কেবল আমার জুতোটাই মৃত
মোম, ক্যান্সার তোমার দখল নিতে চাইছে তবু এখনো তুমি
আমার
ফুসফুসের মতো নদীগুলিকে কফিনের মধ্যে পুরে ফেলছে
আমার দেশ
তবু এই দেশটি আমার
হাত কয়েক দড়ি গলায় পেঁচিয়ে ঝুলে পড়েছিল আমার ভাই
তবুও আমার ভেতর সে অসম্ভব জীবিত

নিকষ রাত্রির ভিতর কয়েকটি ডাকঘর এখনো যেন খোলা
চিঠিগুলো সর্টিং হচ্ছে নিঃশব্দে
বাইরে তেজীয়ান ঘোড়াগুলির ওপর অপেক্ষমাণ সহিস-বাতাস
আমার চোখের জল থেকে ভেজা ভোর উঠে আসছে

পাখিদের ভুল ভাবাই স্বাভাবিক।

সুমন গুণ

জীবনযাপন

এ এক অসুখ, আমি তার
থাবায় আড়ষ্ট হয়ে আছি

সম্পর্ক পুরনো হয়ে এলে
ক্রমশ ফুরিয়ে আসে আহ্লাদ, ক্রমশ
নদীর কিনার থেকে নৌকো আরও দূরে সরে যায়
প্রথম প্রথম
কথায় জড়িয়ে থাকে মেঘ, আর মেঘের ছায়ায়
চারপাশ ঘন হয়ে আসে, দূরে দূরে
চোখে পড়ে গ্রামের দুর্লভ সীমা, উচ্ছ্বসিত গাছ
গতির উৎসাহে সব সাজানো রয়েছে মনে হয়

যত কাছে আসে, টের পাই
সব ছবি অনেক আগের চেনা, অভিমতহীন
ধার থেকে কমে যাচ্ছে ফ্রেমের জৌলুশ, রঙ মুছে গেছে
এমনকী, হাতে নিয়ে দেখারও আগ্রহ ধসে যায়

প্রতিটি সম্পর্ক তাই প্রাথমিকভাবে সাবলীল
শুরুর বৈভব
ক্রমশ হারিয়ে যায়, ভাঁজে ভাঁজে
চোখে পড়ে লুকনো ময়লা, যে-আওয়াজ
আশ্রয়ের মতো মনে হত
তা শুধু চিৎকার হয়ে বাজে, প্রতিদিন
ধ্বনির তৈজস কমে আসে

তাই, মনে হয়
সম্পর্ক দূরের থেকে রক্ষা করা ভালো
দূরের লালন
নিঃশব্দে বাঁচিয়ে রাখে সব সম্ভাবনা
দূরের আতিথ্যে বেঁচে থাকে
যমক, অনুপ্রাস, শ্লেষ

কাছের লালন থেকে, মনে হয়, খুঁজে নেওয়া যায়
শুদ্ধস্বর, পটমঞ্জরীর
জটিল লাবণ্য দিয়ে গড়ে ওঠে যেভাবে কাহ্নর
ধ্রুবপদ, ধাপে ধাপে, ভেতরের দিকে
সেভাবেই অল্প অল্প আয়োজন নিয়ে
নিজেকে উহ্য রেখে
হয়ত বাঁচানো যায় বিপদসংকুল
সান্নিধ্যের আঁচ। আমার এক
নবীন বান্ধবী তার ব্যক্তিগত জীবনের ছাঁদ
ভেঙে ভেঙে আমাকে দেখিয়েছিল, বোঝাতে চেয়েছিল
কীভাবে কল্পনা দিয়ে, মন দিয়ে
শান্ত ভাবে, সাবলীলভাবে
সম্পর্ক নতুনতর করে তোলা যায় দিন দিন

শুধুই সম্পর্ক নয়, আমাদের জীবনযাপন
প্রতিটি পর্যায়ে এইভাবে
স্বাভাবিক, শান্ত রাখা যায়
শুধু, নিজেকে দলিত রেখে যেতে হবে, নিজের ঘরের
সব জানলা খুলে দিলে বাইরের আলো ও বাতাস

ধুয়ে দেবে জড়ো করে রাখা
ব্যক্তিগত সমস্ত অসুখ, দেখা যাবে
পাশের বাড়ির ছাদে বিকেলের সামান্য রোদ্দুর
জানালায় ছটফটে চড়ুই, বর্ষায়
বৃষ্টি পড়বে জানালার কাচে

নিজেকে নীরব করে, এইভাবে
আমরা কি প্রতিদিন বেঁচে থাকতে পারি?
চারপাশে খোলা হাওয়া, আমরা তার থেকে
খুঁটে নিচ্ছি নিজস্ব জড়ুল, শুধু নিজের দিকেই
ফেরাতে চাইছি সব চোখ, কেউ পাশে এসে
বসলে, সন্দিগ্ধ হয়ে
নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি কুক্ষিগত সুরক্ষার দিকে

এভাবে, মানুষ আরও সরে যাচ্ছে রোজ
পাশের মানুষটির থেকে, কারও দিকে সরাসরি
তাকানো যায় না, আমাদের
চোখ শুধু আটকে আছে ফটোশপে, অ্যাপে
স্পেন্সার্সে, গুগলে, ওয়াংখেড়ে

যেভাবে, ট্রেনের ভিড়ে
মানুষ জড়িয়ে থাকে মানুষের সঙ্গে তীব্র বিরূপতা নিয়ে
যে যেভাবে পারে দ্রুত পায়ে
অন্যকে মাড়িয়ে আরও আগে যেতে চায়
যেখানে সান্নিধ্য থাকে, সদ্ভাব থাকে না
সেভাবেই আছি আমরা, প্রত্যেকেই আছি
প্রত্যেকের সাথে, কিন্তু প্রাণপণে
বিচ্ছিন্ন হবার জন্য লড়ছি, চাইছি কত দ্রুত
ফাঁকা করা যায় এই গন্তব্যপ্রবণ কামরা, একা হয়ে
সিটে পা তুলে বসা যায়

নিজের ছায়ার পাশে ঘুরে ঘুরে
এভাবে নিজের সঙ্গে সব কথা, সব বিনিময়
হতে হতে, ক্রমশ জীবন থেকে
মুছে যাচ্ছে সব মায়া, ভাষা, আলপনা
আমি একটা অন্ধকার থলি, তার মধ্যে
যে-কেউ বারুদ ভরে ছুড়ে দিচ্ছে ইস্তাম্বুলে, গুলশনে, নিসে

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই প্রাণ, তার আলোঅন্ধকারময়
চলাচল, হয়ত, গ্রহনক্ষত্রপ্রবাহে কিছু নয়, তবু এই
জীবনের চিত্ররূপময় আন্দোলন
এই বুননের মাত্রা, তাল
মেনে চলতে হয়, তার ভর
রক্ষা করার দম অর্জন করার নামই জীবনযাপন

এই জীবনের মধ্যে ছোট বড়
অনেকগুলি স্টেশন রয়েছে, নানা কাজে
সেখানে আরও অন্য জীবনের মানুষ, রোজই
আসে, থামে, কিছুক্ষণ অকারণে বসে, চলে যায়। কেউ কেউ
কোনওদিন আর হয়ত ফিরেও আসে না।
তাদের সবাইকে নিয়ে, আমাদের
জীবনের বৃত্ত তৈরি হয়, আর আমরা সবাই
এই বৃত্তটিকে ছুঁয়ে আছি, গড়ে তুলছি, মাঝে মাঝে
ভুল করে ভেঙেও ফেলছি
ভাঙা ও গড়ার এই সমাজসম্মত আয়তনে
প্রতিদিন ভোর হয়, সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ে

সুনীল সোনা

লুণ্ঠিত বিকেল

চিরদিন সোনা শোক মাঝখানে ঘর
চাউনি মিলিয়ে যাচ্ছি স্বীকৃত অন্তর
চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছি দুঃখধোয়া জল
কবিতার কষ্টটুকু আমার সম্বল

প্রতিদিন হলুদ পাখা প্রজাপতি মন
সহসা জীবন তাই মাটির আপন
চাষার লাঙল কাঁধে অনাবাদী নই
ঘুমিয়ে পড়ার আগে পৃষ্ঠামুখী হই।

প্রয়োজন আছে দ্বিধা কাটিয়ে ওঠায়
জলসাঁকো পার হয়ে দেখি জোছনায়
গতির গোপন ভাবে গুপ্ত উপবাসী
প্রাচীন দাঁড়িয়ে কাঁদে অগণন চাষি

এক জন্ম ঝুঁকে আছে মানুষের ভাত
আগুন নিভিয়ে আসে আগুনের হাত
জটিল পৃথিবী থেকে কবিতা লুকোয়
কলমের ভেজা বুক কবিরা শুকোয়

যতবার তীব্র হই রক্ত শেষে মাটি
যতবার সূর্য ওঠে অশ্রুজন্মে হাঁটি
পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে মেয়েটির বাঁশি
পাথরে পাঁজর ভেঙে ছুটে ছুটে আসি

জন্মের রহস্য যদি গভীর কপাট
ছলনা ছলকে প'ড়ে বরফ জমাট
আমাকে এড়ানোই কি রমণী স্বভাব
অনুভব করি শুধু তোমার অভাব

অন্যের কথায় ব্যর্থ বসে আছো রাগে
যুদ্ধে যাবার পোশাকে কত রঙ লাগে
শত ছিন্ন হৃদয়ের ইতিহাস মানো
কত সন্ধেবেলা তুমি মৃত্যুখেলা জানো

কঠিন ফসলে প্রাণ ঢেলে দিই বলে
প্রথম জীবন চলে যায় ব্যাপ্তকালে
সন্তান সন্ততি তুলে রাখছি গোলায়
প্রান্তিক চাষিরা তাই বুকটা ফুলায়

যেকথা গোপন লেখা চোখ ভিজে আসে
টুকরো টুকরো গ্রাম প্রতি পরবাসে
তোমার শরীরী বুক আশা করা যায়
বিকল্প ভাবিনি মুখ তবু তো হারায়

আমাদের পথ ছিল আগুন পেরোনো
সব সত্যি পৃথিবীতে জন্মরূপ কোনো
এবেলা ওবেলা প্রায় খালি পেট লিখি
অন্ধকারে বজ্রধ্বনি ভাব-ভঙ্গি শিখি

মেয়েটির ডাকনাম রাখলাম গীতা
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নয় কিছুটা কবিতা
আদরের নাড়ি ছেঁড়া ডাকছে দাঁড়াও
শাড়িটি সামলে বলে দু'বাহু বাড়াও

দুই ভাগ হল প্রতিমার স্বপ্ন যদি
সময়ের মুখ শুধু নামরূপ নদী
পুড়িয়ে শাড়ির পাড় কাঁটাতারে ঝোলে
রক্তফেনা শক্ত হয় সাগরের জলে

অধিক স্বর্গীয় তুমি গভীর আশ্রয়
প্রাণ টিকে থাকে প্রাণে মুখাপেক্ষী নয়
জ্যোতির সামনে রাখো একুশের ধূলি
গড়াগড়ি যায় শুধু শরণার্থী খুলি

ভয়ের ভেতরে ভয় সম্পূর্ণ মিলায়
সম্ভাষণে কেঁদে ফেলি নিজেকে বিলায়
আমরা আহত পাখি যেন অলৌকিক
চিতার জ্বলন্ত কাঠ সত্য সর্বাধিক

মানুষের অস্ত দেখি শূন্য বেলাভূমি
একের ভেতরে একা জন্মজোড়া তুমি
পুরনো কান্নার বীজ ঝুলে থাকে গাছে
কেউ কেউ ফিরে গেছে কেউ কেউ আছে

চোখ ভরা জল ছিল করুণ ঈশ্বর
রুখতে পারিনি ভাঙা লাঙল ভাস্বর
নিয়োগের শর্ত যদি সবকিছু হয়
গামছায় মুছে ফেলি দীর্ঘ পরাজয়

প্রিয় তারাটি ঘুমোয় ধান দূর্বা নিয়ে
গভীর মিলিয়ে যায় মেঘে ডুব দিয়ে
আসলে আটকে আছে গৃহস্থালী ঋণ
সেই কষ্ট চেপে রেখে ছিঁড়ে খাচ্ছি দিন

মাতৃসৌধ নষ্ট হলে মানুষ বাঁচে না
মানুষের মান চায় স্বাধীন ফসল
কার্পেটে মোড়ানো নয় মাটির মেঝেয়
কেবল উজ্জ্বল থাক মানবী সকল

জন্ম জুড়ে কিছু ভুল থেকে যায় ক্ষীণ
মানুষের মিল খুঁজি মাথার অধীন
শরীরে চাবুক পড়ে মারাত্মক খাটি
পতনের মুখে মুখ হামাগুড়ি হাঁটি

তোমার ইশারা বুঝি মৃত্যু ছারখার
লিখতে লিখতে আমি স্বপ্নে চুরমার
সত্যকে বোঝাতে হবে পৃথিবী কাঁদছে
প্রেমিকাকে কারা যেন পুড়িয়ে মারছে

আমাকে জড়িয়ে ধরো ঠোঁট রাখো ঠোঁটে
ঘুমের ভেতরে প্রেম সত্যি হয়ে ওঠে
বৃষ্টি মেখে যদি আমি মেঘ হতে চাই
রক্তভেজা মাঝরাতে শুধু কষ্ট পাই

মানুষের মৃত্যু যদি কোঁচকানো হয়
জন্মের দুয়ারে থাকে ব্যর্থতার ভয়
তোমার পৃথিবী তবে তোমারই থাক
আমার মৃত্যুকে নিয়ে জন্ম চলে যাক

হাজার শরীরে জ্বলে নীল কষ্ট বাতি
বিরাট ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে কাটে দুঃখ রাতি
হৃদয়ের শূন্য ঘরে অন্য কোনো কবি
মনের মননে আঁকে সৃজনের ছবি

বহুকাল কেটে গেল চলেছি কোথায়
প্রথম দ্বিতীয় জন কাঁদে কামনায়
আমার সামনে যারা মেরুদণ্ডহীন
পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি কঠিন

পাথরে পাথর মেরে ভেঙে যেতে হয়
নিজেকে আটকে দেবে এটাই তো ভয়
আগামী দিনের কথা চোখ বুজে ভাবো
অনন্ত আকাশ তলে কোথায় দাঁড়াব

পৃথিবীর অন্ধকারে কারা স্বর্গ খোঁজে
স্বর্গগামী মানুষেরা অর্থনীতি বোঝে
অবক্ষয় আটকাতে হবে অনিমেষ
জানো, কাঁটাতার শেষে ওটা কার দেশ?

ভেসে ভেসে খাবি খাই চরে ওঠা দায়
দাঁড়িয়ে বালির ঝড়ে খুঁজেছি উপায়
মদত জোগায় নৌকো ছদ্মবেশী রূপ
অতৃপ্ত ঘুমের পাশে জাগে অন্ধকূপ

জাগ্রত দ্বীপের দেশে বিষাদ কাঁকন
পৃথিবীর দিকে দিকে দু'মুখো ভাঙন
খেলে যাও পাখি খেলা করো ওড়াউড়ি
জোগাড় করেছে সোনা পাথরের নুড়ি

রক্তমাখা শ্বাস নয় হাহাকারে ক্ষয়
পাণ্ডুলিপি তৃপ্ত হলে পৃথিবীর জয়
প্রকৃত প্রকৃতি জানে একমাত্র কবি
কবিতা জীবন ছাড়া বিষাক্ত সবই

অনায়াস বয়ে যাক মানব জীবন
এইমাত্র শেষ হল সোনার যাপন
খেলার পৃথিবী থেকে নিবিদ চিতায়
কবিতার গন্ধ নিয়ে কবির বিদায়

অমিত সাহা

ভালোবাসা আজ স্পেশ্যাল চাইল্ড

সোনাঝুরির লাল কাঁকড়ের রাস্তার পাশে
একই সাইকেলের হাতলে
হাতের ওপর হাত রেখে আমরা দু'জন।
দু'জন দুষ্কৃতী বাইকে এসে হার ছিনিয়ে নিয়ে গেল ঊর্মির গলা থেকে।
মেঘ এসে ঢেকে দিল সোনাঝুরি-রোদ্দুর!
চার চোখ জুড়ে বিহ্বলতা। ঊর্মির চোখে বাড়তি ভয়,
বাড়ি ফিরে অবসরপ্রাপ্ত বাবাকে কোন অজুহাত দেখাবে সে।
লুকোচুরির ভালোবাসায় যে অনেক জ্বালা—তা মেয়েরা ভালো বোঝে।
সেদিন ওর বাবার কৈফিয়তের উত্তর আমি সাজিয়ে দিতে পারিনি ঊর্মিকে,
থানায় শুধু একটা জি ডি ছাড়া তেমন কিছুই করতে পারিনি।
পরে শুনেছি, ঊর্মি ব্লেড দিয়ে আঁচড় বসিয়েছিল
কনুই আর হাঁটুতে—
হার হারানোর অজুহাত খুঁজতে।

প্রবীণ মিথ্যার অবয়ব পাল্টায় নিত্যনতুন বাগ্মিতায়।

সে যাত্রায় সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টের ছুতোয়
উতরে গেল ঊর্মি।
গোপন প্রেমের পাপ জমা থাকল মহাকালের খাতায়।
মাঝে বেশ কয়েক বছর সাঁওতালমেঘের জ্বালাতন সহ্য করেছে সোনাঝুরি;
বৃষ্টির জল খোয়াই ধুয়ে শ্যামবাটির ক্যানেল ভরেছে যথাক্রমে
ওদিকে ঊর্মি ফাঁস করে ফেলেছে গোপন প্রেমকথা,
বিয়েতে রাজি নয় বাবা-মা।

মেয়ের বেকার প্রেমিককে পৃথিবীর কোনো বাবাই পছন্দ করে না,
ইতিহাস সে কথাই বলে।
কিন্তু নাছোড় মেয়ের কাছে হেরে গিয়ে
এখন চাকরি করা প্রেমিকের সাথে বিয়ে দিতে হল।
বিয়ে তো আসলে প্রাচীন প্রেমের প্রকাশ্য স্বীকৃতি!
সেটা হল।
পেলাম প্রকাশ্যে কাঁধে হাত রাখার অধিকার।

এখন পরিণয়ের পরিণতি ঊর্মির কোলে এক স্পেশ্যাল চাইল্ড,
আমি তার বাবা—অপাংক্তেয় কবি নয়।
অনন্ত অন্ধকারে হাঁটছে প্রতিবন্ধক কাব্যজগৎ।
ঊর্মির সকল স্বপ্নের আশ্রয় প্রাচেতস—আমার একমাত্র কাব্যগ্রন্থ!

বাবা হওয়ার প্রথম দু'বছর কিন্তু এমন ছিল না,
সমুদ্রের ঢেউ এসে উত্তাল করে দিয়ে যেত সব কিছু।
ও যখন বছর দেড়েক,
আমি কলেজ থেকে ফিরেই দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতাম
'ছন্দ দরজা খোল'

ও বলত—'বাবা আমি তো ছন্দহীন'
আজ পাঁচ বছরে নির্বাক অঙ্কে প্রমাণিত
আমাদের ছন্দহীন দাম্পত্য।

আমি তো ছন্দ ধরে রাখতে কবিতা লিখতে চেষ্টা করি
ঊর্মি সেটাও ভাবতে পারে না।

আজ প্রাচেতস তার কাছে কালকূট-উপন্যাস নয়,
তার একমাত্র পৃথিবী, যাকে ঘিরে সে আবর্তিত হয়।

বাবারা কিছুটা স্বার্থপর হতে পারে মায়েরা পারে না

এই মুহূর্তে আমরা তিন জন—
আমি, ঊর্মি আর প্রাচেতস।
সোনাঝুরির ক্যানেলের ধারে বসে।
পাশে লাল স্কুটি। সাইকেল মোটর বেঁধেছে কোমরে।
খোয়াইয়ের মাঝে মাঝে ছুটে বেড়াচ্ছে আমাদের ছন্দ,
ভালোবাসা আজ স্পেশ্যাল চাইল্ড, সমগ্র কাব্যসংসারও।

মহাকালের পথ চেয়ে বসে আছে ছন্দহীন কাব্যকথা
মাত্রাবৃত্ত পথে স্বর সাজানোর অপেক্ষায়...

সাদা খাতা, দু'মাত্রার 'বাবা' কবিতাটি একবার শুনতে চাই।

সুবীর সরকার

হাহাকারের কবিতা

মাঠে মাঠে টাট্টু ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে হলদিয়া পাখি।
খসখসে আপেলের মতো জীবন ছিল
সাইডএফেক্টময় জীবন ছিল
চারপাশে গান জাগে গান ঘোরে
'ও মোর গণেশ হাতির মাহুত রে'
হিমঘর থেকে শীতার্ত হয়ে ফিরে
আসি
তামাক বাড়ি থেকে তৃষ্ণার্ত হয়ে ঘুরে
আসি
সেই জোতদারের গল্প
সেইসব কাঠের বাড়ির গল্প
বাঘের ডাকের গল্প
কুয়োতে বালতি নামবার
গল্প
অধিবেশনের পর অধিবেশন
দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিয়ে দিন
কাটানো
দোলাচলের পর আলোমাখা
ডিনারটেবিল
ধানসমুদ্রের ছবি পাঠাল কেউ
গ্রাম্য হাটের বিকেল
ঝুড়ি ঝুড়ি বকফুল কিনি
হাহাকার আছে বলেই হাহুতাশ
জ্বর আছে বলেই থার্মোমিটার
শিকারির তাঁবুতে আপাতত একটা
লণ্ঠন
পাড়াগাঁর খালবিল।
খেপলা জালের ছায়ায়
শিঙি ও মাগুর
আমাদের দিনযাপনে পড়ন্ত বেলা নেই
আমাদের দিনযাপনে ডুবুরিরাও
নেই
সাঁতারুদের সংবর্ধনা শেষে
সন্তরণ বিষয়ক কথাবার্তায় উপচে পড়ে
হলঘর
চাঁদের আলোয় চরাচরে হেঁটে
যাওয়া
মাঠে মাঠে রবিশস্য, জমা জল
আশ্রয় খুঁজি কবিরাজের
বাগানে
নামাওঠার সরু সিঁড়ি।
শস্যখেতের ভেতর অসম্ভব হয়ে
থাকি
হাটবাজার ঘুরে ঘুরে চিরুনি
ও মুখশুদ্ধি
দূরের শহরে আলো—
হাসপাতাল যেতে যেতে গাছপালা
দেখি
পুতুলগুলো ঘুড়ি হয়ে উড়ে যাচ্ছে
'হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়'
অথচ সাক্ষী থাকছে না কেউ।
আমবাগানের পাশে ডেকে আনি
তাকে
সাদা চোখ, অপরূপ ও শান্ত
বলতে বাধা নেই এসব কিছুতে একটা মায়া
থাকে
অসম্ভব ফাঁকা রাস্তায় উড়ে আসছে
শালপাতা

মোংপো লামার কবিতা

অনুবাদ : হিন্দোল ভট্টাচার্য

সংলাপ

গুহাচিত্রের মতো
আমার ভিতরে কে আঁকেন
ঈশ্বরকে?
তাকে তুমি দুর্বোধ্য ভেবেছ।
সে নীরব, তোমার মনের ভিতর
আজো আঁকে
তোমাকেই।
নিজের ছবির কাছে এভাবে
নিজের মূর্তির কাছে
তুমি ভাবছ কে শিল্পী, আর কেই বা শিল্প?

চোখ

জ্ঞান, যা অন্ধ
মন্ত্র, যা নির্বাক
তাকে ত্যাগ করো।
একটি গাছের কাছে
একটি পর্বত নতজানু হয়ে থাকে।
তুমি তার পাতা হও,
ছায়া হও
ফুল হও
দ্যাখো।

প্রেম

তোমার বন্ধুর হাত অন্যে না হয় ধরেছে এখন
হয়ত সে তার জন্য ছিল
তুমি ছেড়ে চলে যাবে বলে
সে এখনো আছে।
সেও ছেড়ে চলে যাবে বলে
আছ তুমি।
রাস্তা তো তোমার নয়, হেঁটে যাওয়া তোমার হয়ত।
তুমি তাকে সংসার ভেবো না।

পদ্ম

খুলে যাও পাপড়ির মতো
নিজেকে সাজিয়ে দাও
শান্ত করো
পূজা দাও নিজের আত্মায়

জন্ম

আমি তো তোমার জন্য হাজার বছর
আমি তো তোমার কাছে কয়েকশো ঘণ্টা
অনুপস্থিতির মতো আছি
আরো লুপ্ত হতে
আরো কত বছর জন্ম নেব?

সুর

এলে না, তাই
আমি চলে গেলাম।
আমাকে ডাকলে
আমি, তুমি হয়ে গেলাম।
তারপর এলাম না নিজেই।
তুমি, আমি হয়ে গেলে।
আর সংগীত শুরু

মোংপো লামা অরুণাচল প্রদেশের একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। সাকুল্যে পঞ্চাশটির মতো কবিতা এবং কিছু গল্প লিখেছেন। বয়স পঞ্চাশ-ষাট হবে। কবি হিসেবে তিনি রহস্যময়। তাঁর ঠিকানা আছে মহাবোধি সোসাইটিতে। দেওয়া বারণ।

মনুষ্যপুত্রম-এর কবিতা

অনুবাদ : প্রবুদ্ধসুন্দর কর

এই ঘর

খুন হয়ে যাওয়া ব্যক্তির রক্তের দাগ
ধুয়ে ফেলতে হলে
এই ঘরে এক বালতি জলই যথেষ্ট

লোকটিকে যে এই ঘরে ফেলে রেখে গেছে
তার ছবি মুছে ফেলতে
আমি
এক বালতি রক্ত চাই

হাত-নাড়া

ট্রেন ঢুকছে
তোমাকে এবার যেতে হবে

রেললাইনের উপর কাঁপছে
ছেঁড়া ছেঁড়া পলিথিন ব্যাগ

সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চে
কারো ফেলে যাওয়া ম্যাগাজিন
হাওয়ার ভেতর
নিজেই নিজেকে পড়ে নিচ্ছে

আমি যখন তোমাকে লক্ষ্য করে হাত নাড়ি
অন্য কামরা থেকে একটি শিশু আমার উদ্দেশ্যে তার হাত
নাড়ে

প্রকল্প

প্লাটফর্মবাসীদের জন্যে
কোনও ঘর নেই
শৌচাগার নেই
নির্দিষ্ট কর্মসংস্থান নেই
জাতপাত নেই
সংগঠন নেই
শীতের কম্বল নেই
তাদের দরখাস্ত পড়ে না কেউ
দুর্ভোগহীন একটিও দিন নেই
পুলিশ ও বদমাশদের উৎপাতে মহিলারাও নিরাপদ নয়

সবই আমরা ক্যামেরাবন্দি করেছিলাম
ওরা জানতে চেয়েছিল, এটা কি টি ভি-তে দেখাবে?
আমরা বলেছিলাম, হ্যাঁ

মন্ত্রীমহোদয়কে বলবেন? জানতে চেয়েছিল ওরা
অবশ্যই স্যার,
এ বিষয়ে আর কিছু জানতে চাইলে
যোগাযোগ করতে পারি?
চোখেমুখে বেশ দয়া দয়া ভাব এনে
প্রশ্নকর্তা সেই বৃদ্ধকে আমার টেলিফোন নম্বর দিলাম

যে-নম্বর এই পৃথিবীর
কোনও টেলিফোন ডায়রেক্টরিতে নেই।

ক্লোরিন

এই শহরের
সমস্ত পাইপ দিয়ে
ক্লোরিনমিশ্রিত জল সরবরাহ হয়

প্রতিটি খাবারে
ক্লোরিনের স্বাদ

সব ফুলে
ক্লোরিনের গন্ধ

শহরের লোকেদের উদ্দেশে ভাষণ রাখে
ধর্মীয় নেতারা
যেভাবে ক্লোরিন মিশিয়ে জলের ট্যাংক সাফ করা হয়
ক্লোরিন ধর্মও তেমনি পরিষ্কার রাখে শহরের লোকেদের মন

এই শহরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যারা
তাদের বিরুদ্ধে মেয়রের লেখা মৃত্যুদণ্ড
জীবাণুনাশক ক্লোরিনেরই মতো
স্বাস্থ্যসূচক ক্লোরিন
নির্বিঘ্ন জীবন
রোগসংক্রমণ রোধে এক সমাধান

পরিচ্ছন্ন এ শহরে
আমরা সঙ্গম করি
ক্লোরিনের গন্ধে আমাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে

ভালোবাসা

ভালোবাসা পেতে গেলে
অপেক্ষার প্রয়োজন নেই
কিছু পেশ করার দরকার নেই
ভিক্ষে চাওয়ার দরকার নেই
আপসের প্রয়োজন নেই
আত্ম-অবমাননার প্রয়োজন নেই
তিতিবিরক্ত হয়ে চিৎকার ও মদ্যপানের প্রয়োজন নেই
স্বপ্ন দেখে ভয়ে চমকে উঠে জেগে থাকার দরকার নেই
গুপ্তহত্যার দরকার নেই
টলোমলো পায়ে হাঁটতে-থাকা কোনও শিশুকে বিষিয়ে তোলার প্রয়োজন নেই
একসঙ্গে তেইশটি ঘুমের বড়ি গিলে ফেলার দরকার নেই
সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলে পড়ার দরকার নেই
অবিশ্বাসী হওয়ার দরকার নেই
বিশ্বাসঘাতকতার প্রয়োজন নেই
সমাধিতে ফুল চড়ানোর প্রয়োজন নেই
ঘরের দেয়ালে নাম লেখানোর দরকার নেই
মনোরোগ বিশেষজ্ঞের চেম্বারে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই
কোনও এক সুন্দর সকালে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই
কান কেটে উপহার দেওয়ার দরকার নেই
রোজ পচে যাওয়ার দরকার নেই

নিজেকে ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে
যে ভালোবাসার আলো জ্বালিয়ে রেখেছ
সেই ছোট্ট মোমবাতিটির দিকে শান্তভাবে বরং তাকাও
এরপরই বিদ্বেষের দীপ্ত সূর্যোদয় নিয়ে
এসো, জেগে উঠি একদিন।

আমাদের রাত্রি

আমাদের রাত্রিগুলি
ফুঁপিয়ে উঠছে

আমাদের দিনগুলি
উবে যাচ্ছে

মামড়ি খসে-পড়া
আমাদের ভালোবাসা
জেগে আছে
পুরোনো দেউল হয়ে।

শিকার

টেবিলে সাজানো
তোমার কাঠের ঘোড়া
শিকারে বেরিয়েছিল কাল রাতে

শিকারির চোখে ধুলো দিয়ে
বুনো এক বাঘ
আজ রাতে শুয়ে আছে
আমার টেবিলে

সময় নেই

অপেক্ষার জন্যে আমাদের হাতেও সময় নেই
কেউ আসার আগেই আমাকে তোমার ছোট্ট দুটো স্তন
পান করতে দাও

সারা জীবন যা পান করেছি, হয়তো
এই মুহূর্তটিই সবচেয়ে গৌরবের হতে পারে

তোমার চোখের জল
তুমি মুছে নাও

আমাদের সব আসন্ন দুঃখের মধ্যে
এই অশ্রু হয়তো সামান্য

স্থির হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরো
বিদায়ের মুহূর্ত যে-কোনো সময়েই আসতে পারে

তামিল ভাষার জনপ্রিয় কবি মনুষ্যপুত্রমের জন্ম ১৯৬৮-তে। পোশাকি নাম এস আবদুল হামিদ। আটের দশকে প্রথম দিকেই তামিল কবিতায় মনুষ্যপুত্রমের আবির্ভাব। আজন্ম অসাড় দুটো পা নিয়ে কবিতা লেখার পাশাপাশি সাংবাদিকতা ও প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত। ২০১৫-তে তামিলনাড়ুর উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগামে যোগদান করেছেন।

আমি মেঘলা হই

ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

আলো—মুখোমুখি বসে থাকার এক মেয়ে আর এক গন্ধরাজ গাছ। মাঝে লতাপাতার ছদ্মবেশী জানলার গ্রিল, যে দূরত্বটা দূরত্ব নয় শুধু এই পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়ার রহস্যময় শরীরের অবাধ গতিতে। যেখানে কিছু ঘাস, পিপুলের পাতা সেখান থেকে আরো কাছাকাছি যেন এই জানলা ঘেরা আকাশ। ধোঁয়াগুলো ওইদিকে মিলিয়ে যায়। সাদা কালো জ্যামিতিক গণনায় মহাজাগতিক যৌবনপ্রাপ্ত এই ধোঁয়ার শরীরের বিন্যাস যত ঘন হয় দু'চোখে, ততই মুছে যায় তার ধূপকাঠি ও সিগারেট জাতীয় দু'টি উৎসের আলোকবর্ষীয় মননের দূরত্ব। গন্ধরাজ আর আমার প্রগাঢ় রমণের কাল। হাওয়ায় হাওয়ায়। আকাশে জমাট কালো মেঘে এ সময় প্রসবকালীন। আহা! কত চাওয়ার এই বৃষ্টিজন্ম। আমারও ইচ্ছে করে নিজের গর্ভ থেকে বৃষ্টি হয়ে ঝরি। এসো জল—এ সময় প্রসবকালীন।

ছায়া—সে বলেছিল তোমার সাথে দেখা হলে স্বপ্ন ঝরে পড়ে। সে বলেছিল শব্দেরা একঘেয়ে হয়ে যায়। তার নেশা হত জ্যোৎস্নার গন্ধে। তার চুম্বন কখনও চামড়া স্পর্শ করত না। নিয়নের আলোমাখা জনহীন রাস্তায় সে চেষ্টা করত যতটা সম্ভব নিঃশব্দ আত্মযাপনের। কলরব মুখরিত নাইটক্লাবে তার কাছে অদৃশ্য পর্দার মতো ধরা দিতেন জীবনানন্দ। গ্রীষ্মের প্রখর দুপুরে ফুটিফাটা পাথরে সে দেখতে পেয়েছিল এক পরাক্রমী যোদ্ধার মতো নাম না জানা বুনো গাছ। তার একমাত্র ব্যর্থতা ছিল সেই গাছকে চিনতে না পারা। তার আনন্দ ছিল পলাশ আর রাগ ছিল অপ্রয়োজনীয় উজ্জ্বল আলো। এসবের পরেও হতাশা শব্দটা তাকে একদিন পার্থিব নাগপাশে জড়ানোর চেষ্টা করল। নীল কুয়াশার ভিতর শকুনের মতো চোখে সে সেটা দেখল এবং চলে গেল বৃষ্টি নামার সময় খুঁজতে। আজ আমি বুঝতে পারি এই জগতে দীর্ঘতম ছায়া হয় শূন্যতার।

রঙ—কোন এক নির্জন পাহাড়ি বিকেলে হঠাৎ করে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম একটি অদ্ভুত ছায়াআঁধারি বাঁক। সেখানে দূরে পাহাড়গুলো প্রথমে সবুজ তারপর নীল ও তারপর ছায়ারঙ মেখে মিলিয়ে গেছে। খাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো নদী যাদের শরীর নীল ও সবুজ তারা একে অপরের সাথে মিশে গেলে স্বতঃস্ফূর্ত কল্লোলে প্রেমের মতো বোধে। কিন্তু তাদের মিলিত স্রোতের রং উল্লেখযোগ্য বা মনে রাখবার মতো ছিল না। চারপাশে নিবিড় অরণ্যের গন্ধে মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমি ফিরে আসছিলাম সেই বাঁক পেরিয়ে। ফেরার পথ ছিল দীর্ঘ এবং ধ্যানগম্ভীর পর্বত আমাকে বলে চলেছিল জীবন ও অস্তিত্বের রহস্যের অনাড়ম্বর উপস্থিতির কথা। আমি বুঝতে পারিনি আমার সাথে সাথে সেই বাঁক পেরিয়ে এসেছিল নীল ও সবুজাভ শরীরের নদী দু'টিও। অনেকরাত্রে তারা আমায় জাগিয়ে তুলে বলেছিল, ''আমাদের মিলন আমাদের প্রকৃত অস্তিত্বকে বিনাশ করেছে। তাই আমাদের মিলিত স্রোত তোমায় বর্ণ স্মৃতি দিতে ব্যর্থ।''

অস্তিত্ব—প্রথমে সে একা হয়ে গেল কিছু আপাত অপ্রয়োজনীয় মানসিক উত্তরণের মাধ্যমে। বন্ধুরা তাকে ছেড়ে যাওয়ার আগেই সে ছেড়ে গেছিল হৃদয়ের যোগ। ক্রমশ সামাজিক ক্ষেত্রগুলি থেকে তার প্রাসঙ্গিকতা হারানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল। অতঃপর তার চোখে ঘুম নেমে এল। অবচেতনের শান্তমুহূর্তে তার প্রথমেই দেখা হল নীলকণ্ঠ পাখিটির সাথে। ক্রমশ তার অবচেতন থেকে চেতনের কাচের প্রিজমের মতো বহুমাত্রিক ক্ষেত্র জুড়ে ছড়িয়ে যেতে থাকল সেই পাখির ডানারা। নীলকণ্ঠের চোখের সজল ছায়ায় ডুবতে শুরু করল সে। অনেকখানি স্বপ্নের পর সে পাখির সবুজ হৃদয়টিকে খুঁজে পেল এবং নিজের হৃদয় থেকে একটি জারুল ফুল ছিঁড়ে সেখানে রাখল। জারুল বৃষ্টি জাতিকা—একথা সে জানত।

রেখা—নিষ্প্রভ বিকেলের বুকে কখনও কখনও সঠিকের নিরালা উচ্চমার্গ থেকে 'সুন্দর' নেমে আসেন ঘাসের বুকে। শিশুর ধুলোমাখা খেয়াল খেলার সারল্যে। একখানা সাদা কাগজ জুড়ে

ছড়ানো জল রঙ-এ এক নৌকা, তার আবছায়া লগি, শ্যাওলামাখা জলে মেঘলা আকাশের ছায়া জেগে উঠল একদিন। তারপর হঠাৎ একদিন কী করে হারিয়ে ফেল্লাম সেটা। কেঁদে কেঁদে গলন্ত হল মন-বৃথা চেষ্টা করেছি তুলি-কাগজের স্বপ্ন খুঁজে সেই ছবি পেতে। শুধু মেঘ জমে রইল প্রতিদিন।
বহুদিন পর যখন আবার ফিরে এল সেই বিকেল মনের মধ্যে পেলাম পথ নির্দেশ। আমার আকাশের ছায়ামাখা জল তার অরূপটুকু নিয়ে চলে গেছে সুন্দরের নিখোঁজে। আমার জীবন আছে সেই খোঁজেরই পথে।

জীবন—একজন কৃষক ঘরনি ও ধানের সম্পর্কের কথা ভাবতে বসলে আমি শুধুই অভাব অনুভব করি। খিদে সংক্রান্ত যোগ্যতার অভাব। চালের সবুজ কমলা-প্যাকেটের চকচকে ভাব মুছে গিয়ে ক্রমশ পাণ্ডুর সুষুম্নাকাণ্ডীয় মেঘাস্থিরতা জন্ম নেয়। একজন মায়ের কথা মনে পড়ে। একজন ছেলের জমিতে কাজ করা জনমজুর। তবু সে প্রত্যহ ভারী আগ্রহ ভরে শ্বাস নেয় ভাপা ধানের উঠোনে। তবু তার ভাল লাগে সোনা বরন চিটে। ধানঝাড়ার ফাঁকে তার চোখ পড়ে আকাশে, দূরের সবুজ মাঠে। সেখানে তার গল্প আছে, যৌবন আছে, কৃষক আছে, ধান আছে। প্রতিবার খিদের মুখে ভাতের গ্রাসের পর্যাপ্ত জোগান আমাকে মনে করায়, আমি কখনও বুঝব না ধানের ক্ষেত ঠিক কতটা সুন্দর। আমি মেঘলা হই।

যৌবন—সে ছিল সময়ের মতো। সৃষ্টির বিপুল কোলাহলের স্বীর্য রেখার মায়াবন মাঝে অদৃশ্য দীর্ঘশ্বাসে আদতে বোবা এবং বন্ধ্যা। আলোর কলায় উৎস ও মোহনার মাঝে কিছু অযোগ্য যন্ত্র রাজ করে। ঘড়ি থেমে গেলে জবাব চায় না কেউ। একটি মৃতদেহের পাশে স্থির হয়ে বসে চন্দন আঁকতে আঁকতে সে ঘন হয়ে দেখে নেয় নিজের মৃতমুখ। ধূপের গন্ধ ছাড়িয়ে মৃত্যুর কাছে তার একটি মাত্র পাওনা জীবনের-জীবের প্রকৃত গন্ধ। সময়ের আগেই নিজেকে সে দেখে নিয়েছিল নিজেকে উত্তরকালের পথে। কোন অদূরের রাতে সে পরম স্বস্তিতে একটি ব্যক্তিগত মেঘের পাশে বসে সময়ের মতো কাঁদে।

বেবি—প্রসব যন্ত্রণার শেষ প্রহরে ঠিক কী ঘটেছিল স্পষ্ট করে বলতে পারে না মেয়েটি। জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে সে শুধুই অনেক ফুল দেখেছিল। তারপর নেমে আসে গভীর স্বপ্ন। ঊষার নীল কুয়াশায় ঢেকে আছে অরণ্য। একটি মহাবৃক্ষের নীচে সেই কুয়াশার বুক চিরে আসা ক্ষীণ আলোর মুখে মাটি, জল, পাতা, বীজ একত্রিত করেছেন শিল্পী। অতঃপর তিনি অপেক্ষায়।

চেতনা—বসন ও ভূষণের অপবিত্রতা ফেলে রেখে হেঁটে এলাম পৃথিবীর স্বর্গীয় নদীর কাছে। আমার হাতে একটি মাত্র শ্বেতপদ্মের ফুল। সারি সারি সম্পর্কেরা জেগে থাকে জীবিত ও মৃত নক্ষত্রের মতো। এক ছায়াপথ জুড়ে দ্বন্দ্ব খেলা করে। আমার পাওনাদার অনেক। আমি কাকে দিয়ে যাই এই ফুল?

জন্ম—প্রখর রোদ বা সন্ধ্যার অন্ধকার নয়। মেঘলা দিন। কঠিন নয় একেবারেই এর স্নিগ্ধতার গন্ধ নেওয়া। মনে আছে ঠাকুমার শবযাত্রার সময়টা এমনই ছিল। স্নিগ্ধ। তার যাওয়ার পথে মিহি হিরের কুচির মতো বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছিল আর আমার ভীষণ ভাল লাগছিল সেদিনের উঠোনে ফোটা কাঞ্চনফুল—তার পাপড়িতে জলের ফোঁটা।

অবশেষে আজ আদিগন্ত বৃষ্টি নেমেছে।

"মাংস ডিঙিয়ে যাব প্রিয়তম নারীটির কাছে...
ভালবাসা পাবো কি কখনও? ছায়া পাব?
চরম তাচ্ছিল্যে যদি মুঠো মুঠো ঘৃণার কণিকা
জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয় শারীরিক সব অণু-পরমাণু
সেখান থেকে শুরু হোক প্রেম; তবে এসো, মেঘ,
মল্লারে ভেজাও আমাকে..."

ধুলো খাই যদি প্রেম পাই ● অরুণ চক্রবর্তী

বৃষ্টিরঙের ভোরে একটি নিঃসঙ্গ ইনবক্সে সামুদ্রিক মেঘসংলাপ

অমিতকুমার বিশ্বাস

ফানুসের মতোই ফুঁসছে সুষুম্নাকাণ্ডের নিম্নদেশ চা নিতে নেট সার্ফিং। পুজোর বাজারে এসেও খুঁজছি নেপলা। আসলে তোমার জন্যই তো বেঁচে থাকা। ডিগবাজি রকবাজি ইত্যাদি ইত্যাদি। সেটটপ বক্সেও আজকাল বড্ড বিরক্ত তুমি। এরকম ছেলেমানুষি করলে কি চলে, বলো! তোমার জন্যই দ্যাখো আজন্ম হামাগুড়ি দেওয়া। মৃত্যুর ম্যারাথন থেকে নিশ্চিত সোনার সন্ধানে কবর খুঁড়ে নিয়ে এসেছি বাদশাহী আংটি, এই দ্যাখো। তবু নিজের সমাধিতে নগ্ন আত্মার সাথে ক্রমশ খেলছি সাপলুডো। আজ আর বাধা দিও না।

২

অণ্ডকোষে লুকিয়ে রাখা প্রেমপত্রের পরিবর্তে চেয়েছ মাটির স্তনের মুখে মুখ রেখে শীতদুপুরে রোদ-পোহানো সাদা বকেদের আদর আর পাকা ধানের ঘ্রাণের মতো ভালোবাসা। অগত্যা ছড়িয়ে দিয়েছি নিজেকেই। পাতাখোলায় গর্ভবতী ধানের অহংকার নিয়ে ক্রমশ ডুবে গেছি মাটির মৌতাতে। এখানেই বড় হয় স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নের ফসল। জোছনার নীল ডানায় কাঁচামিঠে আগুন দেখে আজও পাগল হওয়া। আগুন লাগে শরীরে। মোমের মতো গলে যাই নির্জনে। আজও গোহারা হেরে গেলাম, ফ্রয়েডের পিঠে চেপে মহাকাশ ঘোরা হল না আর। বরং স্বপ্নের প্রতিবিম্ব হয়ে এগিয়ে যাই ক্রমশ তোমার ছায়ার পাশে।

৩

ভাসমান ছুরি-সংলাপের চুম্বকত্বে অসহায় হাত দুটো বাড়িয়ে দিলাম। রাজামশাই আমি আসছি। ঘুমিয়ে থাকুন। আমি আসছি। নিজের ঘুমকেই গলা টিপে মেরে ফেলার একটু আগে আমার মুখটা একবার চেয়ে দেখুন। দেখুন রাত-জোছনায় ভাঙা-ভাঙা মেঘের নীচে এখনও আমি কাঁদতে পারি পাখির মতো। হৃদয়ে বহমান রক্তনদীর শরীরে ডুবসাঁতারে হারিয়ে যায় আমার সাধের আংটি আর মানবিক দস্তানা। রাজামশাই আমি আসছি। শেষ রাতের শেকল ভেঙে হাজার পায়রা-হত্যার আনন্দে যখন ম্লান হয়ে যাচ্ছে আমার কালো হাত, আমার প্রচ্ছায়ার মুখেও তখন বিদ্রূপের হাসি। এখন অবিরাম আগুনের উপাখ্যানে কেবলই আমার অনন্ত সন্তরণ। আমি আসছি!

৪

ভীষণ একা, ভীষণ একা আমি। আর তুমিও। একাকী এই রাতে হেঁটে চলেছ অসীম পথে। কে জানত এভাবেই একদিন মোমবাতির মতো ধুঁকতে থাকব। শিরোস্ত্রাণ পড়ে থাকবে কবরের পাশে। বন্ধুও হাসবে মিটমিট করে, যাকে শুইয়ে রেখেছি বহু আগেই ভালোবেসে-মন্দবেসে, এই হাতেই...! এভাবেই চলছে রথের চাকা। আগুনের ফুলকি। তলোয়ারের গোঙানি। কলমের চিৎকার। দোতারার হতাশ্বাস। কে থামাবে? আমাকে না হয় খুবলে খাবে সময়। এখন শরীরে কেবল ইঁদুরের বাসা। এখন শরীরে কেবল মরা ছুঁচোর ডাস্টবিন। এখন চোখে সাপের গর্ত। এখন কান দিয়ে বেরোচ্ছে কেঁচো। আর তুমি হাঁটছ। থামো, এবারে থামো! খোলা ছাদ আমাদের। ভাসমান ছোরাকে দেখেও কেন বুঝিনি আমি! ফিরে এসো ফিরে এসো। রথ, জয় কিংবা কাব্য হয়ে নয়। নেহাত আমার বুকে পলিমাটির মতোই ফিরে এসো। যদিও আমার আর ফেরা হবে না জানি। আমি কাপুরুষ নই। পুরুষ। ভোটাধিকারের পুরুষ। কেরোসিন লাইনের পুরুষ। ফিতে চিতাকাঠ আনতে পারা পুরুষ। কন্ডোম বাঁধতে পারা পুরুষ। এভাবেই তুমি আর আমি, আমি আর তুমি, হেঁটে চলেছি হাজার বছর। তোমার হাতের মোমবাতি অকস্মাৎ নিভে যাবে জানি। হাউহাউ করে তখন কাঁদব না, তাও জানি। আঁধার নেমে আসার আগেই তপ্ত মোম মেখে ঝলসে নেব নিজের মাংস, আর ছড়িয়ে পড়ব ধোঁয়াশার মতো।

তোমরা ঘুমিয়ে থাকো ম্যাকডাফ!

৫

এ-রাতে জোনাকিরাও ঘুমোচ্ছে চুপচাপ। এ-রাতে সঙ্গমে এগিয়েও পিছিয়ে গেল কারা? চলো এবারে আমরা একে-অপরের শরীর ছানার পরিবর্তে দাঁড়ি কমা সেমিকোলন ঘেঁটে দেখার পরিবর্তে, চলো চলো নিজেরাই নিজেদের খুন করে লাফাই, আর প্রকাশ্য রাজপথে নগ্ন হয়ে বলি 'ইউরেকা' 'ইউরেকা'!

৬

সবাই ঘুমিয়ে থাকো। কেউ আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা আমাদের হৃৎপিণ্ডগুলো লুকিয়ে রেখেছি মাটির নীচে। আমরা হাজার-হাজারকে গ্যাসচেম্বারে ঢুকিয়ে খাওয়াব দুলালচন্দ্র ভড়ের তালমিছরি আর জোয়ানের গুঁড়ো। এভাবেই চলছে চলবে। এভাবেই কালো কিংবা লাল হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। এভাবেই চায়ের দোকানে দন্তবিকশিত কিছু সুখ কিংবা অসুখ। সবাই ঘুমিয়ে থাকো। বুলডোজার এগিয়ে যাক কাটাকুটি আর একদান লুডো খেলার জন্য।

৭

জানলাটা আর নেই। ওখানেই লেগে ছিল তোমার মুখ বহুযুগ। ওপড়ানো চোখের মতো পড়ে আছে এখন ভালোবাসার লাশ। অথচ কেউ দেখেনি। ডুবোজাহাজের পিছনে লেগে তোমার আধমোছা লিপস্টিক আর পোড়া বারুদের ঘ্রাণ। নাবিকের সুষুম্নাকণ্ডে কেবলই আত্মার ছদ্মবেশ।

৮

ব্রিজের নীচে দাঁড়িয়ে তুমি বা তোমার মুখের মতোই কাঁচামিঠে রোদ। আজ আর একা নও মেঘরেণু। এঁটো ঠোঁটদুটো ঠিক করে নিলে নিমেষেই। তারপর ট্রেনের ক্ষুধার্ত পেটে তোমার সাময়িক সন্তরণ। পিঠব্যাগে কেবল আমার আধপোড়া চাঁদ।

৯

মানুষের মতো আমি তোমার দিকে ছোবল বাড়িয়ে দিই প্রতিরাতে, খুব সন্তর্পণে, তুমি আগলে রাখো, যেন রাধার কাঁচুলিতে লুকিয়ে রেখেছে জোনাকি, রাতের পর রাত কাটে এভাবেই, আরও আরও কারা হেঁটে আসে সারি সারি, আমার পিছন পিছন তুমি হাসো, আমিও হাসার চেষ্টা করি মানুষের মতো, পারিও!

১০

নিজের মাংস খাই রোজ। নিজের সাথেই সম্ভোগ। নিজের ছাল ছাড়িয়ে বাজাই নিজের ঢোল। নিজের আঙুলগুলো কেবল তুলে রেখেছি সিন্দুকে। মাথাটাও! বৃক্ক, যকৃৎ, ফুসফুস নিয়ে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে-ওখানে আর লোকে সেলাম ঠুকছে একটার পর একটা।

১১

ডিমের খোলসের মতো উঠে-আসা রাত্রির লাশ সহসা বিড়ি ধরায়। অন্ধ ল্যাম্পপোস্টে তার হেলানো পিঠ, লালচে আলোর নীচে সযত্নে লুকিয়ে রাখা যৌনাঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে সারি সারি ট্রাম-বাস ও সেফটি-পিন। এ-দৃশ্যে কামাতুর ছেলেগুলি আর তাদের মর্ষকামী-পায়ুকামী পিতা সুদূর দেশে উর্দি খুলে মেতে উঠেছে হাডুডু খেলায়। চৌদিকে কেবল সমবেত অসুরক্ষিত সম্ভোগোল্লাস! এ-ভীষণ বিবমিষায় ক্রমশ ক্ষয়ে যায় ধুলোমাখা শরীর। অগত্যা শব্দের আড়াল থেকে লাফ দিই শব্দের আত্মায়!

১২

পৃথিবীটা ঘুরছে। মানে আমি ঘুরছি। মানে তুমিও। মানে তোমার জন্য ব্যবহৃত-অব্যবহৃত সকল নিরোধগুলোও। এসব নিয়েও লেখা? ছি! লোকে কী বলবে? লোকের কথাও তো ভাবতে হবে। অন্তত তারা যখন ভোট দেয়, আর ঘোরে গোটা পৃথিবীর সঙ্গে। লাইকায় কমেন্টায় ট্যাগায় হামি খায়। পেপারটাও পড়ে। ছাড়ো এ-সব। আর দ্যাখো কালোঘোড়ায় আজীবন ছুটছে কেউ তোমার পেছনেই আর গাইছে পাখিদের গান শিশিরের গান ফসলের গান। দ্যাখো এই একা শুনশান দুপুরে আগুন মেখে প্রকাণ্ড রাজপথে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে একদল ছাত্র। মার খেতে খেতে শিরদাঁড়ায় চটেছে রঙ। তবু হেঁটে আসছে দুর্গের দিকেই। আর এ-সব দেখে হাসতে হাসতে রাজার কুকুরটাও পড়ে গেল সোফা থেকে। ছুটে এল এগারোটা বুলেট। পড়ে গিয়েও সে গাইছে গান। আর ঘোড়ার মুখে চুমু দিয়ে বলছে, 'কবিতার মতো ছুটে যাও হীরক! আমি শুধু লিখে ফেলি কুকুরদের মুক্তি বিষয়ক আরও দুটো গান।'

১৩

কালোঘোড়ায় ছুটছে পড়ন্ত বিকেল আর হল্লা রাজার নৈশপ্রহরী। অবশেষে সবাইকে চমকে দিয়ে বৃষ্টি নামল। তাই আমিও ব্যাঙালাম তোমাকেই ছাদে জমা জলে বসে। একটু তাকালে একটু হাসলে কিংবা আমিই ভেবে ফেললাম সে-রকম। আড়াল থেকে দেখে নিলে ঘাসবনের নীলপাখি আর মোলায়েম দিনগুলির বর্ণমালা। কালোঘোড়ায় ছুটছ তুমিও, কেবল আমিই ক্ষুরের মধ্যে লুকোলাম।

১৪

অজগরের নিতম্বে রেখে যাব আমার বিষণ্ণ চুম্বন। বুঝে নিও তুমি সুদূর মিশরে বসে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার মতো সকল প্রেম লুকিয়ে রেখেছি সাপুড়িয়ার বাক্সে আর নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছি কুচি কুচি করে গোলাপের টুকরোর মতো আমাদের ঘাসবনে। এখন বনে খুব একটা যাই না। এখন ভয় লাগে খুব। এখন একশৃঙ্গ গন্ডারে ভরে গেছে তোমার রাতের ভূকম্পন। তবু বুনো শুয়োর ছুটে যায় জোছনার এসপারে-ওসপারে। আর আমি বসে থাকি যেন পৃথিবী সৃষ্টির রাতে এক কাপ কফি নিয়ে ভগবান আর রাক্ষসদের মাঝে ওৎ পেতে আছি কখন মেনকার হাত ধরে ঝাঁপ দেব পৃথিবীর কাঁধে আর সবার চোখে ধুলো দিয়ে ঢুকে যাব বাসরঘরে। যদি এও স্বপ্ন হয় তবে নিজের চামড়া তুলে বানাব কন্ডোম আর ঢুকে যাব কোনও হলুদ অন্ধকারে, যেখানে হারিয়ে যাব সাড়ে তিন কোটি বছর হিপহিপ করে ছুটে যাওয়া শত শত অসম্পূর্ণ চুম্বনগাঁথার মাঝে।

১৫

বৃষ্টিহীনতায় আমিও নীলপাখি। বেদম প্রহারে হার না-মানা ঘোড়ার মতো সাগরের নোনা জল মুখে তুলে ছুটেছি একা। পালক-খসার পর বুঝি ঝড় এক ধরনের অলৌকিক প্রতিভা কিংবা ক্ষুরের মধ্যে লুকোনো প্রেমপত্র ও গোপন হাহাকার। আমার নীলপাখি আমার পালকহীন নীলপাখি আমার ঘোড়ার গাঢ় মনখারাপ কিংবা শিখণ্ডীদের মহামিছিল, শোনো, আমার কিস্যু আসে যায় না যদি মেঘও সন্ত্রাসবাদী হয়। কথা কেড়ে নিলে বরফও একদিন মহাস্রোত হয়ে যায়।

সেন্ট্রাল নার্সিং হোম

২৬ বিজয়লাল চ্যাটার্জি রোড

কৃষ্ণনগর

নদীয়া/৭৪১১০১

ফোন : ০৩৪৭২-২৫২৬২৯/৮৮৮

৩৭ বছর
স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিয়োজিত

- উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে হাড়ের নিখুঁত অপারেশন
- কাউন্সেলিং, S.A., Ovulation, ফলিকিউলোমেট্রি, এবং IUI
- উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে ব্রেন ও সর্বাঙ্গের স্পষ্ট ছবি
- সর্বপ্রকার প্যাথোলজি পরীক্ষা
- ডিজিটাল এক্স-রে ও আধুনিক মেশিন ব্যবহার করা হয়।

❑ জেলার চিকিৎসার নির্ভরযোগ্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান ❑

Space Donated by

S. ROY

Asansol

BIS 916
MasterCard
VISA
দেবীর
ঘোটকে আগমন
ফল - ছত্রভঙ্গ
নিউ সিংহ
জুয়েলার্সে
আপনার আগমন
ফল - গৃহে
মহাশক্তির
আগমন
আন্তরিক শারদ শুভেচ্ছাসহ
চাকদা রোড, বনগাঁ
ফোন ঃ 255-124, 257-911, 259-666
নিউ সিংহ
জু য়ে লা র্স
শুধু তোমারই

‘ছোঁয়া’র ২০১৬-র বই

আমার কথা কবিতার কথা
জীবনানন্দ দাশ ২৫০/

প্রাচীন ভারতের বর্ণ, শ্রেণি ও জাত
শার্ল মারি এমিলি সেনার
অনুবাদ : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদনা : তপনকুমার ঘোষ ২৫০/

কবি ও তার অভিযাত্রা
বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় ১২৫/

অন্ধের হস্তিদর্শন
দেবদাস আচার্য ১৫০/

পটুয়া সংগীত
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০/

নদীদ্বীপ মাজুলি
সোমেশ্বর ভৌমিক ২০০/

দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী
সম্পাদনা : অশোক চট্টোপাধ্যায় ৪০০/

সমকালীন বাংলাদেশের সেরা গল্প
সম্পাদনা : পারভেজ হোসেন ৪০০/

একালের নজরুল
আহমেদ শরীফ
সম্পাদনা : পাতাউর জামান ২৫০/

এই যে থাকা
দেবদাস আচার্য ১০০/

দুর্লভ ভূতের গল্প
সম্পাদনা : সুমন্ত চট্টোপাধ্যায় ৩৫০/

ওমর খৈয়াম
শ্রী সুরেশচন্দ্র নন্দী ৩৫০/

কবি শেখ সাদি
শ্রী সুরেশচন্দ্র নন্দী ২৫০/

২৭/১৭/১ বি, জি.টি. রোড শেওড়াফুলি হুগলি ৭১২২২৩
email: chonyaa2012@gmail.com
Contact : 7278408841
http://facebook.com/chonyaa2012
কোলকাতার অফিস :
১৮এ রাধানাথ মল্লিক লেন কলকাতা-৭০০০১২